সুন্দরবনের সুন্দরী

শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশিকা :

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬০

মুদ্রাকর :

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল

স্টার প্রিন্টিং প্রেস

২১/এ, রাধানাথ বোস লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

সুন্দরবন কেবল জলাভূমি, অরণ্য, খাল, নদী আর বিস্তৃত নদীতটই নয়। পৃথিবীখ্যাত রয়েলবেঙ্গল টাইগার, চিতল হরিণ, বুনো শুয়োরের দেশ নয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন শুধু সজনেখালি, ব্যাঘ্র প্রকল্প, ভগবৎপুর কুমীর প্রকল্প বা ঝিঙাখালি পক্ষীনিবাসের জন্য খ্যাত নয়। এই বনের পেছনে আছে দীর্ঘ ইতিহাস। এর জন্মরহস্য আজও রহস্যাবৃত। প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকরা বলেছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে সুন্দরবনের জন্ম। এক সময় এখানে সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল। কাকদ্বীপের শ্রীনরোত্তম হালদারমহাশয় দীর্ঘ গবেষণার পর গঙ্গারিডি সভ্যতা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার জন্ম ও বিস্তার দক্ষিণ ২৪ পরগণায় (সুন্দরবনের অন্তর্গত দক্ষিণ অঞ্চল)। সামুদ্রিক অবনমনের ফলে এই স্থান ভূগর্ভে ও সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে।

সুন্দরবন সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ বের হয়েছে। এসব গ্রন্থে না আছে ভূগোল, না আছে ইতিহাস। গবেষণা লব্ধ কোন তথ্যও নেই। শুধু সাপ, বাঘ, মধু, কাঠ আর জেলে বাউলেদের গালগপ্পো।

এ গ্রন্থটি ব্যতিক্রম। সংক্ষেপে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছে। গত পাঁচ বছর সমগ্র সুন্দরবন ঘুরেছি, নানা পুঁথিপত্র ঘেঁটেছি। গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মুখোমুখি হয়েছি। বহু প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি। ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষিকর্ম যেমন এসেছে তেমনি জাতপাত, দ্বন্দ্ব-বিবাদও স্থান পেয়েছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ন্যাশনাল পার্ক ও বিশেষ প্রকল্প গড়তে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ভূমিকা নিয়েছেন তারও

উল্লেখ আছে। পর্যটন বিভাগ ও সুন্দরবন পর্ষদের কথাও বাদ যায়নি।

গ্রন্থটি যে কোন পাঠকের মনের খোরাক জোগাবে। ভ্রমণার্থী ও গবেষকদের কাজে লাগবে। ভ্রমণ উপন্যাস আকারে লেখা হলেও তথ্য সমৃদ্ধ। সাধারণ পাঠকের কথা ভেবে সহজ সরল কাহিনী স্থান পেয়েছে। প্রতিটি তথ্য সরকারী ফাইলপত্র, বিভিন্ন পুস্তিকা ও গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কোথাও আমার মনগড়া কথা নেই। অর্থাৎ সবই প্রমাণ সাপেক্ষ।

পাঠকদের ভাল লাগলে আমার প্ররিশ্রম সার্থক হবে।

উৎসর্গ

পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র গুহরায়

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

মাতৃদেবী

শ্রীযুক্তা আশালতা গুহরায়

ও

সুন্দরবনের জনগণ

॥ মুখবন্ধ ॥

"হেনকালে উপনীত গাজী-দক্ষিণ রায়।
ছালাম করিল রায় বনবিবির পায় ॥
তাতাল খাঁ খোশাল খাঁ আর অলিগণ।
কর জুড়ি করিয়া আইল সর্বজন ॥
হরিরায় বিষম রায় আর কাল রায়।
আসিয়া ছালাম করে বনবিবির পায় ॥
কহেন বড়খাঁ গাজী শুন নেকমাই।
তোমার হুজুরে মাগো এই ভিক্ষা চাই ॥
দক্ষিণ রায়ের পর কোপ কর দূর।
এ খাতের আইলাম তোমার হুজুর ॥
এতেক শুনিয়া মায়ের দয়া উপজিল।
সদয় হইয়া মাতা বলিতে লাগিল ॥
আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না ॥
সংকটে পড়িয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
কদাচিৎ হিংসা তার কভু না কহিবে ॥
রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার।
সত্য সত্য তিন সত্য, সত্য অংগীকার ॥
বনেতে আসিয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে ॥

কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায় ও বনবিবির দ্বন্দ্বের কথা অনেকেরই জানা। ধনা ও মনা যখন দুঃখকে ধরে নিয়ে যায় দক্ষিণ রায়ের কাছে বলি দিতে তখনই বনবিবি দুঃখকে উদ্ধার

করার জন্য জঙ্গলী শাহকে পাঠান। দক্ষিণ রায় বনবিবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন। বড়খাঁ গাজী মধ্যস্থতা করে বিবাদ মিটিয়ে দেন।

আজও সুন্দরবনের বহু অঞ্চলে বনবিবির সঙ্গে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজা হয়। আজকাল কয়েকটি গ্রন্থে ও কয়েকজন গবেষকের মতে প্রভাকর রায়ের পুত্র দক্ষিণ রায় প্রতাপশালী জননেতা ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমান পীর, গাজিদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে। প্রজারা তাঁর গুণগানে তাঁকে দেবতার মর্যাদা দেন। কালক্রমে তাঁকে ব্যাঘ্র দেবতা বানিয়ে বাঘের পিঠে চড়ান হয়েছে। যদিও ব্যাঘ্র দেবতার পূজা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছিল। মধ্য যুগে দুজনে একাকার হয়ে যান জনগণের ভক্তিতে।

সুন্দরবনের বহু অঞ্চলে আজও ঘটা করে বনবিবি ও ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজা হয়। শিবপুত্র নামেও তিনি খ্যাত। নানা আকৃতি ও বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তিনি পূজিত হন। লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে 'ধপধপি'তে দক্ষিণ রায়ের মন্দির জাঁকজমক করেই পূজা ও মেলা হয়ে থাকে। পূজায় নানা উপাচারের সঙ্গে শোলমাছ, কাঁকড়া ও মদ প্রয়োজন হয়।

যাঁরা মুনশী বয়নুদ্দিনের 'বনবিবির জহুরানামা' ও কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্য পড়েছেন তাঁরাই রোমাঞ্চিত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে 'মঙ্গলকাব্য' পড়ে সুন্দরবন সম্পর্কে সকলেরই একটা কৌতূহল জেগে ওঠে। কি রহস্যময় এই বন!

সুদর্শন একজন সাংবাদিক। সে কৌতূহলী হয়ে সুন্দরবনের নানা অঞ্চল ঘুরেছে। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বহু মানুষের সুখ দুঃখের খবর নিয়েছে। এ অঞ্চলের নানা সমস্যা উন্নতি ও অবনতির সন্ধান তার দৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়েছে। আপনারাও তার সঙ্গী হয়ে সুন্দরবনের রহস্য সন্ধানী হোন।

সুদর্শন এয়ার ব্যাগটা গুছিয়ে রাখল। আর দু'দিন পরই যাত্রা করতে হবে। সুন্দরবনে যাওয়ার শখ বহুদিনের। ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের স্বপ্নভূমি গোসাবা। কিছু লেখার ইচ্ছে অনেক দিনের। আজ পত্রিকা অফিসে এসে অপ্রত্যাশিত একটা সুযোগ এসে গেল। পরশু সজনেখালির ব্যাঘ্র প্রকল্পের কাছেই একটা টুরিস্ট লজের উদ্‌বোধন হবে। সরকারী আমলা, মন্ত্রী, ভি. আই. পি.-দের সঙ্গে সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ এসেছে।

সুদর্শন, তোমার তলব পড়েছে। অমলবাবু দু'বার খোঁজ নিয়েছেন। গোসাবায় যেতে হবে, জোর খানাপিনা হবে। নিউজ এডিটর সমরেশবাবু বললেন, সম্পাদকের ঘরে দেখা করে আমার কথা শুনে যাবে।

সুদর্শন হাসিখুশি মুখে সম্পাদকের ঘরে ঢুকল। অমলবাবুর হাতে টেলিফোন, ইঙ্গিতে বসতে বললেন।

সে বসল। টেলিফোন রেখে উনি বললেন—এই কার্ডটা দেখ, সরকারী ব্যাপার, তুমি ছাড়া আর কেউ ভাল নিউজ করতে পারবে না। ফরেস্ট অফিসার আমার বন্ধুস্থানীয়, তোমার কোন চিন্তা নেই। অজিতবাবুকে বলেছি, তোমার সঙ্গে ফটো তুলতে যাবে। তুমি একবার কথা বলে নিও।

আজ সে কার মুখ দেখে উঠেছে। জলপথে, বনে ঘুরতে তার খুব ভাল লাগে। ছুটি না নিয়েও একপ্রকার ভ্রমণ হয়ে যাবে। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অমলবাবু সম্পাদক হয়ে আসার পরই বিশেষ খবরের জন্য তার তলব পড়ে। আজও তাই হল।

সম্পাদকের ঘর থেকে নিউজ এডিটরের ঘরে ঢুকতেই সুদর্শন ফটোগ্রাফার অজিতবাবুকে দেখতে পেল। অজিতবাবু আনন্দে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—তোমার বৌদির খুব ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে বন দেখতে যাবে। আজও বন, নদী দেখেনি ও। তুমি যাচ্ছ

শুনে মেয়েও লাফাচ্ছে। কি করব বলতে পারো? ব্যবস্থা হবে?

— চিন্তা করবেন না। বনমন্ত্রীর সঙ্গে সমরেশদার খুব খাতির, আমি বলে ব্যবস্থা করে নেব।

—ভয়ের কিছু নেই তো? সুন্দরবনে বাঘ, কুমীর, সাপের ভয় নেই? তোমার বৌদি খুব ভীতু মানুষ। সুকন্যাকেও তুমি জান, ইঁদুর, আরশোলা দেখলে চিৎকার করে ওঠে।

—ও মেয়েদের স্বভাব। অনেকে যাচ্ছেন। সরকারী ব্যবস্থা, এলাহি ব্যাপার। একটা অভিযানের মত।

নির্দিষ্ট দিনে ধর্মতলা থেকে বাস ছাড়ল। পর্যটন বিভাগের গদি আঁটা ঝকঝকে লাক্সারী বাস। অন্য কাগজের সাংবাদিক, ফটো-গ্রাফাররাও রয়েছেন। সুদর্শন অজিতবাবুর পরিবারের ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। বাসের মধ্যে গুঞ্জরিত মুখরিত অবস্থা।

সাত সকালে সকলে জমায়েত হয়েছে। ধর্মতলা থেকে বাসে ক্যানিং। ক্যানিং থেকে লঞ্চে সোজা সজনেখালি। যে যার স্থান ঠিক করে বসে গেল। ড্রাইভার, ক্লিনার সকলেই তৈরী হয়ে আছে। কর্তা ব্যক্তিদের নির্দেশ পেলেই বাস ছেড়ে দেবে। শুধু হুকুমের অপেক্ষায়।

টুরিস্ট বাসে মহিলা বলতে অজিতবাবুর স্ত্রী বাণীদেবী আর মেয়ে সুকন্যা। তাই সে গাম্ভীর্য নিয়ে আছে। জানালার পাশে সুকন্যা, বাণীদেবী, তার পাশে নিজে বসে। শেষদিকে অজিতবাবু বসেন।

বাস চলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাসেটও সচল হল। অনুপ জলোটার ভজন, বাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভেসে চলেছে। হিন্দীগান ও আধুনিক গান কোথায় লাগে? সাগর পারেও অনুপের গান দোলা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ আজ পৃথিবীর অদ্বিতীয় নায়ক। বাস এগিয়ে চলে। বাতাস বেয়াদপের মত বাণীদেবীদের চুল উড়িয়ে

নাকে মুখে ফেলছে। রাস্তায় খানাখন্দ, ঝাঁকুনিতে অন্নপ্রাসনের ভাত মুখে উঠে আসে।

তোমরা কি সংবাদ লেখো! সরকার এত উদাসীন! পৃথিবীর আর কোথাও রাস্তার মধ্যে এমন গর্ত আছে? রোগীরা ঝাঁকুনিতেই মরে যাবে। বাণীদেবী মন্তব্য করতেই সুদর্শন বলল, অজিতদা কলকাতার রাস্তার পনেরোখানা ছবি তুলেছেন। তিনখানা ছাপা হয়েছে। কিছু হয়নি বৌদি। একি ব্রিটিশ রাজত্ব! কাগজে বের হলেই গুরুত্ব দিয়ে সমস্যা দূর করতে ব্যবস্থা নেবে?

—মন্ত্রীরা কি অন্ধ? রোজই তো গাড়ী হাঁকিয়ে কোথাও না কোথাও যাচ্ছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে কেন? সুকন্যার প্রশ্ন। সুদর্শনকাকু, তোমরা মন্ত্রীদের কথা ফলাও করে লেখ বলে ও'রা পেয়ে বসেছেন। সংবাদপত্রে ও'দেরই রাজত্ব চলছে। কথার মধ্যে উষ্মা প্রকাশ করে সে।

সুদর্শন কথা বাড়ায় না। ভজনে ডুবে থাকে। বেলা সাড়ে এগারোটায় বাস ক্যানিং পৌঁছলে, একজন পর্যটনকর্মী বললেন, ভাঁটা চলছে। লঞ্চ বারোটায় ছাড়বে। আপনারা বিশ্রাম নিন।

একে একে সকলে নেমে পড়ে। সুদর্শনরা শেষে নামল। বাসের মধ্যে পরিত্যক্ত কলার খোসা, কেকের প্যাকেট, ডিমের খোসা, কফির কাগজের কাপ। পর্যটন বিভাগ ওদের টিফিন খাওয়াতে কার্পণ্য করেনি।

ক্যানিং বাজারের মধ্য দিয়ে লঞ্চ ঘাটের দিকে সকলে এগোতে থাকে। কী নোংরা! শীতকালেই জলকাদা, বর্ষায় কী যে হবে? বাণীদেবীর প্রশ্ন।

—তোমার ভবানীপুর নাকি? কাপড় তুলে চল। কে দেখবে? রেগে ওঠেন অজিতবাবু।

বাণীদেবী কি বলতে যাচ্ছিল। সুকন্যা বাধা দিয়ে বলল, মা, চুপ করো, বাবার কথায় কান দেবে না। তোমরা ঘরেও ঝগড়া কর, পথেও। লজ্জায় মরে যাই।

ওরা একটা দোকানে ঢুকে গরম গরম সিঙ্গাড়া, জিলিপি খেয়ে নিল। বাসে টিফিন খেয়ে বাণীদেবীর তৃপ্তি হয় নি। এখন হাসিখুশি মুখ।

সুদর্শন দোকানে খেতে বসেই ক্যানিং বন্দরের ইতিহাস শুনিয়ে দিল।

১৮৫৩ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড-ডালহৌসি মাতলা নদীর তীরে বন্দর তৈরী করার পরিকল্পনা নেন, নদীপথ রেলপথ, দু'ভাবেই যোগাযোগ থাকবে। ৫৪ নম্বর লাটের আট হাজার জমি কিনে জঙ্গল সাফ করে ফেলল। ১৮৬২ সালে মিউনিসিপ্যালিটি পুরোদমে কাজে নামল, দেখতে দেখতে গড়ে উঠল পাকা বাড়ী, রাস্তা, হাট, বাজার, দোকানপাট। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ফার্ডিনাণ্ডস্কীলার বাজারে ঋণপত্র ছেড়ে ছিলেন। ১৮৬২-৬৩ সালে রেলপথ, নদীর ওপর জেটি, ডক, ট্রাম লাইন পাতার কাজ শুরু হল পুরোদমে।

কথায় বাধা দিয়ে সুকন্যা বলল, জাহাজ, ট্রাম কোথায়? বন্দরের কি ছিরি!

—শুনবে তো সব কথা, তারপর মন্তব্য করবে। সুদর্শন ওকে শেষ পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির মামলা শুরু হ'ল। ১৮৭০ সালে সরকার সম্পত্তি ক্রোক করে পোর্টক্যানিং ল্যাণ্ড কোম্পানী নামে একসংস্থার হাতে তুলে দিলেন। জমিদারী ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও গঠনের কাজ চলতে লাগল। তাও বন্ধ হয়ে গেল ১৯৫৩ সালে। সরকার নিজেই ভার তুলে নিলেন।

তারপর স্বাধীনতা এল, ভারতীয় কালো সাহেবদের হাতে পড়ে সবই ছারেখারে গেল, এই তো?—সুকন্যা পুনরায় টিপ্পনী কাটল।

সুদর্শন একটু রাগভাব দেখাল, কৃত্রিম রাগ অবশ্য। শহুরে মানুষ তো, তাই এই গণ্ডগ্রামে যে স্কুল, কলেজ হাসপাতাল গড়ে উঠেছে তার খোঁজ রাখ? এমন কি ব্যাংক, সিনেমা হলও আছে। কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে যাতায়াত করা যায়।

—তাই নাকি ! বিস্ময় প্রকাশ করে বাণীদেবী।

—ব্রহ্মপূজার মেলা বা সুন্দরবন মেলায় এলে বুঝতে পারবেন এরা কত প্রাণ চঞ্চল। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে সাতদিন ধরে পুজা হয়, আর পনেরদিন মেলা চলে। বহু লোক সমাগম হয়। তাছাড়া বনবিবির থান, শীতলা, পঞ্চানন, শিব, বাবাঠাকুরের থান ও কত মন্দির যে আছে. কী বলব। কলকাতা থেকে চল্লিশ কিলো-মিটার দূরের ইতিহাস কতজন জানে ?

—সত্যি বাবা তুমি পারোও বটে। এত খোঁজ খবর তুমি পাও কি করে ? তোমার অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল. কেন যে সাংবাদিক হলে ? রসিকতা করলেন অজিতবাবু।

—কী যে বলেন অজিতদা। অধ্যাপকদের কথা কে শোনে, ছাত্ররা ক্লাশেই থাকে না। কত বাইরের আকর্ষণ। কত ডক্টরেট, পি. এইচ. ডি. আক্ষেপ করেন। তবে হ্যাঁ, অধ্যাপক হলে প্রচুর সময় পেতাম, ভাল লেখক হতে পারতাম।

এবার সকলে হেসে উঠল। দোকানী ও বয় দুটি না হেসে পারল না।

আবার হাঁটা শুরু। কী ওজনরে বাবা। সুটকেসটা তুলতে তুলতে অজিতবাবু বললেন, তোমার বৌদি সংসার নিয়ে চলছেন। চোদ্দখানা শাড়ী পুরেছে। এ জন্যই তো পথে মেয়েদের বর্জন করতে হয়।

—আপনি একটু বাড়াবাড়ি করেন। মেয়েদের এইটুকু না হ'লে চলে না। আপনি আমার ব্যাগটা নিন। আমি দেখছি। বলেই সুদর্শন সুটকেসটা নিয়ে হাঁটতে লাগল। বাণীদেবী ভ্যানিটি ব্যাগ দোলাতে দোলাতে সুদর্শনের পাশে পাশে চলল। সুকন্যা বাবার হাত ধরে।

মেয়েদের গোমড়া মুখ সুদর্শন পছন্দ করে না, অন্যমনস্ক করতে বলল—বৌদি এ বাঁধ এত উঁচু হলেও মাঝে মাঝে জলে ডুবে যায়। বন্যা হলেই ভেঙ্গে যায়। সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মাতলা নদী একসময় বিশাল ছিল। এখন মরে যাচ্ছে। কত চড়া

পড়েছে দেখুন। ভাঁটার টানে কত খাল দেখা যাচ্ছে। মরা নদী একেই বলে।

দেখতে দেখতে ওরা লঞ্চ ঘাটে এল। গুমটি ঘরে লঞ্চের নাম, সময়, ভাড়া লেখা। এখান থেকে গোসাবা, ছোট মোল্লাখালি, সাতজেলিয়া, দেউলবাড়ী লঞ্চ যায়। সুদর্শনের লঞ্চ নির্দিষ্ট, তাই নিশ্চিন্ত।

সুদর্শন পুনরায় মুখ খুলল—বৌদি তোমরা বাস ট্রেন লেট করলে রেগে যাও। এখানে জোয়ার ভাঁটার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। প্রকৃতির খেয়ালে চলতে হয়।

লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে বাণীদেবী থমকে দাঁড়ালেন। ভূত দেখলেন যেন। জল কাদা, পিচ্ছিল পথ। পা দিলেই হড়কে যায়।

—সুদর্শন, তোমার বৌদির হাতটা ধরো। সুকন্যাকে আমি ধরছি। জলপথে এই প্রথম ওরা যাচ্ছে। অজিতবাবু মেয়েকে ধরে টানতে টানতে লঞ্চের কাছে গেলেন।

অজিতবাবুর মত সুদর্শনও প্যান্ট গুটিয়ে নিল। বাণীদেবী বকের মত পা ফেলে কোন প্রকারে এগোতে লাগলেন। একহাতে সুদর্শনকে শক্ত করে ধরা।

এবার নতুন নাটকের দৃশ্য। একটা পাটাতন নতভলের মত লঞ্চের গায়ে ঠেকানো। একহাতে বাঁশ ধরে পা টিপে টিপে উঠতে হয়। এভাবে যে ওঠা যায় তা কল্পনার বাইরে। এক পা উঠে বাণীদেবী থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

খালাসি কিছু সময় তাকিয়ে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। একজন হাত ধরলে, অন্যজন পেছন দিক থেকে ঠেলে দেয়। অন্য যাত্রীরা মুচকি হাসতে লাগল।

প্রায় দশ মিনিট সময় নিল। পা ধুয়ে লঞ্চের ভিতরে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বাণীদেবী ও তাঁর কন্যা।

আগেভাগে উঠে সকলেই ভাল জায়গায় বসে পড়েছে। বাণীদেবীরা ডায়নামোর পাশে বসল।

ডায়নামোর বিকট শব্দ। লঞ্চ জল কেটে এগিয়ে চলে।

অজিতবাবু সিটের উপর চাদর বিছিয়ে বসলেন। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সুখটান দিলেন। সুদর্শন কোথাও গেলে, বই সঙ্গে নিয়ে বের হয়। তথ্যবহুল বই সে ভালবাসে। হাল আমলের গল্প, উপন্যাস সে পড়ে না। মনের খোরাক পায় না। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' বইটি খুলে পড়তে পড়তে বিশেষ বিশেষ স্থান ডট পেন দিয়ে আণ্ডার লাইন করে। লেখায়, বক্তৃতায়, আলোচনায় নানা উদ্ধৃতি ও যুক্তি দিতে সে এসব কথা ব্যবহার করে। সুবক্তা হিসাবেও তার সুনাম আছে। ডঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ রাজনীতির ফাঁকে এমন একটি বই কিভাবে লিখলেন তা ভেবে সুদর্শন বিস্মিত হয়।

সুকন্যা একটা হালফিলের ম্যাগাজিন বের করল। বাণীদেবীর হাতেও একটা সিনেমার পত্রিকা এম. এ. পাশ করলেও রুচি পাল্টে যনি। শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ মেয়েই হাল্কা বই পড়ে। প্রতিবেশী মেয়ে, বৌ'রা সিনেমা ও ফ্যাশানের কাগজই খোঁজে সুদর্শনের কাছে।

সুদর্শন বই পড়ে যায়। পাশে দু'জন সুন্দরী। যাত্রীদের চোখ ঘুরে ফিরে এদিকে। সব দেখে শুনেও না বোঝার ভান করে সে।

কত জল। ডুবে যাবো না তো? কিছুক্ষণ পরেই বাণীদেবীর প্রশ্ন। কল্পিত দেবদেবীর উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম করে। মুখে তখন ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

মাতলা নদীর জল কেটে লঞ্চ এগিয়ে চলে। দু'পাশের জল উছলে পড়ছে। লঞ্চ দুলে দুলে চলে। ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ। একটা ছন্দ খুঁজে পায় সে।

ঘণ্টাখানেক পর কর্তৃপক্ষ হাতে হাতে খাবারের প্যাকেট দিল ফ্রাইড রাইস, স্যালাড আর একটা আপেল। সুদর্শনের জন্য পাউরুটি, আলুর দম ও মিষ্টি। নিরামিষাশী আরও দু'জন আছে। সুদর্শনের প্যাকেট খুলে একটা সন্দেশ সুকন্যার হাতে গুঁজে দেয়।

—বাবা দেখ কাকুর কাণ্ড। আমি আর কত খাব?

—এত মিষ্টি আমি খাব না। শরীর খারাপ করবে। চিনির খাবার যত কম খাবে শরীর তত ভাল থাকবে।

—কাকু আমার হান্স এণ্ডারসনের 'মৎস্যকন্যা' গল্পটার কথা মনে পড়ছে। এখানে মৎস্যকন্যা দেখতে পাবো?

—দূর বোকা। ও তো গল্প। রূপকথা, জর্ডন নদীতে দেখা যায় বলে গল্পে পড়েছি। কলম্বাস ভাস্‌কোডাগামা সমুদ্রে প্রচুর ঘুরেছেন। তাঁরাও মৎস্যকন্যা দেখেননি।

সুকন্যা কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল 'ব্লু লাগুন' ছবিটার কথা মনে পড়ে? যদি তেমন হয়? আমার ভয় লাগছে।

সুদর্শনের চোখে ঐ জাহাজের ধ্বংসের দৃশ্য ভেসে ওঠে। দ্বীপে কিশোর-কিশোরীর নির্বাসন ও যৌবনের জোয়ারে মত্ত হওয়া সত্যি চমকপ্রদ। মিনার্ভা হলে দু'জনে ছবিটা দেখেছিল। মৃদুস্বরে বলল— খুব অসভ্য হয়েছো? ভাল কথা মনে পড়ে না?

ছোট একটা চিমটি কাটল সুকন্যা।

খালি প্যাকেটগুলো জলে ফেলে দিলে কাগজের নৌকার মত ভাসতে থাকে। কিছু এঁটো খাবার মাছের পেটে যাবে।

—কাকু এগুলো কী ভেসে যাচ্ছে? ওর প্রশ্ন।

—জেলিফিস। সামুদ্রিক প্রাণী। সুদর্শন বলল।

—তাই নাকি! সেদিন স্যার পড়াচ্ছিলেন। কচি পদ্মপাতার মত দেখতে। বেঞ্চে হাঁটু ভেঙ্গে বসে। চোখে মুখে তরল হাসির ঢেউ। অদূরে বালি হাঁস, বক। সামুদ্রিক কাক উড়ছে।

দেখাদেখি বাণীদেবীও ঐভাবে বসলেন। দীঘল ফর্সা শরীর। রাঙা চরণ। সুদর্শন মনে মনে অজিতবাবুকে ভাগ্যবান পুরুষ বলে মনে করে। ওরা সঙ্গে আসায় সুদর্শন খুব মুডে আছে। একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে!

অজিতবাবু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সুদর্শন নদী যে মরে উঠল। কয়েক বছর পর বসতি গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশের নদী, বন এমন চরা হয়ে ওঠেনি। গংগা ও মেঘনার অন্তর্বর্তী ভূভাগই খুলনা, ২৪ পরগনা, বাখরগঞ্জ। এই তিনটি জেলার দক্ষিনাংশে বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে সুন্দরবন। পূর্ব পশ্চিমে ১৮০ মাইল লম্বা, ৭০ মাইল চওড়া। সুন্দরবনের পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে মেঘনা। ভূমি ক্রমশঃ ২৪ পরগনার দক্ষিণ পূর্বাংশে নিম্নজলাভূমিতে পরিণত হয়েছে।

--অজিতদা, বলতে পারেন মোট কতটা অংশ সুন্দরবনের এলাকায় পড়েছে? পাশ থেকে একজন জিগ্যেস করলেন।

-আট হাজার বর্গ মাইলের মত হবে। আর বাংলাদেশে পড়েছে ত্রিশ হাজার বর্গমাইল। সুন্দরবনকে ক্রান্তিমণ্ডলীয় নোনা জলের বন বলা হয়। কথা বলেই সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ডেকের উপরে গেলেন।

বাণীদেবী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে চকলেট বের করলেন। সুদর্শন মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেতেই ওর হাতে আর একটা গুঁজে দিলেন।

সুদর্শন কথা বলেনা। বই পড়ে যায়। একবার তার মুখের দিকে তাকাল বাণীদেবী– মাতৃভাবে দীপ্তিময়ী। বললেন—

কি পড়ছো এতো? একটু কথাবার্তা বল। এমন পরিবেশ। আবার কবে বের হবো ঠিক আছে? বলেই বাণীদেবী ওর বই ধরে টান দিলেন।

সুদর্শন তাকিয়ে দেখে ওর মুখে আর ভয়ের চিহ্ন নেই। হাসি হাসি মুখ। বৌদি, এ বইতে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের কথা লেখা আছে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের মূল্যবান কথা ছাড়াও প্রাক্ মুঘল ও প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের গৌরবের কথার উল্লেখ আছে। এবইর কথা রোজ আকাশ বাণী থেকে পাঠ করে দেশবাসীকে শোনানো উচিত, আমাদের আয়নার কাজ করবে।

—কোনদিন এবইর কথা শুনিনি। কোথায় পেলে?

—আমিও জানতাম না বৌদি। বসিরহাটের ছাত্রনেতা বিদ্যুত কয়ালের বাড়ী একরাতের অতিথি হয়ে ছিলাম। ওর মাকে বই-এর

আলমারীটা দেখাতে অনুরোধ করলাম। আলমারীর ডানা খুলতেই বইটি চোখে পড়ে। দু'চার পাতা পড়তেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া মন টানে না। রবীন্দ্রনাথ, তারাশংকরের দু'একখানা বই ভাল লেগেছে। আধুনিক সাহিত্যের মাথামুণ্ড বুঝি না, শুধু ভাষা আর শব্দের ব্যায়াম। তুমি যখন এতো বলছো তখন পড়ে দেখব। কলকাতায় গেলে পড়তে দিয়ো।

সুদর্শন প্রতিবাদ করে না। বইমেলার রির্পোট লিখতে গিয়ে সে লিখেছিল গল্পের বই, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ হাটে তেমন বিকোয় না। লাইব্রেরীর দৌলতে কিছু বিক্রী হয়। পাঠক পুরানো বই-এর খোঁজ করে। এক শ্রেণীর সম্পাদক ও লেখক বৃহত্তর পাঠককে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

সুদর্শন ভাবতে থাকে বইটির কথা। অতীতের কথা। খৃষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছর থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষ ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, সর্ব বিষয়ে উন্নত ছিল। পৃথিবীতে আর কোন দেশ তখনও সভ্য হয়নি বা তত উন্নত হয়নি। আর্যাবর্তের হিন্দু প্রতিভার বিকাশের কাছে সমগ্র বিশ্ব ঋণী। বেদ' উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারতের মত বই পৃথিবীতে কোথাও লেখা হয়নি।

আমরা হিন্দী, তামিল ছবি দেখি। অশ্লীল পত্র পত্রিকায় স্টল ভর্তি থাকে। আমাদের কি এই ঐতিহ্য? এই কি তার কি নমুনা?

সুদর্শন চেঁচিয়ে বলতে চায়, যা দেখছেন বৌদি সব মিথ্যা। ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, বিষ্ণুশর্মার মত সাহিত্যিক পৃথিবীতে বিরল। যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, শংকরের মত দার্শনিক, পাণিনি, কাত্যায়নের মত বৈয়াকরণিক কোথায়? কোথায় পাবে পিঙ্গলের মত ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ? এই দেশেই জন্মেছেন আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মত জ্যোতিবিদ ও গণিতজ্ঞ। চরক ও সুশ্রুতের মত চিকিৎসক কোথায় জন্মেছেন?

বক্তৃতার মত বলে যায় সে। কত বলব বৌদি, কৌটিল্য,

নাগার্জুন, মৈত্রেয়ী, গার্গী, ঘোষা, লোপামুদ্রার কথা তো জানেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণদেব অবতার পুরুষরা আমাদের ধন্য করেছেন। আমাদের কপিল, শংকরাচার্য, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, তিলকের মত একজন মহাপুরুষও আর কোথাও জন্মাননি। একটু দম নিয়ে পুনরায় বলে, বৌদি আজ আমাদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব শূন্য থেকে নয় সংখ্যা ; সোনা, লোহা, কাঁচ, গন্ধদ্রব্যের আবিষ্কর্তা হিন্দুরা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্পী, সংগীত, নাট্যকলা শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুরাই চরম জ্ঞান দিয়ে গেছেন। আজ আমরা পরানুকরনে লিপ্ত।

সুদর্শন একটু উত্তেজিত। অনেকক্ষণ কথা বলছে। ফ্লাস্ক খুলে জল খেল। এসময় অজিতবাবু নীচে নেমে এলেন। সুদর্শন একটু ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য উপরে উঠে গেল। সুকন্যাও পিছু নিল, ভয়ে ও শক্ত হাতে সুদর্শনকে ধরে রাখল। ঠাণ্ডা বাতাস। কিছুক্ষণের মধ্যে শরীর জুড়িয়ে যায়। এবার নদীর বাঁক ঘুরে নদীতে লঞ্চ পড়ল। জলের গভীরতা আরও বেশী, জল ঘন নীলাভ। শুধু জল আর জল। দিগন্ত রেখা দূরে বহু দূরে! মাটি, গাছ, ঘরবাড়ী কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দু'জনে ঐদিকে তাকিয়ে থাকে।

—কাকু তোমার ভয় করছে না? যদি ডুবে যাই?

- অদৃষ্টে থাকলে হবে। ভয় করলে নন্দলালের মত ঘরে বসে থাকতে হয়। মৃত্যু যোগ থাকলে কলকাতায় ট্রামবাস চাপা পড়েও মৃত্যু হতে পারে। তুমি সিনেমা দেখতে যাও না? কলেজ কর না? যুক্তিতে না পেরে চুপ করে থাকে ও।

জেলিফিস ভেসে যাচ্ছে। ঢেউয়ের দোলায় জল ছলাৎ ছলাৎ করছে। লঞ্চও দুলে উঠছে। জীবনের ওঠাপড়া ছন্দের মত।

—কাকু পাশ করবো তো? তুমি তো জ্যোতিষ টোতিষ জান। পাশ না করলে মুখ দেখাতে পারব না। পড়াশুনা ভাল হচ্ছে না।

— করে যাও, হবে। অম্লান চেষ্টায় কিছু না কিছু ফল হয়ই।

চেষ্টা করতে হয়, কর্ম করতে হয়। অনুর্বর জমিতেও চাষ করে বীজ বুনলে কিছু ফসল হয়, আমার দাদু, মৃত্যু শয্যায় যে কথাটা বলে ছিলেন, তা আজও আমার কাছে বেদবাণী।

—কী কথা?

—"সময় নামেতে ক্ষেত্র অতি চমৎকার, যত্নবলে রত্নফলে আছে অনিবার।

অলস গিরিতে তাহা রুদ্ধ স্থানে স্থানে, উৎপাত নদীর পাতে ভগ্ন কোনখানে।

তথাপি যে কিছু আছে অবশিষ্ট ভাগ,
তাহার কর্ষণে যদি কর অনুরাগ।
তাহাতে পাইবে ফল আশা অনুরূপ,
সময়ে তাহাই হইবে সম্বল স্বরূপ।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না। সুকন্যা আরও অন্তরঙ্গ হতে চায়। মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সুদর্শন ওকে বুঝিয়ে দেয়। দু'জন সাংবাদিক, সারেঙের সঙ্গে কথা বলছে। চোখ এদের দিকে। সারেঙও মিট্‌মিট্‌ করে দেখছে।

অনেকক্ষণ থাকার পর ওরা ভিতরে নেমে এল। অজিতবাবু কি ভাববেন। শীতও লাগছে। সুকন্যা আপত্তি জানালেও সে দাঁড়াল না।

বাবা, ফ্যানটাসটিক। আমার কলম্বাস, ভাসকোডাগামার কথা মনে পড়ছে। সুকন্যা খুশিতে বাবাকে একটু আদর করল।

বেলা প্রায় দু'টো। প্রবীণদের কেউ কেউ ঝিমোচ্ছে, কেউ চা খাচ্ছে। তাস খেলছে যুবকরা। সরকারী লোকেরা কারও কারও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। অজিতবাবু দু'প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেললেন এর মধ্যে।

সুদর্শন আবার পড়ায় মনোযোগী হল। বাজে কথায় বা আলস্যে ডুবল না।

কিছু সময় পর বাণীদেবী ঢুলতে ঢুলতে তার গায়ে হেলে পড়লেন। সে স্থির। বাধা দিল না। দিবানিদ্রার অভ্যাস যাবে কোথায়?

দৃশ্যটা সুকন্যার চোখে লাগল। একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল, কি গো মা, কাকুর কাঁধে ঘুমোচ্ছ কেন? সুযোগ পেলেই তুমি ঘুমোও। সাধে কি মোটা হয়ে যাচ্ছো।

লজ্জা পেয়ে বাণীদেবী সোজা হলেন। সাত সকালে উঠেছি। গুছিয়ে আমাকেই নিতে হয়েছে। তোরা বাপ বেটিতে আমার চেয়ে বেশী ঘুমিয়েছিস।

ঘুমোবে না। ফ্রেস বাতাস। খাঁটি অক্সিজেন। আমারও ঘুম পাচ্ছে। বই থেকে মুখ না তুলে অজিতবাবু মন্তব্য করলেন। মৃদু হাসি গোঁফের রেখায়।

বেলা পড়ে এল। লঞ্চ এখন বনমুখো। দূর থেকে বনকে সবুজ রেখার মত দেখা যায়। বনটা যেন জলে ভাসছে। আকাশে বকের সারি। লঞ্চের পেছনের জল দু'ভাগে ভাগ হয়ে মধ্যখানে গভীর খাদের সৃষ্টি করেছে, দুধের মত ফেনা ছড়িয়ে আছে জলের ওপর। কোমর জলে দাঁড়িয়ে জেলে জেলেনীরা নাইলনের মশারী দিয়ে মাছ ধরছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে। ভয়ডর নেই। জলে জলেই এরা মানুষ হচ্ছে। ড্রামের সঙ্গে বড় মশারী বাঁধা। বড় মাছ ধরার জন্য ত্রিকোণ করে ছোট মশারী বাঁধা। বয়স্করা ছোট জালে চিংড়ি মাছ, ধরলে, ছোটরা মাটির হাঁড়িতে তুলে নেয়। ভাঁটার টানে বড় জালে মাছ আটকে যায়, জেলেরা তখন বড়জাল ডিঙ্গিতে টেনে তোলে।

বন দেখা যেতেই সকলে আনন্দে দাঁড়িয়ে পড়ল। নানা রকমের শব্দ তুলে ঘুম, আলস্য ভাব তাড়াল। এবং জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল।

এখন শুধু বন আর বন। গাছ আর গাছ। ঘর-বাড়ী, মানুষ-জন কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সুকন্যারা জল ঘেরা গাছ গাছালির এমন বন আগে কোথাও দেখেনি। বন বিভাগের কর্মীরা অবশ্য বাদ। কেউ

জানালা দিয়ে মাথা বের করে বিস্ময়ে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকল। সূর্য বনের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। বন এখন স্পষ্ট। সামনা সামনি গাইড বলল—এখানটা সংরক্ষিত এলাকা। বনের বা জলের কোন প্রাণী ধরা বা মারা চলবে না। অনুমতি নিয়ে কাঠ, মধু, মোম সংগ্রহ করতে হয়। সরকার এর পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। নোনা জল ঘেরা এত বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, বোম্বাই, কর্ণাটক, কেরলে সমুদ্র উপকূলবর্তী বনভূমি আছে। তবে এমন সম্পদ ও সৌন্দর্য নেই। মধু, বাঘ, হরিণের এমন একত্র সমাবেশ নেই কোথাও।

—ও ভাই, সুন্দরী গাছ কোথায়? একটা ডাল ভেঙ্গে দাওনা। কলকাতায় নিয়ে যাবো। সকলকে দেখাবো।

বাণীদেবীর কথা শুনে গাইড বলল, খুব দুর্লভ জিনিষ। এদেশে পারেন না। বাংলাদেশে যেতে হবে। বাংলাদেশেই সুন্দরবনের বেশী অংশ পড়েছে, সেখানে এখনও ঘনবন আছে, এদিকের মত এমন বন কেটে বসত হয়ে যায়নি।

দেখতে দেখতে জোয়ারে নদীর জল ফুলে উঠল। লঞ্চ থেকে দেখা যায় গাছের কাণ্ডের অর্ধেকটা জলের তলায়। ডালপালা জল ছুঁই ছুঁই করছে। লঞ্চ এখন বনের গা ঘেঁষে চলছে। অজিতবাবু ও অন্য ফটোগ্রাফাররা চটপট্ ফটো তুলে যাচ্ছেন।

একটা গাছের নীচে তিনটা হরিণ দাঁড়িয়ে। গায়ে সাদা সাদা দাগ, বড় আকৃতির। বাবা দেখ দেখ, চেঁচিয়ে উঠল সুকন্যা। শব্দ কানে যেতেই দে দৌড়। ততক্ষণে কেউ কেউ সেলুলয়েডে ওদের ধরে ফেলেছে। বাবা, সত্যি বন্যেরা বনে সুন্দর—পুনরায় সুকন্যার মন্তব্য।

এক ফাঁকে অজিতবাবু মাছধরা সারসের ছবিও তুলে নেন। লঞ্চ আরও কিছুদূর গেল। দুটো বাঁদর ডাল ধরে ঝুলছে। ক্যামেরার লেন্স ঠিক করতে করতে অজিতবাবু বললেন, ঐ দেখ, আমাদের পূর্বপুরুষ।

সুদর্শন মাঝে মধ্যে ভাবে, মানুষ সত্যি বানর থেকে এসেছে।

মানুষই ট্রেনের আলো, পাখা, সিট ভাঙ্গছে। গাড়ী-ঘোড়াতে আগুন দিচ্ছে। জাতীয় সম্পত্তি তছনছ করছে। আর সুযোগ পেলে এর ওর পেছনে লাগছে। দু'দণ্ড আমরা স্থির থাকতে পারি না। এর ওর পেছনে লাগি। ঠিক বানরের চরিত্র।

অজিতবাবু ক্যামেরার পেট থেকে সেলুলয়েডের রিল বের করে বললেন, সুন্দরীগাছ সুন্দরীর মত দুর্লভ। সব কেটে সাফ করে দিয়েছে। হেতাল, গরান, বাইন ছাড়া অন্যগাছ দেখছি না যে।

গাইড বলল—এই যে খালগুলি দেখছেন, জোয়ারের সময় জল ঢুকে বন ভাসিয়ে দেয়। ভাঁটার সময় জেলেরা মাছ ধরতে বনে ঢোকে। তখুনি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সুযের আলো গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। সৃষ্টিকর্তার কি অপূর্ব শিল্পজ্ঞান। খালগুলি মাথার সিঁথির মত বনে ঢুকে গেছে। গাছে গাছে পাখির কিচির মিচির। নাম না জানা ফল কোন কোন গাছে। সাইনবোর্ড লেখা আছে, 'পাখিরালয়'। গাইড বলল, বর্ষাকালে আসবেন। কোথা থেকে লক্ষ লক্ষ পাখি আসে! বর্ষা শেষ হলে আবার চলে যায়। সৃষ্টিকর্তা সত্যি রহস্যময়।

'প্রতিনিধি' পত্রিকার মিলনবাবু বললেন, এত বছর হিল্লী, দিল্লী ঘুরেছি। কেন যে এদিকে আসিনি! বর্ষায় একবার ঘুরে যাব।

সুর্য ডোবার সাথেই জলের রং পাল্টে গেল। অরণ্যের সঙ্গে একাত্মতা শুরু হল। সভ্যজগৎ এখান থেকে অনেক দূরে। কলকাতার মানুষগুলি অজানা ভয়ে এবং আনন্দে রোমাঞ্চিত। লঞ্চ সজনেখালির ঘাট ছুঁইছুঁই করছে। এবার নামার পালা।

সজনেখালি

লঞ্চ ঘাটে থামতেই অনেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল। পারে উঠে সকলেই হাত পা ঝেড়ে কাঠের ঘরের সামনে দাঁড়াল। খুঁটির উপর ঘরগুলি দাঁড়িয়ে আছে। গাইড বলল, এই ঘরগুলিই টুরিস্ট লজ। এ অরণ্যে, সভ্য জগতের মানুষদের থাকার ঘর। বন্যজন্তুর নাগালের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে ও উচ্চতায়, ঘরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। গুঞ্জরিত হয়ে উঠল স্থানটা।

বনবিভাগের কর্মীদের ব্যস্ততা। পর্যটন বিভাগের কর্মকর্তাদের তদারকি। ডায়নামোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাইক, ফুলের মালা মিষ্টির প্যাকেট ও খাবারের সামগ্রী। মন্ত্রী, আমলা ও কর্মীদেরই অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ এখানে খুব কম। জেলে, বাউলে ও কাঠুরে কয়েকজন এসেছে। ক্লান্ত সবাই। তা ছাড়া অজানা অচেনা পরিবেশ। বাঘ ও সাপের ভয়ে বাইরে কেউ গেল না।

চা, কফি যার যেমন পছন্দ, বয় দিয়ে গেল। বনবিভাগের অফিসার গুহবাবু সকলের সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন।

সময় বয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয় হয়। হাঁকডাক। সকলে মঞ্চের দিকে এগোল। মন্ত্রী মহোদয় তড়িঘড়ি করে ফিতে কাটলেন। আমলারা মালা, চন্দন ও কাঁচি হাতে তুলে দিল। এমন কর্মব্যস্ততা ও দায়িত্বজ্ঞান অন্য সময় দেখালে দেশের অনেক উন্নতি হত। সুকন্যার ডাক পড়ল মালা পরাতে। লজ্জা পেলেও সে অনুরোধ না রেখে পারল না। রোমাঞ্চিত হল সে। সাংবাদিকরা তাঁর ভাষণের নোট নিলেন, ফটোগ্রাফাররাও ছবি তুলতে কার্পণ্য করেননি।

কয়েকজন অফিসার তাঁদের অভিজ্ঞতার কিছু চিত্র তুলে ধরলেন। বাণীদেবীকে চাপে পড়ে 'খোল খোল দ্বার……' গানটি উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে গাইতে হল।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। মিষ্টি মুখের পালা। মাঝি-মাল্লারাও এসেছে। গোসাবা, ক্যানিং ও দয়াপুরের কিছু নিমন্ত্রিত অতিথিও ছিল।

— বৌদি খবরের কাগজে আপনার নাম ছাপা হচ্ছে। একজন মন্তব্য করলেন পাশ থেকে।

—কী আর হবে? কোন পাঠক মনে রাখে না। কত নামই তো রোজ বের হয়। আমাদের অন্দর মহলই ভাল।

—কী যে বলেন বৌদি? একটু নাম ছাপাবার জন্য আমাদের কত খাতির। কত টাকা খরচ করে। কত প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা পার্টি দেয়। সাংবাদিক বিমল সাহা পাশ থেকে বলল। এই দেখুন না আমাদের এনে এরা কত টাকা ব্যয় করছেন।

—কে থাকবে এখানে? জল নেই। দোকান নেই। শুধু বন। তেরলক্ষ টাকার বাড়ী। সিট পিছু ছাব্বিশ টাকা, মাংসভাত বারো টাকা। পাগল ছাড়া কেউ থাকবে না। নীচুগলায় বাণাদেবী বললেন।

ততক্ষণে পৃথিবীতে রাত নেমে এসেছে। বাঘ, সাপের ভয়ে সবাই যার যার ঘরে উঠলেন। নতুন ঘরে বিছানা বিছানো। কর্মীদের সেবার ত্রুটি নেই। টেপরেকর্ডে হেমন্তকুমারের গান পরিবেশকে মুখর করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পর শুরু হল খাওয়া দাওয়ার পালা। সবাই ভূরি ভোজন করলেন। সুদর্শন খাওয়ার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে। বেশী খেল না।

শোয়ার সময় অজিতবাবু বললেন, সুদর্শন তুমি অন্য কামরায় যেয়ো না। আমি তুমি একখাটে। বাণী ও সুকন্যা অন্য খাটে শোবে। একটা রাত দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

ঘুমের আগে অজিতবাবু ও সুদর্শন বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে এল। নতুন ঘর। রঙের গন্ধ। ত্রিশটি ঘরে দুটি করে বেড। কাঠের ঘর। বেশ ছিমছাম। চারদিক গরান গাছের ডালের বেড়া দিয়ে ঘেরা। চাঁদের আলো বনের মাথায়। আলো ভেদ করে বনে ঢুকতে পারছে না বলে বনটা কালো দেখাচ্ছে। নদীর জল রূপোলী চাদরের মত। জেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। ভাঁটার টান চলছে।

কি কুক্ষণে যে সুদর্শন একঘরে শুতে রাজী হল। এ অভিজ্ঞতা থাকলে সে রাজী হতো না। দু'জনের নাসিকা গর্জন নয়তো, যেন দু'টো বাঘ পরস্পর হাঁকডাক দিচ্ছে। অখণ্ড নির্জনতায় গর্জন আরও জোরে বাজতে লাগল।

সুদর্শনের ঘুম হল না। শুয়ে শুয়ে স্মৃতি রোমন্থন, সঙ্গীদের কথা ও পরদিনের পরিকল্পনা ভাবতে ভাবতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ঘুম আর এল না। রাত ভোর হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

সকালে চা পর্ব শেষ হলে টাওয়ারে ওঠার পালা। আশা এই, টাওয়ার থেকে বাঘ দেখা যাবে। ছুটতে ছুটতে সকলে কাঠের টাওয়ারে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দেখে, পেছনে নদী বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সামনে সীমাহীন বন। গাছ আর গাছ। টাওয়ারের কয়েকশ গজ দূরে ছোট মিঠা জলের পুকুর। একদল হরিণ, মোরগ চ'রে বেড়াচ্ছে। বাঘের দেখা নেই।

—কি বাবা, বাঘ কোথায়? এত কষ্ট করে এলাম। সুকন্যার কিন্নরী কণ্ঠ বেজে উঠল।

—এখানে বাঘ আসে না। মানুষজন থাকায় বাঘ এমুখো হয় না। আমি সাত বছর চাকরী করছি। বাঘ মাত্র দু'বার দেখেছি। একজন কর্মী বলল।

—এত ঘটা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া কেন? এখানে এসে তবে কি দেখবে? শুধু জল আর গাছ? বাণীদেবীর টিপ্পনী।

—বিজ্ঞাপনেই বাঘের ছবি দেখা যায়। জ্যান্ত বাঘ দেখা দুর্লভ ব্যাপার।

অজিতবাবু ক্যামেরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফটো তুললেন। বাঘ দেখতে না পাওয়ায় সকলের মন খারাপ। কলকাতা গিয়ে কি গল্প করবে?

বনের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত লোহার জাল ঘেরা পথ থাকলে আমরা বাঘ, সাপ, হরিণ, বানর ও শুয়োর দেখতে পেতাম। কি মজা

হতো। পৃথিবীর কোন্ দেশে যেন এমন ব্যবস্থা আছে। সুকন্যা গাইডকে লক্ষ্য করে বলল।

তোমার সঙ্গে কত সাংবাদিক। ওদের লিখতে বলবে। আমরাও বেঁচে যাই। গাইড মৃদু হেসে বলল। কয়েকজন অফিস ঘরে, কয়েকজন অফিসঘরের নিচে দাঁড়াল। কৃত্রিম মানুষ তৈরী করছে একজন।

—ও ভাই কি হচ্ছে? কি হবে এগুলি দিয়ে? বাণীদেবী কৌতূহল প্রকাশ করলেন

লোকটি বলল—মাটির মানুষগুলোকে বাউলে, মৌলে, কাঠুরে ও জেলে সাজিয়ে ২২০ ভোল্ট কারেন্ট দিয়ে বনে রাখা হবে। বাঘ ঝাঁপ দিলেই শক্ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে কিছু সময় পড়ে থাকবে।

—তাতে লাভ কি?

—ওরা মানুষকে ভয় পাবে। ভাববে মানুষের মধ্যেও প্রচণ্ড শক্তি আছে। দূর থেকে দেখে পালিয়ে যাবে।

একবার শিক্ষা পেলে মানুষ দেখলে আর ঝাঁপ দেবে না।

—বেশ মজা তো! এ বুদ্ধি মাথায় এল কি করে? কিছু ফল পেয়েছেন? লোকটি বলতে লাগল—১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হয়েছে। ১৯৮৪ বাঘ সুমারীতে ২৬৪টি বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ১৯৮৩ সালের জুন মাসে এই পদ্ধতি চালু করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার বৈদ্যুতিক রেডার বিশেষজ্ঞ ডঃ রবার্ট এল, পিক্সে (Picsse) টাইগার গার্ড গিয়ার, ইলেকট্রিক ফেন্স (Fence) ও নকল মানুষ দেখে খুব উৎসাহ বোধ করেছেন। তবে বাঘ খুব চতুর, সহজে কাছে আসে না।

—বনের মধ্যে বাঘ গোনা যায় নাকি! ওরা কি আপনাদের সামনে দল বেঁধে দাঁড়ায়। বাণীদেবী প্রশ্ন করে হেসে উঠলেন।

—না দিদি, বিশেষজ্ঞরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখে সংখ্যা বলে দিতে পারেন। এইভাবেই পৃথিবীতে বনের পশুর সংখ্যা গণনা চলছে।

—ভারতে ক'টি প্রকল্প আছে? মোট বাঘের সংখ্যা কত?

—ভারতে পনেরোটি ব্যাঘ্র প্রকল্প আছে। ১৯৮৪ সালের বাঘসুমারী অনুসারে বাঘের সংখ্যা ৪০০৫টি। তারমধ্যে পঃ বঙ্গে বাকসা ও সুন্দরবনে দু'টি প্রকল্প। সব বাঘই নরখাদক নয়। শতকরা পঁচিশ ভাগ বাঘ নরখাদক। অন্যরা অনিচ্ছুক ও মারমুখী মাত্র।

—নকল মানুষ বসিয়ে কোন ফল পেয়েছেন? বাঘ এসে ঝাঁপ দিয়েছে?

—নিশ্চয়, কয়েকবার। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে নেতিধোপানীর রাস্তায় বাউলে বসানো হলো। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রকল্পের অধিকর্তা, আমেরিকান কনসাল জেনারেল জর্জ শেরম্যান ও বন বিভাগের কর্মীরা গিয়ে দেখেন ঐ কৃত্রিম বাউলে উল্টে পরে আছে। ডান কাঁধে গভীর দাগ। পুরুষ বাঘ, স্ত্রীবাঘ ও বাচ্চা বাঘের পায়ের দাগ। সুধন্যখালিতেও ১৯৮৫ সালের মে মাসে নকল মৌলেকে বাঘ ক্ষত বিক্ষত করে দিয়ে গেছে। প্রায় আট—দশবার বাঘ বোকা বনে গেছে। তবে দিনের বেলা কারেণ্ট থাকে না বলে বাঘ এই ডামীগুলিকে ভেঙ্গে চুরে দিয়েও গেছে। একবার রাগে ঝড়খালি গ্রামের বিশালাক্ষীদেবীর মুণ্ডু পর্যন্ত কামড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। আসলে সে মানুষ না পেয়ে রাগ দেখিয়েছে।

—আপনারা বাউলে, মৌলে ও বাওয়ালী কাদের বলেন?

—মৃদু হেসে বললেন, মৌলেরা মধুসংগ্রহ করে, বাওয়ালীরা বাঘের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মন্ত্র পড়ে। বাওয়ালীদেরই বাউলে বলা হয়। এতগুলি মানুষ ওর কাজ দেখছে বলে সে একটু খুশিই হল।

প্রসঙ্গ পাল্টে গেল। সুকন্যা প্রশ্ন করল, বনবিবির পূজা হয় কেন? কখন হয়?

—এখানকার মানুষদের ধারণা বনবিবির পূজো দিয়ে বনে ঢুকলে বাঘ আর আক্রমণ করবে না। বনবিবি রক্ষা করবেন। মুন্সী বুয়ামুদ্দিনের লেখা 'বনবিবির জহুরনামা' বইটি পড়ে পুজো দেওয়া হত। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে পূজার সময় হিন্দু-মুসলিম সকলেই

অংশ নেন। তবে এখন মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য পাচ্ছে, আর ১৯৭৪ সাল থেকে রাতে বনে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। বনে ঢুকবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে। এ সময়ের মধ্যে বাঘ বেরোয় কম। মাছ, মধু ও কাঠ দিনের বেলাতেই সংগ্রহ করা হয়।

ব্যাঘ্র প্রকল্পে ঢোকার মুখে ডান দিকে কচ্ছপের ডিম ফোটাবার ও বাঁ দিকে বনবিবির পূজোর ঘর। বনবিবির পাশে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ-রায়ের মূর্তি। এটুকুই যা নতুন আকর্ষণ। বৎসরে একবার ঘটা করে পূজো হয়। বনের লোকজন আসে।

মন্ত্রী ও আমলারা সকলে সাংবাদিকদের নিয়ে কলকাতা চলে গেছেন। সুদর্শনরা গেল না। অফিসারের ঘরে গিয়ে উঠল। কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে।

অফিসার বললেন—কেমন দেখলেন?

—আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

—কে থাকবে এই বাড়ীতে? যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। দোকান নেই। জল পর্যন্ত কিনে খেতে হয়। ডাক্তার বদ্যির জন্য গোসাবা, ক্যানিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কাঠ ছাড়া সবই কেনা। অফিসে দু'তিনজন গ্রামের সাধারণ মানুষ বসে ছিল। বনে ঢোকার অনুমতি নিতে এসেছে। একজন বলল—রিপোর্টারবাবু, আমাদের কথা লিখবেন?

—কি কথা? লেখার বিষয় হলে লিখব না কেন?

—গুহবাবু বদলি হয়ে যাচ্ছেন। খুব ভাল মানুষ উনি। আমরা গরীব মানুষ। বন আর জলই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। পুলিশ ও বাবুদের ঘুষ দিয়ে আমাদের কিছু থাকে না। তার উপর বাংলাদেশী ডাকাতদের উৎপাত। আমাদের নৌকো, ওরা যখন তখন ধরে নিয়ে যায়। মোটা টাকা দিলে তবে ছাড়ে। মাছ, কাঠ সবই লুটে নিয়ে যাচ্ছে।

—কেন বি. এস. এফ. কি করছে ? ওদের পেছনে সরকারের কম টাকা খরচ হচ্ছে !

—আরে মশাই, ঠিক মত ডিউটি দিলে আপনাদের লেখার যে কিছুই থাকবে না। বোঝেন না, ওদেরও ভাগ জুটে যায়। অপারেশানের সময় দূরে সরে থাকে। শতকরা নব্বুই জন সরকারী কর্মী কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। আমাদের পতনকে রোধ করবে কে ? সুন্দরবনের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। অপব্যয় মশাই, অপব্যয়। দুর্নীতিতে সব ছেয়ে গেছে।

সুদর্শন ভাবে যে দেশে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলের ঘরবাড়ী নেই, বেড়া নেই ও বেঞ্চ নেই, সেখানে বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা ঋণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জলে টাকা ঢালছেন। বেকার সমস্যাও চাপা পড়ে আছে। বনেও নানা সমস্যা বাড়ছে।

লোকগুলি বাঁশের খোল থেকে রোলকরা কাগজ বের করল। গুহবাবু সই করে দিলেন। বনে ঢোকার পাশ। ওরা খুশি হল। গুহবাবু উঠে নিজের ঘরে গেলেন। একজন বলল, রিপোর্টারবাবু, আমাদের এর জন্য গুনাগার দিতে হয়।

ক্লার্ক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তোমরা এর জন্য বেশী সুযোগ নাও না ? বেশী বেশী কাঠ, মধু ও মাছ সংগ্রহ করে সরকারকে ঠকাও না ?

সুদর্শন চুপ করে থাকে। এ ভাবেই চোরা ব্যবসা চলে। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

ওয়্যারলেসে কথা ভেসে এল। গোসাবার অফিসার (ওরা বলেন রেঞ্জার সাহেব) অরুণ চক্রবর্তী তলব করছেন।

গুহবাবু ছুটে এসে বনের পরিস্থিতি ও গতকালের অনুষ্ঠানের খবর দিলেন। পা ভাঙ্গা কচ্ছপের সেবা শুশ্রূষা কেমন চলছে জিগ্যেস করলেন উনি। কাল অসুস্থতার জন্য এখানে আসতে পারেননি। চক্রবর্তীবাবু দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কথা শেষ করে গুহবাবু বললেন, এই চক্রবর্তীবাবু ভাল মানুষ। খুব কর্তব্যপরায়ণ। সাধারণ কর্মীরা খুব শ্রদ্ধা করেন। ওর কাছে অনেক

তথ্য পাবেন। আর ক্যানিং-এ ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা প্রণবেশ সান্যাল মশাই আপনাকে ডিটেলস্ তথ্য দিতে পারবেন। ওঁদের কাছে সব রেকর্ড আছে। দুপুরে লঞ্চ যাবে। যেতে পারেন। আমি বলে দেব।

আপনারা বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? এতো টাকার শ্রাদ্ধ। কি লাভ? বেকারদের জন্য খরচ করলে কাজ হতো।

—সুদর্শনবাবু, আপনি জানেন পৃথিবী থেকে কত প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আপনি কি চান বাংলার এই ঐতিহ্যশালী প্রাণীটি অবলুপ্ত হয়ে যাক্?

—কেন বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে? শিকারীদের বারণ করে দিলেই তো পারেন?

—ভারতে চল্লিশ হাজার বাঘ, সত্তর বছরে কমে আঠারোশ'তে এসেছে। শিকারীরা শুধু মারেনি, বনও সংকুচিত। ফলে বাঘ কমে যাচ্ছে। বাঘের বিচরণ ভূমি কোথায়? বাঘের খাদ্য হরিণ, শুয়োর ও গোসাপ কমে যাচ্ছে। বনটাও একটা কারখানার মত। বাঘের আবাসভূমি ম্যানগ্রোভ (mangrove) সংরক্ষণের ফলে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে। মাছ, মধু ও কাঠ চুরি কমছে।

—এখানকার বাঘের বৈশিষ্ট্য কি? কেন এরা পৃথিবী খ্যাত?

—বিশাল আকৃতি। বাদাবনের অধিকাংশই জল। পৃথিবীর আর কোথাও জল কাদায় বাঘ চড়তে দেখা যায় না। আট কিলো মিটার চওড়া নদী, বাঘ অনায়াসে সাঁতার দিয়ে পার হতে পারে। পিঠে গরু, ঘোড়া নিয়েও সাঁতার দেয়। গতিও খুব দ্রুত। সত্যি বিস্ময়কর প্রাণী। রয়েল বেঙ্গল টাইগার কি এমনি এমনি!

—মধু কিভাবে সংগ্রহ হয়। বছরে কত মধু জমা পড়ে?

—বন সংরক্ষণের ফলে মধু বেশী হচ্ছে। যারা মধু সংগ্রহ করে ওদের মৌলে বলে। বনদেবীর পূজো দিয়ে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে গাছে

মধু খোঁজে। মৌচাক ভাঙতে গেলে অন্যরা লাঠি, বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। তবু নিঃশব্দে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুদ্ধি এবং ক্ষিপ্রতা অসম্ভব বেশী। .৯৮৪ সাল পর্যন্ত গড়ে ৪০০ কুইন্টাল মধু সংগ্রহ হত, এখন সেখানে ৭৭৭ কুইন্টালের বেশী হচ্ছে। মোমের সংগ্রহও বেড়েছে।

—কখন মধু সংগ্রহ হয়? বারোমাস?

—না, এপ্রিল-মে মাসে বাদাবনের গাছে গাছে ফুল ফুটে ওঠে। খলসী, গরান, কেওড়া ও গেঁওয়া গাছেই মধু বেশী হয়। বর্ষায় আসবেন, খাঁটি মধু পাবেন

—শুনেছি বাঘের হাতে মারা গেলে ঐ পরিবারকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়? বছরে কতজন বাঘের পেটে যায়? কতটাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়?

আমাদের রেকর্ড বলে, ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ৪৫ জন মারা গেছে। ১৯৮4 সালের পর বছরে গড়ে ২১ জন। সরকারী অনুমতি যাদের আছে তাদের পরিবার দরখাস্ত করলে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ পায়। গোপনে যারা বনে ঢোকে, তাদের কেউ বাঘের কবলে পড়লে আমাদের জানায় না। আইনের ভয় আছে। বনে ২৫২টি বাঘ, ১২টি শাবক আছে। একটা বাঘ দিনে গড়ে ৭.৫ কেজি মাংস খায়। বনের সব বাঘের দৈনিক ৮৯০ কেজি মাংস প্রয়োজন। পেট না ভরলেই মানুষকে তাড়া করবে। কোথায় পাবে এত মাংস?

আরও কিছু প্রশ্ন করে সুদর্শন। ঐদিকে বাণীদেবীরা তলব করছেন। ওদের এসব শুনতে ভাল লাগছে না। অগত্যা সুদর্শন গুহবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে এল। লঞ্চ ঘাটে বনবিবির মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুলবেন বাণীদেবী। সুদর্শনকে পাশে চাই।

সুদর্শন মধ্যখানে। দু'পাশে মা ও মেয়ে। ছবি তুললেন অজিত-বাবু। শেষে গেষ্ট হাউসে সকলে গিয়ে বসল। খাওয়া দাওয়া মিটলে গোসাবার পথে পাড়ি দেবে। এখানে থেকে কি লাভ?

অজিতবাবুরা ঘরে ঢুকেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। সুকন্যা

সিনেমার ম্যাগাজিন বের করে শিল্পীদের ছবি দেখতে লাগল। সুদর্শন বাইরে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘুম, ক্লান্তি নেই। বরং আছে আনন্দ ও উৎসাহ। জল-জঙ্গলের আকর্ষণ তাকে পেয়ে বসেছে। এ অরণ্য যেমনি ভয়ংকর তেমনি আকর্ষণীয়। ধ্যানমগ্ন ও বৈচিত্র্যময়। এখন তার চোখে হ্যামিলটনের দেশ গোসাবার স্বপ্ন। সকাল থেকে হাল্কা মেজাজ। ঘাড়ে কোন দায় দায়িত্ব নেই। কমলেশ রায় অন্য কাগজের সাংবাদিক হলেও তার বন্ধু ও সহপাটি ছিল। রিপোর্টটা রাতে লিখেই ওর হাতে দিয়ে সম্পাদকের কাছে পৌছে দিতে বলেছে। অজিতবাবু অনুষ্ঠানের নেগেটিভ রিলটা ভাল করে মুড়ে দিয়েছিলেন। দায়িত্ব শেষ। নিশ্চিন্ত দু'জনই। দু'তিন দিন ছুটি নিয়েই এসেছে। লেখার তথ্য সংগ্রহ করবে সুদর্শন, অজিতবাবু ফটো তুলবেন।

গোসাবার পথে

প্রায় তিনটা নাগাদ ওরা আবার লঞ্চে উঠল। ভট্ ভট্ শব্দ তুলে জল দানব গোসাবার পথে চলল। ভাঁটার টান। নদীর পার অনেক উপরে। গাছের ডাল বাতাসে দুলছে। হরেক রকম পাখির কিচির-মিচির। মাটি ফুঁড়ে অসংখ্য শ্বাসমূল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নোনামাটি, নোনাজলে পোষায় না, তাই মুক্ত বায়ু চাই-ই। এসব গাছের বীজ ঝরে পড়ার আগেই অঙ্কুরিত হয়। মাটিতে পড়েই শিকড় ডুবিয়ে মাটি কামড়ে ধরে। প্রকৃতির কি অপূর্ব ব্যবস্থা।

লঞ্চ এগিয়ে চলে। সুদর্শন, অজিতবাবু সারেঙের পাশে বসে। দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায়। ঐদিকে বাণীদেবী গুন-গুন করে গান ধরেন। সুকন্যা সিনেমা পত্রিকায় নায়ক-নায়িকাদের ছবি দেখে।

সুধন্যখালির অবজারভেটরী টাওয়ার পেছনে ফেলে বনের পর বন, নদীর পর নদী. খাল পেরিয়ে যায়। আজ সময় নেই। অন্য সময় এলে দেখবে। ডায়নামো আর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

সারেঙ নানা প্রশ্নের জবাব দেয়। সুদর্শন লিখে নেয়। সুন্দরবন হল নদী নালার দেশ। অসংখ্য নদী, খাল একে ঘিরে আছে। দ্বীপের মধ্যে অজস্র খাল সাপের মত এঁকে-বেঁকে ঢুকেছে। বনের গাছ-পালা আর মাঠের শস্য রস চুষে নিচ্ছে এই খালের জল থেকে।

সুন্দরবনের নরখাদকরা বিশ্বস্ত প্রহরী। মাছ, মধু, মোম, কাঠ ইত্যাদি পাহারা দিচ্ছে। চতুর মানুষ তার চোখ এড়িয়ে সংগ্রহ করছে! চোর ও পুলিশ দুইই পাশাপাশি। প্রকৃতির কি লীলা!

সুদর্শন নদীর ধারে চোখ ফেলে। ছোট ছোট অসংখ্য লাল কাঁকড়া, একবার গর্তে ঢুকছে, আর একবার বের হচ্ছে। ভাঙ্গনমাছ, মেনি মাছের পোনা লাফাচ্ছে জলে। জলের ঢেউয়ে ওঠছে নামছে। জেলে, জেলেনিরা কুঁচো বাগদা চিংড়ি ধরায় ব্যস্ত। সারেঙ বলল,

বিনা পুঁজিতে এ অঞ্চলের মানুষদের বাঁচার, রোজগারের ব্যবস্থা স্বয়ং ভগবানই করে রেখেছেন। তবে সভ্য জগতের মানুষদের আনাগোনায় এরা বিপন্ন। সরকার সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করায় এদের অবাধ রাজত্বের অবসান হয়েছে।

সারেঙ অভয়চরণ মণ্ডল নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে যায়। মেসিনের শব্দের জন্য অনেক কথা শোনা যায় না। সুদর্শনকেও জোরে কথা বলতে হয়। নদীর জল সমুদ্রমুখো, তাই ধীরে ধীরে লঞ্চ এগোয়। অভয়চরণ বলে ভাঁটায় দেড় ঘণ্টা সময় বেশী লাগে। ওর সহকারী চা করে দেয়। রান্না, খাওয়ার সব ব্যবস্থাই লঞ্চে আছে। জলপথে কয়েকদিন থাকতে হয় বলে সব ব্যবস্থাই রাখতে হয়। সজনেখালির বনে একবার বাঘ লঞ্চ দেখে হুঙ্কার দিয়ে পালিয়েছিল, আর একবার দেখেছে সাঁতরে নদী পার হতে।

এছাড়া গত সাত-আট বছরে সে বাঘ দেখেনি। ওর স্পষ্ট কথা, বাঘ দেখার নাম করে বিজ্ঞাপন ছাপেন, মানুষ এখানে এসে বিফল হয়ে যায়। ওখানে খাঁচায় দু'টো বাঘ রাখলে ক্ষতি কি? আপনি এসব নিয়ে লিখুন।'

লোকটার সরলতা দেখে অজিতবাবু বললেন, ও ভাই আমাদের একদিন মরিচঝাঁপিতে নিয়ে যাবেন? কিছু খরচ লাগলে দেব।

বর্ষায় আসবেন, এখন লঞ্চ পাওয়া যাবে না। আর সে মরিচঝাঁপিও নেই। রিফুজিরা নারকেল বাগান সাবাড় করে ফেলেছে। এখন শুধু বন। নদীপথেই দেখতে হবে। বনে নামা যায় না। শেষে বলল, আমার একটা ছবি তুলে দেবেন। পাসপোর্ট করব। বাংলাদেশে যাব। পরিবার আনতে যাব। দেখতে দেখতে বিকেল উতরে গেল। বাঁধের উপর দিয়ে মানুষজন গ্রামে ফিরছে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। সভ্য জগতের আলোর বাইরে। না আছে শরীরের দীপ্তি, না আছে পোষাকের জৌলুষ। বরং দৈন্যতার ছাপ চোখে মুখে।

পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা পা রেখেছে। বড় নদী বিদ্যা পেরিয়ে লঞ্চ ছোট নদী দুর্গাদোয়ানীতে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোসাবার ঘাটে

এসে পৌঁছে। এঘাট একমাত্র বনবিভাগের লোকজনদের জন্য। ঘাটের পাশে ছোট বন, সারি সারি নৌকো। দু'টো লঞ্চ নোঙর করা আছে।

সারেঙের কথামত অজিতবাবুরা বাজারে ঢুকে ভাগ্যলক্ষ্মী মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে টিফিন করার জন্য বসল। কাছে দু'তিনটা হোটেল। শহরের লোকেরা নাক উঁচু করবে। পেট পুরে সকলে সিঙ্গারা, জিলিপি, কাঁচাগোল্লা খেল। খালাসীও বাদ গেল না। দাম মিটিয়ে হোটেলের খোঁজে যাবেন এমন সময় একজন যুবক সাইকেল থামিয়ে সামনে দাঁড়াল।

—কি খবর সুদর্শন, তুমি এদিকে? কাগজে তোমার নাম দেখি। কি মনে করে এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে।

—তুই এখানে কি করিস? কত বছর পর দেখা। সেই গোবরডাঙ্গা কলেজের স্মৃতি। ভাবলে মনে হয়, সেদিনের। আনন্দমুখর দিনগুলি আর ফিরে আসবে না।

—আমার বাড়ীতো রাঙ্গাবেলিয়ায়। এম. এ. পাশ করে কিছুদিন মাষ্টারী করেছি। এখন মন্দিরের কাজে ব্যস্ত। সুধীরদার সঙ্গে কাজ করছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে টাকা সংগ্রহ করতে হয়। কলেজের নতুন হোস্টেলের স্মৃতি আজও সুখ দেয়। সুবোধকে সুদর্শনের আগমন-বৃত্তান্ত বলল। ও বলল, হোটেলে থাকবি কেন, আমাদের মন্দিরে থাকতে পারিস। একটু কষ্ট হবে। আমাদের সঙ্গ পাবি। তবে ভাই নিরামিষ খেতে হবে।

অজিতবাবুরা রাজী হলেন। নোংরা হোটেলে থাকার চেয়ে মন্দিরে থাকা অনেক ভাল। অর্থেরও সাশ্রয় হবে। এ দু'দিন প্রচুর আমিষ খেয়েছি। নিরামিষ খেলে পেট বিশ্রাম পাবে। কথার শেষে অজিতবাবু হেসে ফেললেন।

সুবোধ ওদের এনে একটা বইয়ের দোকানে বসাল। ভাঙা কুঁড়ে ঘর। একটা খাটে বইপত্র। একপাশে বৃদ্ধ, শীর্ণদেহী, পক্ক কেশের

একজন কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। ইনি আমাদের সুধীরদা। এই মন্দিরের সম্পাদক। এঁনার চেষ্টাতেই সব গড়ে উঠেছে। গোসাবার সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। সুবোধ তাঁর পরিচয় দিল।

সুধীরবাবু মুখ তুলে ওদের বেঞ্চে বসতে বললেন। ও বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিল। সাংবাদিক পরিচয় শুনে তাঁর গম্ভীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। উনি চা আনতে বললেন।

সুদর্শন গরান গাছের বেড়ায় ঝুলানো নীলমনি দাসের যোগ-ব্যায়ামের চার্টের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি চা খাই না। অজিতদারা এইমাত্র খেয়েছেন। এখন থাক।

উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। সুবোধ ও সুদর্শন আরো আগে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। পেছনে অজিতবাবুরা।

জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। নদীর স্বচ্ছ জল ঝিকিমিকি করে ঠিক, ইলিশ মাছের পিঠের মত। বাতাস ঠাণ্ডা। ক্লান্তি অবসাদ দূর হয়ে যায়। সুদর্শন প্রাণ ভরে বাতাস টেনে নেয়। সুকন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলে, এই যে খুকি, এমন ফ্রেস বাতাস কোথায় পাবে? প্রাণ ভরে খেয়ে নাও। আয়ু বেড়ে যাবে।

পথে লোকসংখ্যা কম। থানার সামনে একদল মানুষ। ও বলল, ও. সি. মাছ ধরার পারমিট ইস্যু করছেন। দূর থেকে মন্দিরের চূড়া চাঁদের আলোয় রূপোর মত ঝলক দেয়।

বাঁধের উপর হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের কাছাকাছি এলে সুকন্যা বলে উঠল, কি কাকু আমাদের এ মন্দিরের কথা বলোনি কেন? অপূর্ব। প্রকৃতির কোলে স্বর্গের মত! এখানে না এলে সুন্দরবন বলতে শুধু বনকেই বুঝতাম।

বাঙালীরা ভীরু অলস, তাই পাড়ায় পাড়ায় মন্দির। ভারতবর্ষের মত এত মন্দির পৃথিবীর কোথাও নেই। মাছের গুদাম করলে জেলেদের উপকার হতো। অজিতবাবু হঠাৎ কড়া মন্তব্য করে ফেললেন।

সুদর্শন ধর্ম কি তা জানে না। তার অশ্রদ্ধাও নেই, আবার

অবিশ্বাসও নেই। আশ্রমের লোকটি এমন মন্তব্যে ব্যথা পাবে; তাই সে বলতে বাধ্য হল, পয়সাওয়ালা মানুষের তো অভাব নেই দেশে, তারা কেন গুদাম বানাচ্ছেন না? এঁরা ভিক্ষে করে একটা জিনিষ দাঁড় করিয়েছেন, আমরা নিন্দে করব কেন? ইস্কনও দেশে দেশে মন্দির বানাচ্ছে। রাশিয়া চীনেও অভিযান চালিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচারে নেমেছে। 'গ্লাসনস্ত' ও পেরোস্ত্রৈকার জন্য মন্দির তৈরীর অনুমতিও পেয়েছে। ১৯৮৯ সালের দোল উৎসবে ভারতে ৫৯ জন রুশ কৃষ্ণভক্ত এসেছেন। কমুনিস্টদের মত পালটাচ্ছে। আপনিই বিমানবন্দরে ফটো তুলেছেন। তখন নীরব ছিলেন কেন? রাশিয়া বলে? চীনদেশেও প্রচার চলছে। বিবেকানন্দের বই খুব কাটছে।

বাণীদেবীও না বলে পারলেন না, তোমার দাদার ঐ স্বভাব। শুধু মার্কস ও লেনিনের গুণগান। ওঁরাই নাকি ভারতবর্ষের দারিদ্রের ভূত তাড়াতে পারেন। আমার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক বাঁধে। অশান্তি দেখা দেয়।

একজন মোটা-লোক এগিয়ে এসে বললেন, আসুন, আসুন। আমাদের সৌভাগ্য! বলতে বলতে হাতের ব্যাগ, এটাচি টেনে নিলেন। কারও আপত্তি শুনলেন না।

মন্দিরের চত্বরে ঢুকে মা ও মেয়ে হাতজোড় করে প্রণাম জানাল। অজিতবাবু ও সুদর্শন গেস্টহাউসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এমন জায়গায় এত বড় মন্দির, গেস্ট হাউস কল্পনাও করা যায় না। হোটেলে উঠলে নরকেই থাকা হতো। অজিতবাবুর ভালো লাগার উপলব্ধিসূচক কিছু শুনতেই কথাটি বলল সুদর্শন।

একটা রুমে জিনিষপত্র রেখে ঐ ভদ্রলোক বললেন, বিশ্রাম নিন, বিছানাপত্র পরে ঠিক করে দেব। সঙ্গের যুবকটি জানালা খুলে হাত মুখ ধোয়ার জন্য বাথরুম খুলে দিল।

বাণীদেবী ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে সাবান, পাউডারের কৌটো বের করে বলল, তোমরা বসো, আমি আগে হাত মুখ ধুয়ে আসি। বন জঙ্গলের দেশে এমন ঘর, বাথরুম সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

লোকটি টেবিল ল্যাম্পের আলো বাড়িয়ে বলল, আমি চা নিয়ে আসি। হাতমুখ ধুয়ে নিন। মোটর চালিয়ে ট্যাঙ্কে কিছু জল তুলে রাখছি।

হাতমুখ ধুয়ে সবে বসেছি, এমন সময় দশবারোজন স্ত্রী-পুরুষ বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সুদর্শন দরজার পাশের খাটে বসা। মন্দিরের লোক ভেবে একজন জিজ্ঞেস করল—সুধীরদা কোথায়? আমরা সোদপুর থেকে এসেছি। কোথায় থাকব? বেড়াতে এসেছি। বন দেখবো।

আমরাও বেড়াতে এসেছি। একটু অপেক্ষা করুন কেয়ার-টেকারবাবু এখনই আসবেন। সুদর্শন কথা বলে ওদের দিকে চোখ ফেলল।

—জল খাব। অনেক পথ হেঁটেছি। লঞ্চ না পেয়ে বাসন্তী ঘুরে এসেছি। কি কষ্ট বাব্বা। একজন ভদ্রমহিলা সোজা ঘরে ঢুকে সুদর্শনের মুখোমুখি বসল।

ভদ্রমহিলা দেখতে সুদর্শনা। সুঠাম শরীর। চোখ টানে। সুদর্শন সোজা হয়ে বসে, ফ্লাস্ক থেকে গ্লাসে জল ঢেলে দিল।

—ধন্যবাদ। একটু বসে নেই। পা টন্‌টন্‌ করছে। বলেই বসে পড়ল।

সুদর্শন সরে বসল।

অজিতবাবুরা বড় বড় চোখ তুলে তাকাল। ভদ্রমহিলার সাহস দেখে তাজ্জব বনে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দিরের দু'জন ভক্ত মুড়ি, নারকেল, ও চা এনে একটা বড় টেবিলে রেখে প্লেটে সাজাতে লাগল। একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করে সুদর্শন জেনে নিল কেয়ারটেকারের নাম বিমল দাশগুপ্ত। সংসার জীবন ত্যাগ করে এখানেই থাকেন। সুধীরবাবুর সহকারী। খুব সৎ ও বিশ্বাসী মানুষ।

বিমলবাবু এসেই ওদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলেন। ক্ষিপ্রগতিতে

একটা ত্রিপল বিছিয়ে দিল সামনের ঘরের বারান্দায়। ওদের ঐখানে বললেন। বিছানাপত্র মন্দির থেকে দেবে না। সাধারণ মানুষদের বাড়ী থেকেই বয়ে আনতে হয়। গেষ্ট হাউসে একমাত্র ভি আই. পি. দের জন্য।

সবাই উঠে গেল। বৌটি উঠল না। অন্য একটি বৌকে ডেকে পাশে বসাল। সাংবাদিক শুনে খুব কৌতূহল। কথা বলার ইচ্ছে।

সুন্দরবনে কি কি দেখার আছে? কোথায় কিভাবে যেতে হয়? সুদর্শনরা কবে এসেছে? কোথায় কোথায় গেছে? এমনি সব প্রশ্ন ওর মুখে।

সুদর্শনের সামনে সুন্দরবনের ম্যাপ, কিছু কাগজপত্র, তথ্যাদি সম্বলিত দু'টি পুস্তিকা ছিল।

আপনি সাংবাদিক? আপনাদের কি ক্ষমতা? যে কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে হেয় করে দিতে পারেন। আপনাদের অলৌকিক মানুষ বলে মনে হয়। তারপরই বৌটি জানাল, স্বামী অধ্যাপক ও ঘরকুনো মানুষ। বেঁটে বৌটি তার প্রতিবেশী। ওদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। কথা বলতে সে ভালবাসে। মনের মত মানুষ পেলে তো কথাই নেই।

এসময় বিমলবাবু ও দু'টি ছেলে কাপ প্লেটগুলি নিতে এলেন।

বিমলবাবু বললেন—আপনারা বিশ্রাম করুন। খেতে রাত হবে। রাঁধুনী এক ছোকরা ব্রাহ্মণ। মন্দিরে আর্য বিধান মেনে চলা হয়। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ রাঁধতে বা পরিবেশন করতে পারবে না। আমি সময় মত আপনাদের ডেকে নিয়ে যাবো। ওকে একটু সাহায্য করতে হবে।

বৌটির হাতে আঙ্গুল ভর্তি রত্ন পাথর। গলায় মাদুলি, হাতেও একটা। বেঁটে বৌটির হাতে তাবিজ। সুদর্শন তাকাতেই সুন্দরী বৌটি বলল - দুর্ভাগ্য তাড়াতে যে যা বলেছে ধারণ করেছি। কর্তার সঙ্গেও বনিবনা হয় না। পাথরের নাকি খুব ক্ষমতা, দেখা যাক! আপনার কি মত?

—দ্রব্যগুণে আমি বিশ্বাস করি। রোগব্যাধি নিরাময়ে ধাতুরত্নের কিছু ভূমিকা আছে নিশ্চয়। জ্যোতিষী ধরে ভাগ্য ফিরলে অনেকেই

ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলত। আমিও বড় লেখক হয়ে যেতাম।

—নানা মুনির নানা মত। যার যা বিশ্বাস। একটু আসছি। বলেই বৌটি উঠে গিয়ে সামনের বারান্দায় ত্রিপল বিছিয়ে, বিছানাপত্র গুছিয়ে পান নিয়ে এল। একটা পান, পাশের বৌটিকে দিয়ে আর একটা বের করে সুদর্শনের জন্য।

আমার অভ্যাস নেই। আপনি খান। সে সোজা হয়ে বসে। অজিতবাবুরা শুয়েই থাকল। কোন কথা বলল না।

সুন্দরবন সম্পর্কে কিছু বলুন। আমার কিছু জানা নেই। বন কোথায়? চারদিকে ঘর বাড়ী দেখছি। অন্য বৌটি বলল।

সুদর্শন বলতে শুরু করল, সুন্দরবন পৃথিবীর বড় ব-দ্বীপ। ৯৬৩০ বর্গ-কিলোমিটার জুড়ে এলাকাটি। লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশী। শতকরা ৮৮ জন মানুষ কৃষিজীবী। জনসংখ্যার শতকরা ৪২ জন তপশিলী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমানের সংখ্যা বারো লক্ষের মতো। পনেরোটি থানার অধীনে উনিশটি ব্লক। ছ'টি হাসপাতাল, ষোলটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ১৯২৫ সালে 'সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ' গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার এর উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন। বিশ্বব্যাঙ্ক একশ' কোটি টাকা ধার দিয়েছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর লর্ড ক্লাইভকে সুন্দরবন সহ ২৪ পরগণা দান করেছিলেন। ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এই গোসাবা ইজারা নিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। এবং কৃষকদের জন্য ইংলণ্ডে পর্যন্ত দরবার করেছিলেন। স্বায়ত্বশাসন চালু করেছিলেন এইখানে।

—সাহেবের পদধুলি পড়েছে বলেই এস্থান এত উন্নত। বাসন্তীতে পাকা রাস্তা, স্কুল, কলেজ, চার্চ দেখলাম। বাজার এলাকায় বিদ্যুত দেখলাম। বাসন্তী বেশ উন্নত জায়গা।

—হ্যামিল্টন সাহেব এখানে সমবায় সমিতি গঠন করেছিলেন। ভারতে সমবায় গ্রামের তিনিই প্রবর্তক। শুনছি এখানে টাকার নোটও চালু করে ছিলেন তিনি।

(ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি নিয়ে হ্যামিল্টন শুধুমাত্র গোসাবা

এলাকার জন্য এক টাকার বিশেষ ধরণের নোট চালু করেছিলেন।)

—হ্যামিলটন সা'হেব কে ? এখানে কবে বসবাস করতেন ? বৌটির প্রশ্নে সে বলল, অতশত জানিনা। তবে সুধীরবাবু, দাশগুপ্তবাবু ভাল বলতে পারেন।

— এই সুন্দরবনে পনেরোটি থানা, বলেন কি ?

—বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দেখুন লেখা আছে, ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথর প্রতিমা, মথুরাপুর। আলিপুরের (সদর) অধীনে জয়নগর, কুলতলী, ক্যানিং, বাসন্তী ও গোসাবা। বসিরহাটের অধীনে হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, মিনাখা ও হাড়োয়া।

—নামগুলি শুনেছি। পত্রিকার খবরে এখানকার চুরি, ডাকাতি ও মারামারির খবরই বেশী দেখা যায় :

—সুন্দরবনের তিনটি মহকুমার অধীনে ৫৪টি দ্বীপ। মিঠাজলের বড্ড অভাব। স্থানে স্থানে পুকুর কেটে, গভীর নলকূপ বসিয়ে পানীয় জলের, কৃষি ও মাছ চাষের ব্যবস্থা করছেন সরকার। টাওয়ার বসিয়ে ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থাও হচ্ছে।

—নোনা জলে চাষ হয় ? শুনেছি সুন্দরবনে ভাল ধান হয়।

—সরকারী তথ্য মতে ৭,৬৮,১০৭ একর চাষের জমি, তার মধ্যে ৪,৬৫৪ একর সেচের জমি আর অনাবাদী জমি ৭,৬৩,৪৫০ একর। চাষের জন্য চাতক পাখির মত প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। বৃষ্টি হলে ফসল হবে। নয়ত নোনায় ধরবে। ফসল রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মত হচ্ছে না বলে ফড়েরা সব লুটে নিচ্ছে।

—এদিকে কি কি ফসল হয় ?

—প্রায় সবরকমের শাক, কপি. পটল, বীট, তরমুজ, এছাড়া সব রকম তরকারি, আর ধান তো আছেই। আর প্রকৃতির দান বনের কাঠ, মধু, মোম, মাংস।

—নোনা জলে. নোনা মাটিতে ভাল নারকেল হয়। এদিকে

তেমন নারকেল গাছ দেখলাম না।

—আমিও তাই ভাবছি। এদিকের মানুষজন এমন একটা প্রয়োজনীয় গাছ লাগায় না কেন?

এমন সময় সুধীরবাবু এলেন। কি খবর? অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনাদের? একটু কষ্ট করে থাকবেন। বিশ্রাম নিন। কাল ঘুরে ঘুরে দেখবেন। দশজনের দানেই এসব ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে।

বসুন। আপনি একজন কর্মবীর। আপনার ইন্টারভিউ, কাগজে লিখব। সুদর্শন একপাশে সরে বসতে বলে। বৌ দু'টি উঠে দাঁড়ায়।

সুধীরবাবু বসতে বসতে বলেন, আর লজ্জা দেবেন না। সবই গুরুদেবের কৃপায়। এখনঃ কত কাজ বাকী। পাঁচিল দিয়ে ঘিরে স্নানঘাট ও যাত্রী নিবাস করতে হবে।

—সুন্দরবনে দারিদ্র্য ও বেকারীর রাজত্ব। এই মন্দির, ঘাট মানুষের কি কাজে লাগবে? কোন কলকারখানা করলে ভাল হতো না?

সুদর্শনের কথা লুফে নিয়ে অজিতবাবু বলে ওঠেন—এদেশে এত অবতার, মহাপুরুষ, মহামানবের ছড়াছড়ি। কত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কি হচ্ছে? অমানুষের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। অযোধ্যার রামমন্দির, চণ্ডীগড়ের স্বর্ণমন্দির কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ নিয়ে দাঙ্গা হচ্ছে। পৃথিবীতে ধর্ম নিয়েই যত যুদ্ধ, বিদ্রোহ।

সুধীরবাবু উত্তেজিত হলেন না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, ঠিকই বলেছেন। অধিকাংশ মানুষ ধর্ম কি তা জানেই না। মূর্তি পূজার বহরকেই ধর্ম বলে মনে করে। মাইক, আলোর রোশনাই, চাঁদার জুলুম ধর্মের অঙ্গ নয়। আজকাল ঋষির জীবন বাদ দিয়ে, ঋষিবাদের উপাসনা চলছে। ফলে মানুষের দুর্ভোগ যাচ্ছে না।

—তা হলে ধর্ম কোথায়? কিভাবে ধর্ম পালন করা যায়?

—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, হজরত মোহম্মদের জীবন ও বাণীই ধর্ম। তাঁদের অনুশাসনই অনুসরণীয়। তাঁরা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রচলিত দেবদেবীর মূর্তি পূজা করতে বারণ করেছেন। তাঁরা অংশ মাত্র। তিনিই পূর্ণ, তিনিই সো অহং।

—যত দিন যাচ্ছে ততই মূর্তি পূজার হিড়িক বাড়ছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজার প্যাণ্ডেলে মানুষ ভেঙ্গে পড়ে। বাঙ্গালী হিন্দুদের ধান্দাই বেশী।

—বাঙ্গালীদের ভিড় কোথায় নেই? মিটিং, জলসা, ধর্মসভা, মারামারি সর্বত্র এদের ভিড়। রাস্তায় পকেটমার ঠ্যাঙ্গাতেও ভিড় করে। শ্মশানেও তাই। এমন অলস জাতি পৃথিবীতে বিরল। একদিকে দেবত্ব, অন্যদিকে পশুত্ব অন্য জাতির মধ্যে নেই। চরিত্রের অপূর্ব বৈপরীত্য। শরীরে মিশ্র রক্ত তাই এমন অবস্থা।

সুদর্শন না বলে পারল না, সভাসমিতিতে আর কত লোক হয়? রামায়ণগান, চণ্ডীপাঠ, নাম সংকীর্তন বেশী মানুষকে আকৃষ্ট করত। এখন আর কিন্তু এত মানুষ টানতে পারে না।

অজিতবাবুও যুক্তি দেখান, অশিক্ষিত দুর্বল গরীব মানুষদের ধর্মভীতি বেশী। ক্ষমতাবান মানুষরা ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এদের শোষণ করে। অসৎ প্রকৃতির লোক। তাদের কাছে পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। ক্ষমতাবানরা দুর্বলদের বোকা বানিয়ে রাখেন। ভারতবর্ষের মানুষ ধর্ম ধর্ম করে। হরিদ্বার, প্রয়াগের কুম্ভ মেলা, গঙ্গাসাগরের পুণ্যস্নানে লক্ষ লক্ষ মানুষ যায়। কি ফল লাভ করে? অসাধু মানুষের সংখ্যাই তো বেড়ে যাচ্ছে। সুদর্শনের কথা শুনে সুধীরবাবু বললেন, আসলে ধর্মের আওতায় পড়ে ধারণ, পালন, লালন বর্দ্ধন। বাঁচা বাড়ার নীতিই ধর্ম। পরিবার, পরিবেশ ও অন্যের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে ভাবাই ধর্ম।

—তাহলে মার্কস, লেলিন, মাওসেতুং—এঁরা ধার্মিক? আমাদের জ্যোতিবাবুও? তাই অজিতবাবুর সোজা জবাব।

—নিশ্চয় ধার্মিক। তত্ত্বগতভাবে না হলেও ধাতুগত (ধৃ-ধাতু) অর্থে ধার্মিক। মোল্লা, পুরোহিত, পাদ্রীদের বিধানের বিরুদ্ধেই ওদের জেহাদ ঘোষণা। রামমোহন, বিদ্যাসাগরও প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। পুরোহিততন্ত্র আজ অচল হয়ে গেছে। পাদ্রী মৌলভীদের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাচ্ছে। আজ বহু শিক্ষিত মুসলমান

নমাজ পড়েন না, বহু খ্রীস্টান চার্চে যান না। কমুনিস্ট দেশগুলি কি কম উন্নত! ওসব দেশে বেকার সমস্যা নেই। আমরা অলস-ভাবে ধর্ম ধর্ম করে চেঁচাই। ওঁরা কাজের পেছনে ছোটে। কপালের দোহাই দেয় না।

তর্ক জমে ওঠে। দাশগুপ্তবাবু খবর দিয়ে যান, রান্নার এখনও দেরী।

এদের কথা শোনার জন্য অন্যরাও এসে জানালার পাশে দাঁড়াল। সুধীরবাবু ভাল শ্রোতা পেয়ে বলতে লাগলেন—মেঘনাদ সাহা, জগদীশ বসু, হরগোবিন্দ খোরানা এঁরা প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস না করলেও শ্রীশ্রী গীতা পাঠ করতেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব শক্তির আধার। তিনি গুণাতীত নিত্যধাম বাসী। ত্রিভুবনে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কিছু অজ্ঞাত নেই। সবই তাঁর লীলাময় বিকাশ। তাঁর মত জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক আর কেউ নন। তাঁকে জানা, তাঁর বিধানে চলাই প্রকৃত জ্ঞান। অবতার পুরুষরা তাঁরই বার্তাবাহী। তাঁদের কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা জনপ্রিয় ও চিরস্থায়ী সম্পদ। আপনারা জানেন শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন শুরু হয়েছে। যার প্রবাহ আজও অব্যাহত।

সুদর্শন বাজাবার জন্যই প্রশ্ন ছুঁড়ে ছিল, ভারতবর্ষে গুরু অবতারের ছড়াছড়ি। তাতে কি হল? এত দারিদ্র্য, ব্যাধি, হতাশা আর কোথায় আছে? অধিকাংশ মানুষ, পরশ্রীকাতর, ধান্দাবাজ। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সরলতা কমে গেছে। ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়ের জোর বেশী। নিজে সৎ না হলে গুরু কি করবে? ধর্মের অনুষ্ঠান, হীন চরিত্রের মানুষরাই বেশী করে।

শিশুবেলায় বাল্য শিক্ষায় সকলেই পড়ে—'সদা সত্য কথা বলবে, পরদ্রব্য চুরি করবে না, অন্যায় ব্যবহার করবে না, পরের উপকার করবে,' তা কত জন মানে? সূর্যকে কেন্দ্র করে চলে বলেই গ্রহগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। তেমনি জীবনে একজন প্রত্যক্ষ মানুষকে মেনে চলতে হয়। তিনি হবেন আদর্শ পুরুষ। ত্রিকালদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

তিনিই ধ্যায় ও অনুসরণীয়। আসলে কি জানেন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দু'ভাই-এর মত। একটা থাকলে আর একটা থাকবে। আমরা এই মন্দিরে তারই চাষ করছি। এবং মানুষকে জানাচ্ছি। আপনারা দেখুন, শুনুন। কাগজে কিছু লিখুন। আপনাদেরই তো দায়িত্ব।

রাত এগারোটা। দাশগুপ্তবাবু এসে বললেন, এবার উঠুন, খাবেন না? অনেক রাত হলো।

সুধীরবাবু ঘড়ি দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ওকে আলো ধরে এদের রান্না ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। বানীদেবী ও সুকন্যার এক প্রস্থ ঘুম হয়ে যায়। বিছানা ছেড়ে তড়িঘড়ি করে খেতে যায় ওরা।

দু'সারিতে সকলে বসল। সুন্দরী বৌটি একটা আসনে বসে পাশের আসনে সুদর্শনকে বসতে বলল।

সুদর্শন বসল। বানীদেবীর মুখ গম্ভীর। সুকন্যাও ঘন ঘন তাকায়। এতটা বাড়াবাড়ি ওদের পছন্দ নয়। সুদর্শন নারীদের হাড়ে হাড়ে চেনে। তাই চুপচাপ খেতে লাগল।

সামান্য আয়োজন কিন্তু যত্ন, পরিপাটির ত্রুটি নেই। আশ্রমের ছেলেরা সেবা পরায়ণ ও নিয়ন্ত্রিত। সুধীরবাবু এদের শিক্ষার সঙ্গে নিয়ম শৃঙ্খলা শেখাচ্ছেন। ছেলেরা তাঁর নাম ধরে না। 'বাবু' সম্বোধনে ডাকে। খেয়ে দেয়ে মুখ ধুয়ে, ঘরে যেতে যেতে ঐ বৌটি অনেক কথা বলে যায়। সুদর্শন দু'একটি কথার উত্তর দেয়।

দাশগুপ্তবাবু পেছন পেছন এসে ঘরে ঢুকলেন। গ্লাস, জলের কুজো গুছিয়ে দিয়ে বললেন—শুয়ে পড়ুন। সকালে দেখা হবে। পাশের ঘরে আমি আছি প্রয়োজন হলে ডাকবেন।

আজও একই ঘরে। অন্য ঘরে ভাল বিছানা নেই। ভেতরের বড় খাটে অজিতবাবুর', দরজার পাশে সুদর্শনের বিছানা। ওরা শুয়ে পড়ল। সে টেবিল ল্যাম্পটা বিছানার উপর এনে পেছন ফিরে ডায়েরী লিখতে লাগল। সারাদিনের ঘটনা, সুধীরবাবুর কথা ও

বৌটির কথা লিখতে লাগল। শুলে কি আর ঘুম আসবে। এদের মুখ, কথা ভেসে উঠবে। বৌটির মনে কোথায় যেন মেঘ জমে আছে। তা তাকে জানতে হবেই।

অজিতবাবুদের নাক ডাকার শব্দ ঘরের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ডাকের মত ধ্বনিত হতে লাগল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না লেখার আবেগে, চরিত্রগুলির কল্পনায় মশার কামড় উপেক্ষা করতে লাগল।

গোসাবায় দ্বিতীয় দিন

কাক ভোরে সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মন্দিরে প্রার্থনা শুরু হল। ছন্দময়, সুখশ্রাব্য। শেষে একজন সুরেলাকণ্ঠে গান ধরেন, 'জয়রাধে রাধে······।' সমবেত কণ্ঠে অন্যরা সুর মেলায়। তন্ময় হয়ে সে শোনে। মনে দোলা দেয়। ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে থাকে। দয়াল ঠাকুরের দু'নয়নে কত প্রেম।

সুদর্শন লেট রাইজার। শোয়ার পর যত রাজ্যের ঘটনা মাথায় খেলে। তন্দ্রাছন্ন হলে শেষ রাতে যা একটু ঘুমোয়।

বারান্দার লোকগুলো সজনেখালি যাওয়ার তোড়জোর করছে। সুদর্শন টুথ ব্রাশ নিয়ে পুকুরের দিকে যায়।

বৌটি কাপড় ধোয়ার নাম করে ঘাটে আসে। আপনি বিকালে ঘরে থাকবেন ? বন থেকে এসে ঘুরতে যাব। এদের সঙ্গে আমার একদম ভাল লাগছে না। কাপড় ধুতে ধুতে বলল সুন্দরী বৌটি।

—এরা কি ভাববে ! আমি বাজারের মধ্যে 'ভাগ্যলক্ষ্মী' রেষ্টুরেণ্টে থাকব। আপনি সোজা চলে আসবেন। আমার সঙ্গীরাও জানতে পারবে না। এলার্ট থাকা ভাল।

সুদর্শন মুখ ধুয়ে এসে দেখে মন্দিরের বালকদের হাতে হাতে থানকুনি পাতা। কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে প্রাকৃতিক চিকিৎসার বিধান মত।

. সুদর্শন লেবু জল খেয়ে বাইরে এসে মন্দিরের চারপাশ ঘুরে দেখল। নতুন প্যাটার্নের মন্দির। মূর্তির সামনে বসে উপাসনা করছে ভক্তরা। উপাসনার শেষে কয়েকটি কিশোরী মন্দির থেকে বেরিয়ে এল। এরা গ্রামের মেয়ে। সকাল বিকাল প্রার্থনা করতে আসে। ওরা ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটি কিশোরী সুদর্শনের

সামনে পড়ে থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটি সুন্দর যুবককে দেখে বিস্মিত হয়ে যায় সে। মিষ্টি চেহারা মাথাভর্তি চুল। ছিমছাম গঠন। চোখ ধরে রাখে।

—তুমি কোথায় থাক? তোমার নাম কি?

—মন্দিরের পেছনের বাড়ীতে। আনিমা মণ্ডল। সলজ্জ ভংগী। অবনত মস্তক। মুখে মৃদু হাসি।

—তোমার বাবা কি করেন? কি পড়?

—বাবা বাংলাদেশে থাকেন। বাবার নাম জীতেন মণ্ডল। মাষ্টারী করেন। মামার বাড়ীতে থাকি। আমি পড়ি--

কথা শেষ হতে না হতেই এক পাল হরিণীর মত ওরা ছুটে চলে যায়। আর কথা এগোয় না। মন্দিরের দরজার সামনে এলে সুধীরবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্‌টন সাহেবের ভ্রাতুষপুত্র আমাদের এ জমিটুকু দিয়েছিলেন। গুরুদেবের কৃপায় আজ এতটা হয়েছে।

মন্দির সংলগ্ন বড় পুকুরে, মাছ খেলা করছে। গেস্ট হাউসের পেছনে ছোট পুকুর, প্রাইমারী স্কুল। অজিতবাবুরা উঠে বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিলেন। এরপর টিফিনকালীন খাওয়ার পালা। দেশী প্রথা। মুড়ি নারকেল, জিলিপি ও চা।

চা-পর্ব শেষ করে বাজারের দিকে যেতেই সুভাষকে দেখে খুশি হল। সুদর্শনের গ্রামের ছেলে। চণ্ডীপুর থেকে এখানে বি. ডি. ও. অফিসে চাকরী করতে এসেছে। কেরাণীর কাজ।

সুভাষ বাজার করতে এসেছে। পাশেই থাকে। ব্যাগ একটা দোকানে রেখে ওদের ঘুরে ঘুরে হ্যামিল্‌টনের বাংলো, ধানকল, হাসপাতাল, হাইস্কুল, ব্যাঙ্ক দেখাল। ব্যাঙ্কের উপর ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিস। রেঞ্জার অরুণ চক্রবর্তী মহাশয় বসে আছেন। সুভাষ ঘরে ঢুকে পরিচয় দিতেই উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন চক্রবর্তীবাবু।

চা-পর্ব শেষ হলে সহকারী একজনকে ডেকে পাশের ঘর খুলতে বললেন। সুদর্শনরা ঢুকল। কাচের পাত্রে মাছ, সাপ, কচ্ছপের

ডিম ও হাঙরের কংকাল। তা ছাড়া ব্যাঘ্রচর্ম, হরিণের শিং ইত্যাদি তো আছেই।

অজিতবাবু ক্যামেরার সাটার টিপে যাচ্ছেন। বানীদেবী, সুকন্যা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। খুবই কৌতূহলী ওরা।

আধঘণ্টা পর সুভাষ বানীদেবীদের নিয়ে বাসার দিকে চলল। সুদর্শন কিছু নোট নেবে। চক্রবর্তীবাবুর ঘরে ঢুকে মুখোমুখি বসল। পেছনে দেয়াল জুড়ে সুন্দরবনের ম্যাপ। নদীপথ, বন, গ্রামগঞ্জ চিহ্নিত আছে।

সুদর্শনের প্রশ্নে চক্রবর্তীবাবু জানালেন, গোসাবার সীমানা ২৮৬ বর্গ কি মিটার। চৌদ্দটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ও একান্নটা মৌজার অধীনে ১,৬৮,২০০ জন লোকের বাস। ৬১,০০০ একর জমিতে চাষবাস, ২,০০০ একর জমিতে সেচ কার্য চলছে। একলক্ষের উপর তপশিলী ও ষোল হাজারের বেশী উপজাতি। একটি মাত্র কলেজ, ছাব্বিশটি হাইস্কুল, চৌদ্দটি জুনিয়ার হাই ও একশত সাতচল্লিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে। শতকরা চল্লিশ জন শিক্ষিত। তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দু'টি ভেটেনারী ডিস্পেন্সারী. এছাড়া তিনশ' চল্লিশটি জলের কল। পঁয়ত্রিশটি সাব পোস্ট অফিস আছে।

সুদর্শন আরও কিছু কথা লিখে নিল।

ছাদের উপর থেকে নদী ও গ্রাম কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ক্যামেরায় ধরে রাখেন অজিতবাবু। প্রায় একঘণ্টা কথা বলার পর বিদায় নিল ওরা। সুভাষের বাসার দিকে পা বাড়াল। স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্য হ্যামিল্টনের স্ট্যাচুর পাশে, বাংলোর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সুদর্শন ছবি তুলে নিল। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখবে।

সুভাষের ঘরে ঢুকতেই বলল, বিছানায় উঠে বসুন। এখানে সরকারী কর্মচারীদের থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। অনেক বলেকয়ে ভদ্রলোকের বারান্দাটুকু পেয়ে ঘিরে নিয়েছি। বর্ষায় স্যাঁত স্যাঁতে, সাপের ভয়। তার উপর সদ্য বিয়ে করেছি।

বালিকা বধু নিয়ে এভাবে থাকা খুবই দুঃসাধ্য। অজিতবাবু

মন্তব্য করে সুভাষের বৌএর দিকে তাকালেন। সুকন্যা, দেখছো তো, মানুষ কত কষ্ট করে থাকে।

বসতে না বসতেই সুভাষের বৌ মিষ্টির ডিস হাতে তুলে দেয়। আপত্তি শোনে না। বেলা তখন বারোটা। সুদর্শন দেখে নিষ্পাপ নাবালিকা। বালিকা বধূ ঘণ্টাখানিক বসল।

বেলা একটায় মন্দিরে ফিরে এল। বড় পুকুর থেকে গ্রামের বৌ মেয়েরা জল নিচ্ছে। রান্না খাওয়ার জল এখান থেকে নেয়। ঘাটে স্নান করা নিষেধ। সুদর্শন ওদের দেখে। গ্রাম্য পরিবেশ, দৃশ্য সাধারণ। চোখ কাড়ে না।

খেতে খেতে সুধীরবাবু মন্দিরের আয়ব্যয় কৃষিকর্ম, প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বললেন। সুধীরবাবু এক গ্লাস জল গলায় ঢেলে বললেন, আজ গোসবার যে কৃষি বিপ্লব দেখছেন তার জন্ম স্যার হ্যামিল্‌টনের হাতে। কৃষি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, মৎস গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। সমবায় ব্যাংক খুলে গরীব মানুষদের তিনি জোতদারদের হাত থেকে বাঁচান। একজন ইংরেজ পিছিয়ে পড়া সমাজকে এগিয়ে দিতে এসে ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তাঁর স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে। সুদর্শন মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনছে আর লিখে নিচ্ছে। কথায় কথায় বহু সময় চলে' যায়। বানীদেবীদের মা বলে সম্বোধন করেন। আবার আসতে বললেন। কিশোর রাঁধুনী রান্নার পর পরিবেশন করতে একটু ক্লান্তি অনুভব করে। সুধীরবাবুর ধমকে চটপট গুছিয়ে দেয়। অবশ্য সুবোধ দাশগুপ্তবাবু জল ইত্যাদি এগিয়ে দিলেন।

খেয়ে দেয়ে ঘরে ফিরে বিছানায় অজিতবাবুরা গা এলিয়ে দিলেন। সুদর্শন বজ্রাসনে বসল। শরীরে ক্লান্তি বিছানায় এলিয়েও ঘুম এল না। বার বার সুন্দরী বৌটির মুখ ভেসে ওঠে। বিকেলে দেখা হলে কোথায় যাবে, কি বলবে ভাবতে লাগল। আধঘণ্টা পর উঠে বসে। ডায়েরীর পাতায় যা মনে এল লিখে শেষে ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'প্রসঙ্গ রামায়ণ' তথ্যপূর্ণ বইটি পড়তে লাগল।

অজিতবাবুরা কোথাও যাবেন না। বৌ-এর কোমরে ব্যথা। মেয়ের হাঁটুতে বাতের ব্যথা বেড়েছে। ভাল ঘুম হয়নি ইত্যাদি।

দাশগুপ্তবাবু শুনে বললেন, আমিষ খাওয়া ছেড়ে দিন। ওতেই টক্‌সিন জন্মায়, রোগব্যাধি হয়। কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'খাদ্যের নববিধান', স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর 'খাদ্য ও পথ্য', গান্ধী রচনাবলী, বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পড়ে দেখবেন। আমিষ খাওয়ার কুফল লেখা আছে।

সুদর্শন বেরিয়ে পড়ল। বাজারে পূর্ব নির্দিষ্ট খাবারের দোকানে গিয়ে বসবে। ওদের বন দেখে ফেরার সময় হয়ে এসেছে।

যথাসময়ে সুন্দরী বৌটি এলে সুদর্শন একটা দোকান থেকে বাদাম, কেক কিনে রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডে গেল। চার টাকায় একটা কিশোর চালক জটিরামপুর ঘাট পর্যন্ত যেতে রাজী। ইঁট বিছানো সোজা রাস্তা বেরিয়ে গেছে ঘাট পর্যন্ত।

এত বড় টেলিফোন ভবন শহরতলীতে দেখা যায় না। সরকার এত টাকা খরচ করেছেন এখানে?—বৌটির কথায় রিক্সা চালক বলল, সরকার বাড়ী ভাড়া নেছেন। অমল রায়ের বাড়ী। ধনী মানুষ।

--এইখানে মাছ চাষ হয়? এত নদী থাকতে খাল কাটতে গেল কেন? প্রশ্ন শুনে ছেলেটি পুনরায় বলল—দু'পাশের রাস্তায় মাটি ফেলাতে (ফেলতে) ঘরবাড়ী করতে খাল কাট্‌তি হয়েছে। এখন মিঠা জলে মাছ চইড়ে (চড়ে) বেড়ায়। চুরি কইরে ফাঁক কইরে দিল।

রিক্সা এগিয়ে চলে। দীর্ঘ রাস্তা। মাঠের পরে মাঠ। ধানকাটা চলছে। কোন কোন জমিতে আনাজ। মাটির কলসি করে গাছের গোড়ায় জল ঢালছে গ্রামের বৌ মেয়েরা।

রাঙাবেলিয়ায় আবার কিছু দোকান পাট। পি. ডি আগর-

ওয়ালের ছাত্রাবাস। নতুন বাড়ী। ঝকমক্ করছে। ট্যাগোর মহিলা সমিতি, বড় মাঠ, মঞ্চ, হরিমন্দির ও ফুলের বাগান। স্থানটা খুব সুন্দর।

রাস্তা এবার বাঁক নিল। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি গাছ। শাল, ঝাউ ও আম গাছ। নারকেল গাছ নেই। গাছগুলি মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে। দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে গাছগুলি অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। আরও কয়েক বছর পর রাস্তার উপর ছায়া বিস্তার করবে। বন বিভাগের সুন্দর পরিকল্পনা। বৌটি যতীন্দ্রনাথের 'হাট' কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল—'বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ…।' আকাশে সারি সারি বক উড়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামল বলে। রাস্তার দু'পাশে শুধু মাঠ আর মাঠ। দূরে বহু দূরে দু'একটি ঘর।

জটিরামপুর ঘাটে যখন ভ্যান থামল তখন সূর্য্য ডোবে ডোবে অবস্থা। বেলা শেষ।

সামনে উঁচু বাঁধ। কয়েকটা ছোট দোকান। সুদর্শন উঁচু বাঁধে উঠে দাঁড়াল পেছনে বিদ্যা নদী, ওপারে সাতজেলিয়া গ্রাম। ওখান থেকে লঞ্চে মোল্লাখালি যাওয়া যায়। হাটের দিন এপথে ওপারের বহু লোক আসে। ঘাটে ভিড় জমে। সুদর্শন ওকে বাঁধের ওপর হাত ধরে টেনে তুলল। দোকানী ও ভ্যানওয়ালারা তাকিয়ে দেখছে। নতুন স্থান. অজানা পরিবেশ ও ভয়ে ওরা বসল না। সোজা ভ্যানে উঠে গোসাবার পথ নিল। ঘড়ি, টাকা ইত্যাদি কেড়ে নিলে বলার কিছু নেই।

ভ্যান ছুটছে। নাচতে নাচতে চলছে। ক্রমশ আঁধার নেমে আসছে। দু'জনে গা ঘেঁষে বসে। বৌটি সুদর্শনের হাত ধরে রাখে। মধ্যপথে গুণগুণ করে গান ধরে, 'আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো…'।

গান শেষ হলে কিছু সময় নীরবতা। শেষে বৌটি বলল, আমার বাড়ী কবে যাবেন? আমার কর্তা তার মত থাকেন, আমি আমার

মত থাকি। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিন। বি. এ. পাশ করে ঘরে বসে থাকা যায়?

উনি কি বলেন? সুদর্শন প্রশ্ন করে। আমি দেখেছি ভাল মেয়েদের কপালেই বেয়াড়া স্বামী জোটে। ঈশ্বরের পুতুল খেলা।

উনি বলেন—মেয়েরা কেন চাকুরী করবে? পুরুষের সেবা দেওয়ার জন্য তোমাদের জন্ম। নারী খেলার সামগ্রী, পুরুষ খেলোয়াড়। সে বীরভোগ্যা। তাই তাদের খেলার সামিল হতে হবে। সৃষ্টিকর্তা নারীকে সেভাবেই গঠন করেছেন। নারীর শরীর একটা মনোহারীর দোকান। যার যেমন ইচ্ছে সওদা করবে। পৃথিবী জুড়ে এটাই চলছে। চিরকাল চলবেও তাই।

—প্রতিবাদ করেন না কেন? নারীবর্ষে কত কি লেখা হল?

—কাগজে কলমেই। মেয়েরাই পুরুষের হাতের পুতুল হতে চায়। আমার মেয়েও স্বামীর সুরে কথা বলে।

—শ্বশুর ও শাশুড়ী কিছু বলেন না?

—ওরে বাবা। শ্বশুর পার্টির মেম্বার। পূজা অর্চ্চনা করেন না। ভ্যালুজ ট্যালুজ কি বলেন। আমি রাজনীতি বুঝি না। এক সময় পথ শেষ হলে ভ্যান বাজারে এসে দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে মন্দিরের দিকে পা বাড়াল ওরা। জ্যোৎস্নায় নদীর জল রূপার মত ঝিলিক দিচ্ছে।

—চলুন না কোথাও বসি। মন্দিরের হৈ চৈ ভাল লাগে না। আপনার মত গুণী মানুষদের সংগে মিশতে ভাল লাগে। আপনার বৌ-এর খুব গর্ব হবে। কথার শেষে ওর চোখেমুখে দুঃখী ভাব ফুটে উঠল।

—কেন?

—স্বামী সাংবাদিক ও লেখক। কত রাজা উজীর মারছেন। ওর যেন ঈর্ষা হল। শেষে বলল, আপনি নারীর মর্যাদা বোঝেন।

—তাই নাকি!

সুদর্শনের মুখে হাসি। লক্ষঘাটের সিঁড়িতে এসে বসল ওরা। খুব নিরিবিলি। সামনে জল আর জল। পেছনে বাড়ী, দোকান ইত্যাদি। হিমেল হাওয়া।

সত্যি বলতে কি দিদি, মানুষ লেখাপড়া শিখেও অজ্ঞান। একটু প্লাস মাইনাস করলে সুখে সংসার করা যায়। আপনাকে দেখলে গোবরডাংগার আমার এক বন্ধুর বৌ অলকার মুখ ভেসে ওঠে। স্বামী ব্যাঙ্কের অফিসার, বিরাট বাড়ী। ওর সুন্দরী বৌ একা একা ঘরে পড়ে থাকে। বন্ধু অফিস নিয়ে ব্যস্ত। ছুটি ছাটায় কোথাও যায় না। অথচ অলকার কত স্বাদ আহ্লাদ। আমার মাঝে মাঝে রূপকথার রাজপুত্র হতে ইচ্ছে করে। দুঃখ পাই পুরুষদের নিষ্ঠুরতা দেখলে

—আপনি খুব রোমান্টিক।

—আপনি আমাকে তুমি বলবেন। নাম ধরে ডাকবেন। দিদি-ভাই সম্পর্ক। আমি নীলিমাদি বলে ডাকব।

চার ঘাটে যখন থাকতাম, খুব খাটতাম। বড় সংসার। শ্বশুর, শাশুড়ী ভালেবাসতেন ছোট দেবর বড় চাকুরী পেলে স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগল। আমি বেশী কাজ করি বলেও ঝগড়া বাঁধলো। খুব জেদি মানুষ ও। মিথ্যা কথা বলে আমরা কলকাতার বাসায় উঠে আসি। সহজে গ্রামের বাড়ী যেতে চায় নাও। বাবাকে যৎসামান্য টাকা পাঠায়। আমার মেয়েও তেমনটি হয়ে উঠছে। সেই থেকে অশান্তি। কি করব বল তো?

—কলির প্রভাব। কি আর করবেন? কর্তব্য করে যাবেন। শিক্ষিত অশিক্ষিতে ভেদাভেদ নেই। সুযোগ করে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করবেন। কর্তা তো ওদের রক্ত মাংসেই গড়া। অশ্রদ্ধা করবেন না।

—শাস্ত্র বলছে কর্মফল। স্বামী বিদ্বেষী হওয়া নিষেধ। আজ-কাল দাম্পত্য জীবনে শান্তি দুর্লভ ব্যাপার। বিয়ের কথা ভাবলেই ভয় লাগে। দেখবেন মেয়েই একদিন ওর বাবাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। সুদর্শন বিজ্ঞ মানুষের মত কথা বলে।

কথায় কথায় সন্ধ্যা উতরে যায়। রাত নামে। ঘাটের কাছে জেলেরা ডিঙ্গী নৌকা নিয়ে এসেছে। মাছ ধরার জাল পাতবে। ওরা উঠে দাঁড়াল।

মন্দিরে জোর কীর্তন চলছে। দু'জনে আগু পিছু ঢুকল। মানুষের মন সন্দেহ প্রবণ। তার উপর বাণীদেবী ছেড়ে কথা বলেন না। তাই এই গোপনতা ও সতর্কতা। ওদের কেউ দেখতে পেলনা।

শ্রোতারা মাথা দোলাচ্ছে আর হাতে তালি দিচ্ছে। 'ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ-হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ'। আকাশে বাতাসে মুখরিত হচ্ছে এই গান। যুগ যুগ ধরে অমৃত বর্ষণ করছে।

সুদর্শন একটা ফাঁক দেখে বসে পড়ে। দাশগুপ্তবাবুর পাশেই। কীর্তন শেষ হলে সুদর্শন বলল বাণী বৌদি ভাল ভজন জানেন। গান করতে বলুন। দেখবেন জমে উঠবে।

আর যায় কোথায়? সুধীর বাবুকে বলতেই অনুরোধ। অন্যরাও ধরে বসল। বার বার আপত্তি জানাল বাণীদেবী। শেষে অজিত-বাবু খোঁচা দেওয়া কথা বলতেই উঠে হারমোনিয়াম ধরলেন। সুদর্শন এগিয়ে এসে বসল। সুকন্যা মেয়েদের দিকে বসে আছে। পাশেই অনিমা। চোখাচোখি হতেই সলজ্জ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে নিল।

গান শুরু হল, 'আমি প্রেম পাগলিনী......' কণ্ঠে দরদ ও ভাব-ভক্তি। সকলে তন্ময় হয়ে শুনল। সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠের অনুরোধ।

'দ্বিতীয় গান প্রণাম তোমায় ঘণশ্যাম ......'। পরিবেশ পরিস্থিতিতে আরও মধুময়। তারপরই, 'তুমি হো মাতা, তুমি হো পিতা ......' গানটি গেয়েই ঝটিতে উঠে দাঁড়াল। অনুরোধ করার সুযোগ দিল না।

সকলেই মুগ্ধ। গানগুলি বাঙ্ময়, অর্থবহ। একটা দিব্যভাব জেগে ওঠে। সুদর্শন বহুবার তার গান শুনেছে, আজ যেন নতুন মনে হল। পরিবেশই এমনটি করে।

রাত ন'টা পর্যন্ত আসর চলল। গ্রামগঞ্জের বহু মানুষ এসেছে। হরিসংকীর্তনের কি দুর্বার আকর্ষণ। সুদর্শনের গ্রামের ভুবন সাহার বাড়ীতে তিনদিন ধরে কীর্তন চলে। রাতভোর ধরে হয়। কতদল। সে এক এলাহি ব্যাপার। এমন আকর্ষণ আর কিছুতেই নেই।

ঘণ্টাখানেক বাদে প্রসাদ খেয়ে সুদর্শনরা ঘরে এল। বাণীদেবী ও সুকন্যা গম্ভীর। সামনের বারান্দায় ওরাও চুপচাপ। বেঁটে বৌটি নীলিমাদেবীকে কি যেন বলছে। নিশ্চয় কোন গোপন কথা। সুদর্শন হাতে মুখে জল দিয়ে পোষাক পাল্টে বিছানায় বসে টাকা পয়সা কাগজ-পত্র গুছিয়ে শবাসন করতে লাগল।

খেতে বসে সুধীরবাবুকে সুদর্শন বলল, আপনি এত লোকের শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিয়ে চলছেন। আশ্চর্য ব্যাপার। একজন মন্ত্রীর কথাও এত লোক শোনে না। আমরা টাকা চাইলে মানুষ পিছু ফিরে থাকে। আর আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য পাচ্ছেন। দেবতুল্য মানুষ আপনি

কি যে বলেন, সবই তাঁর ইচ্ছে। গুরুদেবের কৃপা। দয়ালের দয়া। কথায় বলে, 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে, গুরু অন্তর্যামী রূপে শেখায় আপনে।' গুরুজী বলেন, 'মানুষ আপন' টাকা পর। যত পারিস মানুষ ধর।' মানুষ ধরেছি বলেই শূন্য হাত পূর্ণ। আমি হ্যামিলটন ট্রাস্টের কেয়ারটেকার ডাঃ গোপীনাথ বর্ম্মণকে আপনার কথা বলেছি। কাল যাবেন, বহু তথ্য পাবেন।

গোসাবার ইতিহাসটা জানার দরকার। কেমনভাবে এসব গড়ে উঠল শুনতে চাই।

—আগামীকাল প্রার্থনার পর বসতে পারেন। আপনার একটু কষ্ট হলেও নিরিবিলি কথা বলা যাবে। বেলা বাড়লেই লোকজনের ভিড় বাড়ে, কাজে চাপ আসে।

কষ্ট হলেও খুব সকালে উঠল সুদর্শন। হাতমুখ ধুয়ে প্রার্থনা শুনে বাইরে এসে চারদিকে চোখ ফেলল। চারদিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে

গেছে। সূর্যদেব তখনও ওঠেন নি। নীলিমাদেবীরা ঘুমোচ্ছেন। নাসিকাগর্জনে পরিবেশ শব্দ দূষণে আক্রান্ত।

সুদর্শন সুধীরবাবুর ঘরে এসে ঢুকল। উনি বসে কি একটা লিখছিলেন। সুবোধ মণ্ডল বলেছিল, চিঠি লেখায় সুধীরদার জুরি নেই। গড়ে দৈনিক পনেরো—কুড়িখানা চিঠি লেখেন।

—লেখা বন্ধ করে বললেন, বসুন। কি জানতে চান?

- এই মন্দির গড়ার ইতিহাসে আপনার কর্মযজ্ঞ।

—হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন গোসাবার রূপকার। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে হঠাৎ তিনি মারা যান। তাঁর ছেলে জেম্‌স এসব দেখাশুনা করতে শুরু করলেন। তিনি আমাদের পাঁচ একর তিয়াত্তর শতক জমি মন্দিরের জন্য ছেড়েছেন। সুধাংশু মজুমদার তখন স্টেটের ম্যানেজার। পরবর্তীকালে প্রিয়কান্ত রায় যখন ম্যানেজার হয়ে এলেন তখন তাঁকে সভাপতি করে এখানে ধর্মসভা হতো। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই ট্রাস্টের ভার নিতে অস্বীকার করেন। এই মন্দির ও প্রাথমিক স্কুলটা খড়ের ঘর দিয়ে চালু হয়। আমাদের গুরুভ্রাতা সুধীর বসুর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। স্থানীয় বি. ডি. ও সুধীর রায় ছিলেন গুরুভ্রাতা। খুব সাহায্য করেছেন। মুকুন্দ গুহ মাষ্টার মশাই, মণীন্দ্রনাথ প্রধান, তারাপদ মণ্ডল ও আমি উঠে পড়ে কাজে লেগে পড়লাম। ইটের মাটি তুলতে তুলতে ঐ ছোট পুকুরটা কাটা হয়ে গেছে। বন্ধু মানুষ পরেশ মণ্ডল অর্থ সাহায্য করলেন। তার বন্ধু যতীনবাবুও টাকা দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি মত। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে মন্দির ও স্কুল ঘরটা পাকা করেছি।

মন্দিরে এ ধরণের প্যাটার্ন কোথাও দেখিনি। কোন্ ইঞ্জিনীয়ারের প্লানে হয়েছে? দেখতে অপূর্ব।

প্যান আমার গুরুদেবের। কত ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার বৈজ্ঞানিক তাঁর পায়ে মাথা নত করে বলেছেন, উচ্চডিগ্রী লাভ করেও তারা এত জানেন না। এ ধরণের ঘরে গরম কম হয়। গুরুদেবের নির্দেশে গেস্টহাউস তৈরী হয়েছে। সুন্দরবনের মানুষদের কাছ থেকে চল্লিশ

হাজার টাকা কালেকশান করি। । আমি তখন ক্যানিং-এ থাকি। ছোট একটা দোকান করতাম। গোসাবার হাটে আসতাম। হ্যামিলটন এখানকার হাট উদ্‌বোধন করেছিলেন। বাসন্তীর পর এত বড় হাট এ অঞ্চলে নেই। নৌকা করে হাটে হাটে ঘুরতাম। কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শেষে এখানে দোকানটি তৈরী করে থেকে গেলাম।

হ্যামিল্‌টন সাহেব চলে গেলেন কেন? এত কাজ করেও ঠাঁই পেলেন না কেন? প্রশ্ন শেষে ওঁর মুখের ওপর চোখ ফেললাম।

—আমারা বাঙ্গালী তো, দলাদলি করতে ভালবাসি। আর. এস. পি. রা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। প্রাণ ভয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে গেলেন। তাঁর আত্মা আজও কেঁদে কেঁদে ফিরছে। এই রাইস্‌মিলে পাঁচ ছয়শ লোক কাজ করত। কত সংসারে সুখের মুখ ফুটে উঠেছিল। সব শেষ হয়ে গেছে। শ্রীকণ্ঠ মাইতি, সুধীর নন্দী ১৯৪৮ সালে গুরু দেবের মাহাত্ম্য প্রচারে নেমে পড়লেন। বিরাজ নগর, কোড়াকাঠী, সাতজেলিয়া, যোগেশ গঞ্জ, ক্যানিং-এ জোর প্রচার চলে। ১৯১৬ সাল থেকে আজও মন্দিরের কাজ, দোকান করে যাচ্ছি। গুরুদেব বলেছিলেন, ধর্মকর্ম, সংসার সবই চাই। অর্থও চাই। দোকান ছাড়া চলবে না। সুধীর সিংহ কিছুকাল মন্দির দেখাশুনা করেছেন। রাগী মানুষ. পরপর দু'ছেলে কলেরায় মারা গেলে উনি এখান থেকে চলে যান। গুরুদেবের আশ্রমের সেক্রেটারী জ্ঞান গোস্বামী আমাকে পাওয়ার অব এটর্নী দিয়ে যান।

মন্দির করে কি লাভ? মানুষের কি কাজে আসবে? আজকাল বহু মন্দিরইতো অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ থাকে। এই দেখুন না চণ্ডীগড়ে কি হচ্ছে? ভারতবর্ষের কত মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। তাজমহল নাকি হিন্দু মন্দির ছিল। আর রামচন্দ্রের জন্মভূমির মন্দিরটা এখন মসজিদ।

শাস্ত্রীয় কথা, পবিত্র মন্দিরে ভগবান বিরাজ করেন। চণ্ডীগড় দিয়ে তো সব কিছুর বিচার হবে না। বৈদিক যুগ থেকে মন্দিরের

ঐতিহ্য চলে আসছে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে ধর্মের প্রচার, প্রসার ও মিলনতীর্থ গড়ে ওঠে। সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার বিকাশ ঘটে। বিবেকানন্দ 'বেলুড় মঠ' প্রতিষ্ঠা করার পর পৃথিবী জুড়ে ধর্ম আন্দোলন শুরু হয়েছে। আজ বিবেকানন্দ রাশিয়া, চীনেও সমাদৃত। আমার গুরুদেবেরও ইচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মন্দির তৈরী করে এখান থেকে আর্য ধর্ম ও আর্য সংস্কৃতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে দন। তিনি হাতে কলমে কৃষিকর্ম, সেবা, শিক্ষকতা, সংসার জীবন, স্বাস্থ্যনীতি, সদাচার দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি মানুষের বাঁচা, বাড়ার কথা বলে গেছেন। হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, বৌদ্ধ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারও বৈশিষ্ট্য তিনি ভাঙ্গতে চান নি। তিনি বলেছেন, তোমরা আরও আরোতর হয়ে ওঠ। পরিবার, দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য তুমি দায়ী। তোমার একটু ভুলের জন্য কত মানুষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

একটু দম নিয়ে পুনরায় বললেন, সুখী মানুষ কোথায়? শিক্ষিত, ধনী মানুষদেরও নানা সমস্যা, কত চাহিদা। অভাবে পরিশ্রান্ত মন ঈশ্বরীয় কথা শুনতে চায়। তাঁদের জীবন সমুদ্র থেকে আলো নিয়ে দুঃখের খেয়া পার হতে হয়। আপনি ওঁর যে কোন একটা বই পড়ে দেখুন। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ, বন্যা, দাঙ্গা ইত্যাদি বিপর্যয়ে মানুষ মন্দিরে আশ্রয় পায়। বা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা।

সুদর্শন তন্ময় হয়ে শোনে। আরও প্রশ্ন করতে মন চায়। একজন নিম্নবর্ণের স্বল্প শিক্ষিত মানুষের এত জ্ঞান? সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও ভারতীয় শাস্ত্র, দর্শন ভাল জানে না। হঠাৎ জরুরী খবর এল। সুধীরবাবু অন্য সময়ে কথা বলবেন বলে উঠে পড়লেন। শেষে সুদর্শন ঘুরে ঘুরে মন্দিরের অভ্যন্তরে মূর্তি, ফটোগুলি দেখে। বোর্ডে লেখা বাণীগুলি পড়ে। একটা বাণী ডায়েরীতে টুকে নেয়ঃ

'ইষ্টভৃতে দীক্ষা বাঁচে
শরীর বাঁচে কর্মে।
সদাচারে সমাজ বাঁচে
জীবন বাঁচে—ধর্মে ॥'

ঘরে ফিরে প্রাতঃরাশ সেরে অজিতবাবু ও সুদর্শন ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তু'জন হাঁটতে হাঁটতে ডা: বর্মনের বাড়ীর দরজায় এলো। অনেক হাঁকাহাঁকির পর চাকর এসে বলল, বাবু কলকাতায় পরশু গেছেন। ফিরবেন তু'একদিনের মধ্যেই।

ওরা কি আর করবে? সুভাষের ঘরের দিকে চলল। সুভাষের ঘরে বাণীদেবীদেরও আসতে বলে এসেছেন।

সুভাষের ঘরে ঢুকে শোনে সে হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাড়ী গেছে। ওর বাবার শরীর ভাল নয়। পরশু ফিরবে।

তুমি গেলে না কেন? একা থাকতে ভয় লাগে না? শত হলেও বালিকা বধূ। অজিতবাবু প্রশ্ন করলেন।

মিষ্টি হেসে বৌটি বলল, প্রথম প্রথম ভয় হতো, এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। কত চোখে জল ফেলেছি। লঞ্চ, ট্রেন, বাস, শেষে ভ্যানে বাড়ী যেতে হয়। খুব ঝামেলা। বেশীদিন ছুটি পেলে বাড়ী যাওয়া হয়। বসুন চা করি।

এলেই খেতে হয়? শাড়ী পাল্টে নাও। ছবি তুলব। তোমার নাম কি?

চা একটা খাবার নাকি? আমার নাম, নিবেদিতা।

ছবি তোলার কথা শুনে খুব খুশি। চা বসিয়ে শাড়ী নিয়ে পাশের বাড়ী গিয়ে শাড়ী পাল্টে কিছু সময় পর ফিরে এল। বালিকা বধূর রূপ আরও খোলতাই হয়েছে। পিছু পিছু একটি কিশোরী। চা নামাতে নামাতে বলল, আমার বডিগার্ড, রাতে শোয় এঘরে। পাশেই থাকে। আমার সঙ্গী।

চা পর্ব শেষ হলো। ঘরের পাশে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ফুলগাছ রেখে

কয়েকটা ছবি তুলল। অজিতবাবু পোজ ঠিক করতে মাথা, চিবুক স্পর্শ করলে লজ্জায় ওর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। সুভাষ ঘরে না থাকায় ওরা আর বসল না। ও কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। মুখে না বললেও ভাবে বুঝে নেয় সুদর্শন।

হাতে সময় আছে। অনিমার ছবি তুলবে। ঐ বাড়ী ঢুকে ওকে ডাকল। সাহস পেল না অনিমা। ভীতা হরিণীর মত। মামীকে আনল ও।

লজ্জায় বোবা। সোজা তাকাচ্ছে না।

অনিমাদের শক্ত মাটির ঘর উঁচু বারান্দা, খড়ের চালা। পরিচ্ছন্ন ভাব। ঘরের মধ্যে উঁচু সিংহাসনে গুরুদেবের ফটো। ভক্ত মানুষ এরা। ধর্মভীরু।

অনিমা মাতুর বিছিয়ে দিল। মামী বললেন, ওর মামা বাড়ী নেই। আজ স্কুল ছুটি। ছেলেদের জন্য খেলার জিনিষপত্র কিনতে ক্যানিং গেছেন। ওর মা বাবা বাংলাদেশে থাকে। এদেশে এসে কোথায় থাকবেন, কি খাবেন? এই চিন্তায় আসেন না।

ফটো আর তোলা হল না। মন্দিরে ফিরে এল। তখন ও বাণী-দেবীদের সাজগোজ হয়নি। অজিতবাবু খোঁচা দিয়ে কথা বললেন।

ওদের আর বেরোনো হল না। দুপুরে সুদর্শন সর্দার পাড়ায় যাবে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ে খেতে হয়। অতিথি না খাইয়ে অন্যদের খেতে দেবে না। এই নিয়ম।

সুদর্শন গম্ভীর হয়ে থাকল। অনিমাকে ফটো তোলার কথা বলতে সাহস পায়নি। পাছে ওর মামী কি ভাবেন! তাছাড়া ওদের আগ্রহ দেখলে প্রসঙ্গ তুলত।

অজিতবাবুও ইচ্ছে করেই বলেননি। সুদর্শনকে একটু ঈর্ষা করেন। মেয়েমানুষরা অল্পতেই ওকে পছন্দ করে ফেলে। ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তাঁর খোঁচা দেওয়া কথা শুনে বাণীদেবী খিঁচিয়ে ওঠেন। এমন সব অপ্রিয় কথা বললেন যা সুদর্শনকেও আঘাত করে। সুদর্শন নিরুত্তর। নিজ কাজে মগ্ন।

হু'ঘণ্টার মধ্যে হাজির হল জ্যোতিপ্রকাশ। সুদর্শন খেয়ে দেয়ে বজ্রাসনে বসেছিল। 'বাবু' উঠুন। অনেকটা পথ যেতে হবে। সর্দার পাড়া অনেক দূরে। অনেকেই কথা বলতে আসবে, নালিশ জানাবে, সময় লাগবে তো।

এই তো, শার্ট প্যাণ্ট পড়লেই হয়ে যাবে। তুমি বিশ্রাম নিলে না? সংক্ষিপ্ত কথা সুদর্শনের।

জ্যোতি এখানে থাকে। জল তোলা, বাজার করা ও সুধীরবাবুর ফাইফরমাস খাটা ওর নিত্যকর্ম। হাসিমুখে কাজ করে ও। এক ফাঁকে সুদর্শনের ঘরে এল। কত প্রশ্ন ওর মনে। সেবা পরায়ণ। বিছানা গুছিয়ে, গ্লাসে জল ঢেলে থালা গ্লাস ধুয়ে দেয়। সুদর্শনের নাম উচ্চারণ করে না। শুধু 'বাবু' সম্বোধনে ডাকে। ওর মধ্যে কোন চাতুরী নেই। সোজা ছেলে। সুদর্শন ভাবে এদিককার ছেলে বলেই এমনটি আছে। কলকাতার আশেপাশের ছেলেরাও কত চতুর আর ধূর্ত্ত। কত কৃত্রিম শহরের মানুষজন। কাউকে বোঝা যায় না। মুখোশ পড়া সব।

অজিতবাবু বের হলেন না। শুয়ে পড়লেন। সুদর্শন আর জ্যোতিপ্রকাশ উঁচু বাঁধ ধরে হাঁটতে থাকে। অন্যমনস্ক হলেই হোঁচট খেতে হবে। তবু চোখ কি তা মানে? গ্রাম, নদী ও মানুষজন মাঝে মাঝে চোখ টেনে নেয়। প্রথম গ্রামটা পেরিয়ে গেল। এর পরই গরীব মানুষদের ঘর। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা ও ছোট ছোট ঘর। পুরুষদের পরনে সস্তা লুঙ্গি, মেয়েদের মোটা কাপড়ের ছোট শাড়ীতে কোন প্রকারে শরীর ঢাকা। জ্যোতি বলল—এরা হুটো ভাত পেট ভরে খেতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। মেঝেতে খেজুর পাতার হোগলা চাটাই বিছিয়ে ছেঁড়া কাঁথায় শুতে পারলে স্বর্গসুখ মনে করে।

তুমি মন্দিরে থাক কেন? তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন? আগে পোষ্টমাষ্টারের বাড়ী থেকে জমি চাষ করতাম। হু'টো খেতে দিতেন। মা বাবা যশোরে। পোষ্টমাষ্টারবাবুর সঙ্গে এদেশে চলে আসি। আমার কষ্ট দেখে'বাবু' (সুধীরবাবু) এখানে থাকতে দিয়েছেন।

এগারো ক্লাশে পড়ি। নমশূদ্রের ছেলে বলে সরকার সাহায্য দেন। বই, জামা, প্যাণ্ট ইত্যাদি ঐ টাকায় কিনি। বাবু খুব ভাল মানুষ। নিজের বাড়ীর মত আছি। মন্দিরটা যেন নিজের ঘর।

চুপচাপ কিছু সময় চলে যায়। জ্যোতি পুনরায় বিনয়ের সঙ্গে বলে বাবু আমাকে কলকাতা নিয়ে চলুন। আপনার কাজ করে দেব। আমাকে থাকা খাওয়া দেবেন। আর কলেজে পড়াবেন। আমি বড় হতে চাই।

—ভেবে দেখি। চট করে হয় না। সুধীরবাবু রাগ করবেন।

—তা ঠিক। আপনি একজন সাংবাদিক। আপনার কাছে থাকতে পারলে গর্বে মন ভরে উঠবে। বড় হওয়ার প্রেরণা পাব।

কথা বলতে বলতে ও দু'তিন জনকে সুদর্শনের পরিচয় দিল। বড় বড় চোখ তুলে তাকাল কেউ কেউ। কেউ নাম ঠিকানা জিগ্যেস করল। এ অঞ্চলে বাঘ দেখে মানুষ যত না বিস্মিত হয়, তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হয় একজন সাংবাদিক দেখলে। সুদর্শন একটু গম্ভীর হয়ে থাকে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে ওরা সর্দার পাড়ায় এল। একটা বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে জ্যোতি হাঁক দিল ও কাকাবাবু, বাইরে আসুন। কথা আছে। অপরিচ্ছন্ন উঠোন। খড় কুটো ছড়ানো। একপাশে লাউর মাচা।

কালো কুচকুচে একজন পুরুষ বেরিয়ে এসে খেজুরের চাটাই বারান্দায় বিছিয়ে দিল। বসতে অনুরোধ করল বিনয়ের সঙ্গে। সুদর্শন লম্বা শরীর বেঁকিয়ে, মাথা নিচু করে বারান্দায় বসে। পাশে জ্যোতি। আশে পাশের ঘর থেকে কয়েকজন স্ত্রীলোক. ছেলে মেয়ে উঠোনে এসে জড়ো হলে জ্যোতি সুদর্শনের আগমনের উদ্দেশ্য বলল সংক্ষেপে।

লোকটি বলল, আমরা খুব গরীব বাবু। মাছ ধরে কোন প্রকারে সংসার চালাই। ফড়েরা লাভ খেয়ে নেয়। আমার দু'ভাই কুমীরের পেটে গেছে। সাহায্য পেলাম না ; দু'ভাইর বৌ-ই মাঠে খাটছে এখন।

জ্যোতিও এদের দুঃখের কথা বলল। এইতো পাশেই বিধবা গ্রাম। পুরুষ বলতে কেউ নেই। সব পুরুষই বাঘের পেটে গেছে। বিধবারা অনেকেই কলকাতায় ঝির কাজ করছে, নয়ত মাঠে ঘাটে খাটছে।।

এরা গরীব হলেও খুব সরল। মধুর ব্যবহার। একটা বাটি দু'বাটি মুড়ি নিয়ে, বড় বড় গুড়ের ঢেলাসহ সামনে এগিয়ে দিল।

সুদর্শনের পেটে জায়গা নেই। ওরা দুঃখ পাবে ভেবে একমুঠো তুলে—জ্যোতি তুমি খাও, আমি তো খেয়ে এলাম—বলে পাত্রটা ঠেলে দিল।

জ্যোতি না করল না। খেতে লাগল। সুদর্শন আরও কিছু প্রশ্ন করে। ওদের সুখ দুঃখের কথা লিখে নেয়।

॥ দয়াপুরের বাঘের গল্প ॥

দয়াপুরের বন্দী বাঘের কথা পত্রিকায় বের হয়েছিল। ফরেস্ট অফিসার চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে মুখ্যমন্ত্রী ওর নাম দিয়েছিলেন 'সুন্দরলাল'। সুদর্শনের কৌতূহল বাড়ল। ঘটনাটি শোনা চাই। বাঘের গল্প কে না শুনতে চায়?

রায়চরণ মিস্ত্রীর ঘরে গিয়ে ওদের মুখে বাঘ ধরার গল্প শুনবে বলে জ্যোতি সহ অন্যরাস্তা ধরে ঐ বাড়ী গিয়ে উঠল। এক যুবক রেডিও শুনছিল। এদের দেখে বন্ধ করে সরে বসল। একপাশে জ্যোতি এদের পুনরায় সুদর্শনের আগমনের উদ্দেশ্য বলেই দু'জনে বসল ওর পাশে। ছেলেটি স্বাস্থ্যহীন, তবে গলায় বেশ জোর আছে। সাহসী চোখ। মাদুরে বসেই শুরু করল, বাঘের গল্প।

আমরা কোন ক্ষতিপূরণ পেলাম না। বাঘ ধরতে এসে আমাদের খড়ের গাদা, মাটির বেড়া, উঠোনের গাছ, ঢ্যাড়শ খেত সব নষ্ট হয়ে গেছে। অফিসারবাবু বলেছিলেন ক্ষতিপূরণ দেবেন। সরকারী আইনে আছে, তবু পেলাম না। আপনার কাগজে লিখবেন? বাঘের গল্প পুরোনো হয়ে গেছে। কি হবে শুনে?

—দেখব লেখা যায় কিনা। কি নাম আপনার? আর কি ক্ষতি হল?

— আমি রায়চরণ মিস্ত্রীর ছেলে পঞ্চানন মিস্ত্রী। বনের অফিসার দলবল নিয়ে বাঘ ধরতে এলে তিন গ্রামের হাজার কয়েক মানুষ ছুটে এসেছিল। ঠেলাঠেলি, সেকি ভিড়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে শেষে মানুষ তাড়ায়। আমরা গরীব চাষী। আমাদের এ ক্ষতি দেখবে কে?

—বলুন না শুনি। বাঘ কি করে এল, কোথায় ধরা পড়ল। সুদর্শন কৌতূহল প্রকাশ করে।

পঞ্চানন বলতে লাগল —১৩৯০ সালের ২০শে আষাঢ়ের ঘটনা। গোমরা নদী সাঁতরিয়ে বাঘ আসে। চৌকিদার ভূপেন মালীর গরুর ঘরে ঢুকে এক থাবায় গরুটার ঘাড় ভেঙে উঠনে গরু ফেলে কুকুরের চোয়ালে থাবা মারে। এই দেখুন কুকুরটার নাক নেই। তখন সবে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। মাদারবাবু এ রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। তিনি বাঘ দেখতে পেয়েই সকলকে সতর্ক করতে হাঁক দিলেন। বাঘ ঘরের পেছন দিয়ে এসে এই ঘরটায় ঢোকে। এ ঘরে তখন কেউ ছিল না। আমরা ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেই। ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকি। নরেন মিস্ত্রী বাঘের ওঝা। মন্ত্র বলতে বলতে বাঘের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তবু ভয়। মাটির ঘর এক থাবায় ভেঙে ফেলতে পারে। তখনও পাড়ায় বিশেষ জানাজানি হয় নি। নরেনকাকু গোসাবার টাইগার অফিসে খবর দিলেন; অফিসার থানায়, বনে ওয়ারলেস করে দিলেন। বেলা বারোটায় অফিসার সমীর ব্যানার্জী লোকজন নিয়ে এলেন। থানা থেকে বন্দুকধারী পুলিশ এল। খবর শুনে নিমেষে দলে দলে লোক এসে বাড়ী ঘিরে ফেলল।

অনেকেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। বাঘটা শুয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। মনে হয় ভোররাতে অনেকটা নদী সাঁতরাতে ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। জ্বল জ্বল করছিল ওর চোখ দু'টো। লোকের ঠেলা-ঠেলিতে বেড়া ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া দিলে তবে লোকজন সরে যায়।

পুলিশ বন্দুক দিয়ে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়লে বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকপা এগিয়ে এলো। বেড়া ভেঙে ঝাঁপ দেবে ভেবে সকলে পড়িমরি-করে এদিক ওদিক দৌড়াতে লাগল। শেষে দ্বিতীয় গুলিটা খেয়ে বাঘ ঘুমিয়ে পড়ল। বন বিভাগের কর্মীরা তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলেন। বাইরে টেনে এনে লোহার খাঁচায় পুরে কলকাতার যাদুঘরে পাঠিয়ে দেন।

ও একটু দম নিয়ে বলল, ভূপেন মালি গরুর জন্য কোন ক্ষতি পূরণ পেল না। আমরাও না' অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে চিঠি দিয়ে কোন ফল পাইনি। আপনি একটু ঠুকে লিখবেন। আমাদের অপরাধ কি?

কথাবার্তা শেষ করে আবার রাস্তায় নামল। দু'জন স্থানীয় মানুষ কথা বলতে এগিয়ে এলেন। নিতাই গাইন, সুধীর গাইন। প্রবীণ ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সংক্ষেপে বললেন, আমার দু ভাই গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণপদ বাঘের পেটে গেছে। আজও সাহায্য পাইনি।

নিতাই গাইন বললেন, ঘুষ নিয়ে আমাদের বনের পাশ নিতে হয়। বাংলাদেশের ডাকাত মাছ, মধু সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বাঘে খেয়েছে দু'জনকে; অফিসে জানালাম, কেউ খোঁজ নিতে এলেন না।

সুদর্শন বলল, আমি কাকে কি বলব? কে শুনবে? তবে কাগজে লিখব। তাতে যদি আপনাদের কিছু কাজ হয়।

ওরা চলে গেলে জ্যোতি বলল, কত নালিশ শুনবেন। দয়াপুরের প্রতি ঘরে ঘরে নালিশ জমে আছে। সবারই নানা ভাবে ক্ষতি হয়েছে।

তারপরই বাঘ প্রসঙ্গ উঠল। বনমন্ত্রী 'সুন্দরলালের' নাম দিয়েছিলেন 'দয়ারাম'। বনমন্ত্রীর দেয়া নাম পাল্টে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এগ্রামে তারপর বাঘের নামে 'সুন্দরলাল স্মৃতি সংঘ' নামে একটা ক্লাবের জন্ম হয়েছে।

জ্যোতি থাকায় সুবিধা হল সুদর্শনের। এ অঞ্চলের অনেক খবর সে রাখে। গ্রামের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কত কথা সে

বলে যায়। পি. সি. সেন হাইস্কুল, গরানের বেড়া দেওয়া ফ্রি প্রাইমারী সেণ্ট্রাল স্কুল পেরিয়ে একটা ছোট নদীর ধারে পড়ল। বাচ্চা ছেলে বাপী মণ্ডল নৌকা বেয়ে নদী পার করে দিল। অন্যযাত্রী নেই। পনেরো পয়সা মাথা পিছু নেয়। সুদর্শন এটুকু ছেলের অভাব বুঝে একটা টাকা দিলে ও খুব খুশী হয়ে তাকিয়ে থাকে। সারাদিন নৌকা টানলেও ওর পাঁচ টাকা হয় না। তাই মাঝিরা টাকার মর্ম বোঝে।

আবার আধ মাইল হেঁটে ভ্যানে চড়ল। ইঁট বিছানো রাস্তা। গোসাবা বাজারে যেতে একঘণ্টা সময় নেয়। সন্ধ্যা নেমে যাবে।

জানো জ্যোতি, আজকাল সরকার একটা পলিসি নিয়ে কাজ করে। খবরের কাগজের নালিশ গুরুত্ব পায় কম। ব্রিটিশ যুগে সংবাদপত্রের বিরাট ভূমিকা ছিল। আমি নিশ্চয় কিছু লিখব। তবে কতটুকু উপকার এরা পাবে কে জানে!

—মাঝে মাঝে আসবেন। এরা আপনাকে মনে রাখবে। খুব সৎ ও কৃতজ্ঞ এরা, গুণীর মান রাখতে জানে।

ইঁট বিছানো রাস্তায় নাচতে নাচতে ভ্যান প্রায় এক ঘণ্টার মাথায় গোসাবা বাজারে পৌঁছল। কোমর ধরে গেছে। হাত পা ঝেড়ে ভ্যান ভাড়া মিটিয়ে খাবারের দোকানে বসল সুদর্শন, মনে ধরলে তাকে মিষ্টি খাওয়ায়। কাঁচাগোল্লা পেট ভরে খেয়ে জ্যোতি খুব খুশি। এত মিষ্টি সে জীবনে খায়নি।

সন্ধ্যা দিনকে বিদায় দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর নীলিমাদেবীর সঙ্গে গল্প করতে বসবে। সারাদিন দেখা হয়নি মনটা তাই কেমন খালি খালি। মন্দিরের দিকে পা বাড়াল সে।

ঘরে ঢুকতেই সুবোধ ব্রহ্মচারী বলল, নীলিমাদিরা হঠাৎ বিকালের লঞ্চে চলে গেলেন। আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে বলেছেন কলকাতায় ফিরে দেখা করতে।

সুদর্শনের মনের আলো দপ করে নিভে গেল। আগামীকাল যাওয়ার কথা। আজ চলে গেল না বলে কয়ে। কেন? সে ভাবতে থাকে। ওর মিষ্টি মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে।

চিঠি পড়ে হাত পা ধুয়ে নিল। সে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে হিমেল হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা করল। সে সেন্টিমেণ্টাল মানুষ, তাই মনে দুঃখ।

তুমি এখানে একা বসে কি ব্যাপার? অজিতবাবু প্রশ্ন করলেন। নীলিমাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়নি, প্রাণের দিদি চলে গেছে। বাণীদেবী কাঁটা ঘায়ে নুন দেয়।

সুদর্শন উচ্চ বাচ্য না করে সোজা ঘরে ঢুকে বিছানায় বসল।

প্রেম, ভালোবাসা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লোকসঙ্গ পেলে সুদর্শন যেন হাতে স্বর্গ পায়। আনন্দে ওর মন নেচে ওঠে। আজ ওর কাছে বানীদেবীদের কথা বিস্বাদ লাগছিল। তাই সে নিরুত্তর।

অনন্যা গম্ভীর। সেও যেচে কথা বলল না। ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে। জ্যোতি ও সুবোধ এসে গল্প জুড়ে দেয়। কোথা দিয়ে সময় চলে যায় টের পায় না ওরা। খাওয়ার ডাক শুনে সম্বিত ফিরে আসে।

রাতে খেতে বসে গোগ্রাসে খেয়ে নিল সে। কলাইর ডাল, কচুর শাক, আলু ভাজা। ওর কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু বানীদেবী, সুকন্যা নাক উঁচু করল। সমালোচনা করল ঘরে এসে; এসব খাবার ওদের রোচে না। সুদর্শন সোজা ঘরে এসে মশারা খাটিয়ে শুয়ে পড়ল।

অজিতবাবু, বানীদেবীর কণ্ঠ বেজে ওঠে। জিগ্যেস করলেন, সুদর্শন আমরা কাল চলে যাব। তুমি যাবে? তোমার বৌ, মেয়ে আছে। সংসারের চিন্তা আছে। ওকে কেন যেতে বলছো? রাজপুত্র ও রাজকন্যার খোঁজে দু'একদিন থেকে যাক না।

সুদর্শনের ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। মনের মধ্যে এত ঈর্ষা! না মেয়েদের চরিত্রই এমন? ঈর্ষা, দ্বেষ ওদের মজ্জাগত। দাঁতে দাঁত চেপে চুপচাপ শুয়ে থাকল সে।

এখানে সিনেমা নেই। বিবিধ ভারতী চলে না। টি. ভি নেই' তোমার বৌদিরা আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। এদের কাছে ভবানীপুরই স্বর্গ। অজিতবাবু কারণটা বুঝিয়ে বললেন।

—তোমাদের কি ? আমাদের এখানে প্রেম করার জন্য বোনও নেই, দিদিও নেই। নমশূদ্রের মেয়ের সঙ্গে অত মাখামাখি কেন ? অশিক্ষিত গেঁয়ো সব।

কথা বলবেন না। ভদ্রলোকদের মত এদের মনে হিংসা, ঈর্ষা নেই। মনে মনে বলে খুব ভদ্রলোক, স্বভাব চরিত্রের ঠিক নেই। মেয়েও বারো ঘাটে জল খেয়ে বেড়ায়। শেষে শক্তগলায় বলল, শূদ্রযুগ শুরু হয়েছে। ওদের মানুষ বলে মর্যাদা দিতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম। ভারতবর্ষের বিরাট শক্তি ওদের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

অজিতবাবুও বৌকে ধমক দিলেন। এসব কি কথা ? কেউ শুনলে মাথা কাটা যাবে। ছোট লোক বলে কোন জাত নেই। হীনমন্য যারা, নিচু প্রবৃত্তির লোক যারা তারাই ছোটলোক। উপাধি নিয়ে কুলীন সাজার দিন আর নেই। ওসব বাপের বাড়ী গিয়ে দেখাবে। এখানে তুমিই ছোটলোকের মত কথা বার্তা বলছো। অভদ্র……

কিছু সময় তর্কাতর্কি হল। দু'জনেই অগ্নিশর্মা। নিচু গলায় অভদ্র কিছু বাক্য বিনিময়। শেষে বিছানায় ঢুকল।

পরদিন সকালে বেলা করে উঠল সুদর্শন। অজিতবাবুরা নদীর ধারে ভ্রমণে গেছেন। সুদর্শন হাতমুখ ধুয়ে বিছানার উপর বসল। এমন সময় সুবোধ এসে বলল, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

সুদর্শন পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে গেল। সুধীরবাবু চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। বিমলবাবু তাঁর নির্দেশে মুড়ি, নারকেল, মিষ্টি আনলেন। সুবোধ জলের গ্লাস, আর চা নিয়ে এল জ্যোতি। সকলেই সেবা প্রাণ। হাসিখুশি। তাঁর স্নেহমাখা হৃদয়ের স্পর্শে এরা এক সংসারের লোকের মত আছে।

এমন একটা মানুষকে নিয়ে কোন উপন্যাসের মেরুদণ্ড করা যায়। টিফিন করার ফাঁকে সুধীরবাবু ছোট ছোট কথায় কিছু ঘটনা বললেন, নিজের অতীত সম্পর্কেও বললেন। শেষে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। সুদর্শন পড়ে দেখল একটা আবেদন পত্র। তাতে লেখা—

'স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ও কতিপয় স্মরণীয় ব্যক্তির অন্তরের সমবেদনায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় সুন্দরবন উন্নত হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্তি ঘটেছে কম। মানুষের সংসার ও চরিত্রের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। তাই এই মন্দিরকে সুন্দর ও আধুনিক করা একান্ত প্রয়োজন। অবিলম্বে বড় অতিথিশালা, নাটমন্দির, লঞ্চঘাট ও পানীয় জলের কল বসানো প্রয়োজন। চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ও যান্ত্রিক বোট কেনা দরকার। তাছাড়া আরও অনেক কাজ অসমাপ্ত হয়ে আছে। এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করার নিমিত্ত আপনাদের সকলের প্রাণ-ঢালা অর্ঘ্য দিয়ে এই শুভ প্রচেষ্টাকে স্বার্থক করে তুলুন।'—

বিনীত নিবেদক, তাঁরই দীন সেবক শ্রী সুধীরচন্দ্র বিশ্বাস। মন্দির সম্পাদক। গোসাবা।

সুধীরবাবু মুখে কিছু না বললেও সুদর্শন বুঝতে পেরে, হাজার এক টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসল।

আচ্ছা সুধীরদা, গোসাবার উন্নতির মূলে কাদের অবদান আছে? সুদর্শন দাদা বলেও সম্বোধন করল।

—আমার জ্ঞান সামান্য। হ্যামিলটনের অবদান বেশী হলেও মূলে আছেন ক্যানিং সাহেব। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভাগীরথী নদীতে পলি জমা হয়। ক্যানিং সাহেব তখন পোর্ট তৈরী করতে নির্দেশ দেন। ফলে সুন্দরবনে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানীর সুব্যবস্থাই হয়েছিল। মাতলা নদীর ওপর পাঁচটি, বিদ্যাধরীতে দু'টি জেটি তৈরী হয়েছিল। ডকের সঙ্গে ট্রামলাইন। ক্যানিং-এ দোকান, হোটেল, অফিস, ফলে ঘন বসতি গড়ে উঠেছে। প্রতাপাদিত্যও এ অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন। হায়দর গড়ে তাঁর দুর্গ ছিল। হ্যামিলটন সাহেব চাষ আবাদের জন্য বড়লাটের কাছে দরবার করে গোসাবা চেয়ে নিয়ে একটা আদর্শ কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করেন। তৎকালে বহু মানুষকে বাসস্থান ও চাষের জমি বিলি করেছিলেন তিনি। শ্বাপদ সংকুল বনভূমি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হয়। পথঘাট, স্কুল, যৌথভাণ্ডার,

পানীয় জল, বিদ্যুত সবই ছিল এ অঞ্চলে। শুনেছি রবীঠাকুর এখানকার কৃষি খামার ও সমবায় দেখে শ্রীনিকেতনের স্বপ্ন দেখেন।

—হ্যাঁ, তাই। মাঠের পাশে ফলক দেখতে পাবেন। ড্যানিয়েলের সঙ্গে কবিগুরুর খুব খাতির ছিল। আপনি ডাঃ বর্মনের কাছে সব তথ্য পাবেন। ভারতে সর্বপ্রথম ড্যানিয়েল সাহেবই সমবায়ের জন্ম দেন। খুব দূরদৃষ্টি ছিল ভদ্রলোকের।

ড্যানিয়েল সাহেব কে ছিলেন ? তাঁকে নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ লেখা পাইনি কিছু জানলে বলুন। বর্মণ রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। কত কথা আর বলতে পারবেন ? আপনিও কম জানেন না। যা জানেন বলুন।

উনি হাসিমুখে বললেন—ছাপাবার আগে সঠিক দেখে নেবেন। আমি যতদূর জানি হ্যামিলটন সাহেব 'ম্যাকিনন ও ম্যাকেঞ্জি' জাহাজী কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ও পরিচালক। পূর্বভারতে তাঁর খুব নাম ডাক ছিল। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় টাকা লগ্নী করে কোটীপতি হন। এই দ্বীপগুলির ওপর তাঁর নজর পড়ে। যে ক্ষুদ্রদ্বীপগুলি জোয়ারে ডুবে যায়, ভাঁটায় কচ্ছপের পীঠের মত ভেসে ওঠে সেগুলি অনাবাদী হয়ে থাকল। উঁচু দ্বীপগুলির ভেড়ি বেঁধে নোনা জল যেন কৃষি নষ্ট করতে না পারে লট বা প্লাট নম্বর বসিয়ে দিল। মাপঝোক দিয়ে ম্যাপ তৈরী হল।

মানুষ এল বসতি স্থাপন করতে। হ্যামিলটন সাহেব নানাভাবে সুযোগ দিয়ে নতুন উপনিবেশ গড়লেন। গভীর অরণ্য মানুষের হাতে পড়ে ফাঁকা হয়ে গেল। আজ এ দ্বীপে আর বন পাওয়া যাবে না। সাপ, বাঘ, কুমীর ও কামট নেই বললে চলে। সজনেখালি, পাখিরালয়, কলস অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বানরের কিছু অস্তিত্ব এখনও আছে। মানুষের চাহিদা, খিদে বড় সাংঘাতিক। একদিন বাকীটুকুও থাকবে না। সাহেব খুব পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। বনজ সম্পদ উদ্ধার, মৌচাষ, কৃষিকর্ম—কি না করেছেন ? কত মানুষ যে অন্নবস্ত্র পেয়েছে

তা লেখা জোকা নেই। এ অঞ্চলের দেবতা মশাই। লোকে বলত 'সাহেব বাবা'।

সুদর্শন অবাক হয়ে শোনে। শহর থেকে দূরে এমন একটি আদর্শ অঞ্চল এখানে গড়ে উঠেছে, কতজন তা জানে? পত্র পত্রিকায় মাঝে মাঝে বাঘের গল্পো শুধু বের হয়। কত কথা অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত। একই দ্বীপে বনবাসী মানুষ। ঘটি বাঙালের সহাবস্থান।

সুধীরবাবু পুনরায় বললেন, হ্যামিলটন সাহেবের মূল্যায়ন আজও হয়নি। আপনি সাংবাদিক, লেখক মানুষ। ওর কথা লিখুন। আজ মৌমাছি পালন, সমবায় পরিকল্পনা ও কৃষি বিপ্লব নিয়ে সরকার নানা পরিকল্পনা করছেন। তিনিই এসবের রূপকার। বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ, শোষণের কথা লিখিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরেন। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন এখানে তারই সুব্যবস্থা ছিল। বিপুল সম্পদ দরিদ্রের মধ্যে তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কথামত ভারত সরকার সমবায় ঋণ সমিতি গ্রামে গ্রামে চালু করেন ১৯০৪ সালে।

আজ তার কথা কে মনে রেখেছে! আর এস. পিরা তাঁকে তাড়িয়ে ট্রাস্টের বিরুদ্ধে মামলা লড়ছেন। ডাক্তার বর্মণের কাছে বিস্তারিত তথ্য আছে।

ধন্যবাদ জানিয়ে সুদর্শন বেরিয়ে পড়ল। ঘরে এসে দেখে অজিত বাবুরা নেই। সুবোধ বলল বাজারের দিকে গেছে।

সে আর কি করে, অনিমার বাড়ী গেল। অনিমা পড়ছিল। গলা শুনে বেরিয়ে এসে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে দিল।

সুদর্শন বসল। ওর মামী এসে জিগ্যেস করল, ভালো আছেন? বসুন। চা করে আনি। অনু তুই কথা বল। আমি চা বসাচ্ছি।

সুদর্শন চা খায় না। তবু না করল না। কিছু না খেলে দুঃখ পাবে। এক কাপ চায়ে তার কতটুকু ক্ষতি হবে। এদের তৃপ্তি হবে তার চেয়ে বেশী। তুমি প্রার্থনায় গেলে না যে? সুদর্শন জিগ্যেস করল।

—মামীর শরীর ভাল নেই। প্রায়ই মাথা ঘোরে, সর্দি কাশি

লেগেই থাকে। চোখে চোখ ফেলে না। মাটীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে। গ্রাম্য বালিকা। মোটা কাপড়ের শাড়ী পড়া, তবু কি সুন্দর। মসৃণ শরীর। চোখ টেনে নেয়। অনিমার চোখে মুখে লাজুক ভাব ফুটে ওঠে।

সুদর্শন তাকিয়ে ওর সৌন্দর্য উপভোগ করে। নিষ্পাপ চোখ দু'টি। কথায় কি মিষ্টতা। একটু মেক আপ দিয়ে নিলে শহুরে যুবকরা খাই খাই করবে।

ওর মামী চা নিয়ে এলে, অনিমা বিস্কুট এনে দেয়।

—শুনলাম আপনার শরীর ভাল নেই। চা-টা একদম খাবেন না। রোজ সকালে এক কাপ সবুজ কলাপাতার রস খেলে সর্দি কাশি ভাল হয়। শরীরে রক্ত বাড়ে। দুর্বলতা কেটে যায়। কলাপাতায় গরম ভাত খেলে লিউকোর্ডামা পর্যন্ত ভাল হয়। সুদর্শন শ্রোতা পেয়ে আরও কিছু সময় বিজ্ঞানের কথা বলে। ওদের সংসারের খোঁজ খবর নেয়। বেলা হচ্ছে দেখে উঠে পড়ে। অনিমা ধীর পায়ে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এসে অনুচ্চকণ্ঠে বলল. আবার আসবেন। ওর মামা খেয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন বার কয়েক। অজিতবাবুদের কথা ভেবে না করে দিল সে। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

অনিমা লেখক, সাংবাদিকের গুরুত্ব কি, এখনও তত বোঝে না। আশ্রমের সকলে বিশেষত: ওদের বাবু (সুধীরবাবু) গুরুত্ব দেয় দেখে ভাবে কেউকেটা মানুষ। তার উপর দর্শনধারী পুরুষ সে। স্বার্থক নাম সুদর্শন।

সে মন্দিরে ফিরে আসে। তিনটার লঞ্চ ধরে ক্যানিং—টাইগার প্রোজেকটর ডাইরেকটরের সঙ্গে দেখা করবে। বাড়তি কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায়। বাঘের দুষ্প্রাপ্য ছবি আর একটা ম্যাপ বিশেষ প্রয়োজন। অরুণবাবু বললেন, ঐ অফিসে মিলতে পারে।

সুভাষ বসে আছে অনেকক্ষণ। ব্লক অফিস থেকে কিছু তথ্য টুকে এনেছে। সুদর্শন ঘরে ঢুকে বসল, ওকে বসতে বলল। তারপর পড়তে লাগল—সুন্দরবনের জনসংখ্যা ২৪,৫৫,৩৭০ জনের কিছু বেশী।

তপশিলী ৯,৬৩,৩১৮ জন, উপজাতি ৯,২৩,৬৭০ জন। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় ১৩,৬৮,৩৮১ জন। তিন হাজারের ওপর কৃষক। ষোলটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ছ'টি হাসপাতাল। মোট আয়তন ৯,৬২,৯৯ বর্গ কি. মি। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৪,২৫৩,১ বর্গ কি. মি। চাষের জমি ৭,৩৭ ৯৬০ বর্গ কি, মি এবং ভেড়ি ২৫,০০০ একর। তিনটি মহকুমার পনেরোটি থানা। উন্নয়ন পর্ষদের বিকাশকেন্দ্র সাতাশটি। তার আবার তিনটি শাখা কেন্দ্র কাকদ্বীপ, ক্যানিং ও ন্যাজাটে। উনিশটি ব্লকে উনিশটি পঞ্চায়েত সমিতি। চুয়ান্নটি দ্বীপে ১০৯৩টি গ্রাম। ২৪ পরগনা, জেলা দু' ভাগ হয়েছে। উত্তর, আর দক্ষিণ। গোসাবা পড়েছে বসিরহাট মহকুমার মধ্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' ও সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোর খুলনার ইতিহাস' বইতে পড়েছিলাম ষোড়শ শতকের শেষ দিকে পর্তুগীজ দস্যু আর মগদের অত্যাচারে চট্টগ্রাম হুগলীর মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, হুশেনসাহের আমল থেকেই ওরা এদেশে লুটপাট, নারী অপহরণ, শিশু চালান শুরু করে। আর জোর করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ তো ছিলই।

—আরে এতো আমার জানা। এই মগদের "বোম্বেটে" বলত। ছেলেবেলা মা আমাদের মগের ভয় দেখাতে কত ছড়া কাটতেন। এক সময় ছড়াগুলি মুখে মুখে ফিরত। সুদর্শন আরও বলল, ১৬৩২ সালে বাংলার শাসনকর্তা কাসিম খাঁ দিল্লীর সম্রাট সাহজাহানের নির্দেশে পর্তুগীজদের তিনি হুগলী ছাড়া করেন। পাদরী ক্যাবরল সাহেব তিন হাজার পর্তুগীজ নরনারী সহ সাগর দ্বীপে পালিয়ে আসেন। কুলপী, তাড়দহ ও সাগর দ্বীপে আগে থেকেই পর্তুগীজদের আস্তানা ছিল। অসংখ্য নদী, খাল ও দুর্গম পথ ছিল বলে দস্যুরা অবাধে রাজত্ব করত। তাছাড়া বহু পর্তুগীজ কাজ করত প্রতাপাদিত্যের জোত, নৌবাহিনী ও নৌ-সৈন্য বিভাগে। সাগর দ্বীপই প্রতাপাদিত্যের নৌ ঘাঁটি ও দুর্গ ছিল। পর্তুগীজ ফ্রেডারিক ডুডলী, রড্‌ডা, গেড্রো ছিলেন নৌ অধ্যক্ষ। প্রত্যাপাদিত্য ১৫৮৭ সালে যশোরের রাজা

হন, ১৬১০ সালে তাঁর অবসান ঘটে। জামিরা নদী, মণিনদী, কাঁকড়া, বিদ্যাধরী নদীর পশ্চিম তীরে প্রতাপের দুর্গ ছিল। কাঁকড়ায় একটি গ্রামের নাম প্রতাপনগর। তাঁর কীর্তিকলাপ ২৪ পরগণার সর্বত্র দেখা যায়। ১৬১০ সালে ইসলাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রতাপ যশোরে প্রত্যাবর্তন করেন, সাগরদ্বীপ ফিরিঙ্গিদের দখলে চলে যায়। পর্তুগীজরা এখানে দুর্গ নির্মাণ করেন। ও মেলি তাঁর বেঙ্গল ডিষ্ট্রিকট্ গেজেটিয়ারে বারাতলাব বা মুড়িগংগা নদীকে দুর্জনদের নদী নামে উল্লেখ করেছেন। ওদের ভয়ে আদিগংগা দিয়ে যাতায়াত করা যেত না।

—ঠিক বলেছো। দাদুর মুখে শুনেছি, এই দক্ষিণ দেশকে ফিরিঙ্গির দেশ বলত। আর পর্তুগীজ জলদস্যুদের বলত 'হারমাদ'। চণ্ডীকাব্যে মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন—

ফিরিঙ্গিদের, দেশ বহে বাহে কর্মধারে।
রাত্রিদিন বেয়ে হারমাদের চরে॥

এখানকার নারীপুরুষদের ধরে নিয়ে বিক্রী করত। আরাকান, গোয়া, চট্টগ্রাম, আরও দূরে ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রী করত এসব বন্দীদের।

গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত ও বলল বানিয়ে মানরিক (১৬২৯—৩৫) ও পর্তুগীজ পাঠক পিরার্ডডাকভাল ওদের নির্মম অত্যাচারের বিবরণ লিখে গেছেন। সাগরদ্বীপ, সুন্দর বন ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা শ্মশানে পরিণত হয়—তারপরই বন জংগলের রাজত্ব। আর বাঘ, সাপ ও পশুপাখীর অবাধ বিচরণ। ১৭৮০ সালে রেনেল মানচিত্রে একটি অঞ্চলকে "country depopulated by the Muggs" বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বকোষের লেখাতেও উল্লেখ আছে এসব কথা।

—হাসতে হাসতে সুদর্শন বলল, আজও আবার ছেলেবেলায় পড়া কবিতাটি মনে পড়ছে :

"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে ?"

আলোচনা জমে ওঠে। ও শেষে বলল, মুঘল সরকার পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী ও মগদের দমন করতে উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ দুর্গম নদী পথে বহু সৈন্য পাঠিয়েও দস্যুদের হটাতে ব্যর্থ হলেন। উপযুক্ত জলযান ও নৌ-সৈন্যের অভাবে খাঁ সাহেব এঁটে ওঠেননি। ১৮২৪ সালের পর ইংরেজ শাসন কায়েম হল দস্যুদের ভয় দূর হয়। ১৮১৪ সালের আগে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে মাকেয়া বা মর্গ কেল্লার দক্ষিণ দিকে কেউ যেত না।

নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইচ্ছামতি, রায়মঙ্গল, মাতলা, ঠাকুরাণী। সুভাষের হাত থেকে ব্লকের তথ্য নিয়ে পড়ে সুদর্শন। বার্ষিক বারিপাত ১৮০০ কি. মি। ঝড়ের গতি কখনও কখনও আশি কি. মিটার এবং ঢেউ প্রায় ১·৮৩ মি. পর্যন্ত উঁচুতে ওঠে। আর্দ্রতা শতকরা ৯০ ভাগ জল ছ'টি মহাবিদ্যালয়, একশ' পঁচিশটি উচ্চবিদ্যালয়, একশ পঁচিশটি বুনিয়াদি ও এক হাজার দু'শত বারোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান ফসল ধান, পাঠ, লংকা, তরমুজ, সূর্যমুখী।

শেষ পাতায় পর্যটন কেন্দ্র ও দ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ আছে। তালিকায় আছে সাগর সৈকত, কপিলমুনির আশ্রম, ওঙ্কারনাথজীর মন্দির, বকখালির ঝাউবন, ভগবৎপুরে কুমীর প্রকল্প, কাশীপুরে চক্রতীর্থ, মথুরাপুর থানায় জটার দেউল, জয়নগরে রায়বেশে মন্দির, ধন্বন্তরী কালীমন্দির, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম, মজিলপুরে সৎসঙ্গ বিহার, সজনেখালির পাখিরালয়, ব্যাঘ্র প্রকল্প, বঙ্গোপসাগরের কাছে কলসদ্বীপ। তা ছাড়া কাশীনগরে নন্দার স্নানের মেলা, বড়াশী গাজনের মেলা, সন্দেশখালিতে শংকরদহের বামন মোল্লার মেলা, হাড়োয়ায় পীর গোরাচাঁদের মেলা।

সুভাষ উঠে দাঁড়াল। সুদর্শনকে খেতে ডাকছে। সময় কম।

সুভাষ বলল, এখন হাসনাবাদ, হাড়োয়াকে কেউ সুন্দরবন বলে ভাবেই না। ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতা পর্যন্ত এক সময় বন ছিল আজ আর চিহ্ন নেই। মাটি খুঁড়ে শুধু গাছ, মূর্তি এসব পাওয়া গেছে। এখন সংরক্ষিত এলাকাকেই সুন্দরবন বলা উচিত। নদী মরে চড় জেগে উঠছে। ভবিষ্যতে লেক টাউন বা সল্ট লেকের মত উন্নত উপনগরী হয়ে উঠবে। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী ও অফিসের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমশঃ। বিশ্বব্যাঙ্ক যখন শুভদৃষ্টি দিয়েছে তখন হতে কতক্ষণ? ক্যানিং আর গোসাবার মধ্যে ব্রীজ হয়ে গেলেই দেখবেন। কাগজে এখানকার কথা বেশী করে লিখুন, এরা মাথায় করে রাখবে। সুভাষ আশাবাদী। সুভাষ ঘরে গেলে সুদর্শন দ্রুত স্নান সেরে নেয়। অজিতবাবুরা সকালেই স্নান করে নিয়েছেন। আজ অরুণবাবুও মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রিত। খেতে খেতে আবার আলোচনা শুরু হল। সুদর্শন প্রশ্ন করল, অরুণবাবু বলতে পারেন সুন্দরবন নাম হল কেন? নোনা দ্বীপ, ব্যাঘ্রবন বা ভয়ংকর বন নাম হলে ভালো হত।

নানা জনের নানা মত 'যশোর খুলনার ইতিহাসে' সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় উল্লেখ করেছেন, এক সময় এসব অঞ্চলে প্রচুর সুন্দরী গাছ ছিল। তার থেকে এ নাম করণ হচ্ছে। এদিকে এখন সুন্দরী গাছ নেই। বাংলাদেশে গেলে কিছু দেখা যাবে। কারও মতে সমুদ্র তীরবর্তী সমুদ্রবন থেকে সুন্দরবন নাম হয়েছে। অতীতে এই বন সমতট বা ব্যাঘ্রতটীব অন্তর্গত ছিল। কেউ কেউ বগড়ী বলেন। পরিব্রাজক হিউ—য়েন—সাঙ্ সমতটে দিগম্বর জৈন, বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম ও হিন্দু মন্দির দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। পাণিনির মহাভাষ্যে আর্যাবর্তের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে কলক বনের উল্লেখ আছে। কলক বনই নাকি আজকের সুন্দরবন। মুসলমান আমলে বলত ভাঁটি প্রদেশ। গবেষকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভূমিস্তর পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন।

—তাই নাকি। কোথায় সে সব তথ্য পাবো?

—কালিদাস দত্ত, পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত নবপ্রস্তব যুগের অনেক

নিদর্শন পেয়েছেন। কাকদ্বীপে গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক নরোত্তম হালদার মহাশয়ের সংগ্রহে অনেক প্রত্নবস্তু আছে। তিনি মাসিক পত্রিকা ও বই বের করেছেন।

খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বে তার অফিসের কর্মী গোপাল এসে বলল, তার এসেছে। কোথায় বাঘ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এক্ষুনি আপনাকে লঞ্চ নিয়ে যেতে হবে।

তড়িঘড়ি করে অরুণবাবু উঠে পড়লেন। মুখ ধুতে ধুতে বললেন, আজ থাকুন। আরও কথা হবে।

—না, আবার এলে দেখা হবে। আমাদের ছুটি নেই। খবরের কাগজের চাকুরী বোঝেন না। সৈনিকের মত তৈরী থাকতে হয়।

—আচ্ছা, আমি অফিসে যাচ্ছি। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বো। গোপালের হাতে একটা চার্ট, পুস্তিকা দেব। পড়বেন কিছু তথ্য পাবেন। আপনাদের খুব ভাল লেগেছে। সময়মত চলে আসবেন। নমস্কার।

অজিতবাব, বাণীদেবী, সুকন্যা সকলে স্বীকাব করল অরুণবাবু খুব ভালো মানুষ। সুধীরবাবুও একমত হলেন —সুধীরবাবু বললেন, অরুণবাবু খুব কাজের মানুষ।

ঘরে ফেরার পালা

ঘরে এসে যার যার ব্যাগ গুছিয়ে নিল। লঞ্চের সময়ে হয়েছে। বিমলবাবু এদের প্রশংসা করলেন। আবার আসার জন্য অনুরোধ করলেন। কলকাতার ঠিকানা নেওয়ার পর একটা মোটা খাতা এগিয়ে দিয়ে মন্তব্য লিখতে বললেন। এ মন্দির সম্পর্কে অনেকের মন্তব্যই লেখা আছে। দু'একটা দেখে নিয়ে সুদর্শন লিখল : ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরেছি কিন্তু এমন প্রাণের সাড়া, প্রকৃতি ও মানুষের এমন সহাবস্থান কোথাও দেখিনি। এমন অনাবিল আনন্দ দীর্ঘকাল পাইনি। আমার মন জুড়ে এখন শুধু সুন্দরবন। বন, জঙ্গল, নদী-নালা ও এই অসহায় মানুষজন। সময় পেলে আবার ছুটে আসব। কোন অর্থের বিনিময়ে আতিথেয়তা ও সেবা পাওয়া যায় না। কত মানুষ আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে। কত বড় হয়ে উঠেছে পৃথিবীটা।

উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে লঞ্চ ঘাটায় চলল। পিছু নিল—জ্যোতি, বিমলবাবু, সুবোধ আরও দু'তিনটি কিশোর। ওদের হাতে ব্যাগ ইত্যাদি লঞ্চে খাওয়ার জন্য সুধীরবাবু কিছু কিনে পাঠিয়েছেন।

লঞ্চে উঠে সুদর্শন চারদিকে তাকাল। মাথার উপর আকাশের নীলিমা, পায়ের নিচে ঘোলা জলের ঢেউ। দূরে শ্যামলিকা এক মায়াবী পরিবেশ রচনা করেছে। প্রকৃতির অফুরন্ত প্রাণের জোয়ার। দু'দিনেই মায়া জমেছে। লঞ্চ যখন ছাড়ল তাদের মুখ করুণ হয়ে উঠল। সুদর্শনদেরও গম্ভীর, মনমরা ভাব। ওদের যতক্ষণ দেখা গেল হাত নেড়ে গেল সে। সবুজ দ্বীপ দূরে সরে যাচ্ছে, লঞ্চঘাটের গাছগুলো দেখাচ্ছে কালো ভূতের মতো।

লঞ্চের স্পীড বেড়ে গেল। ইঞ্জিনের বিকট শব্দ জলের আর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। একে একে ভেতরে এসে বসল ওরা। ভিড় কম। তাই ইঞ্জিন থেকে দূরে বসল।

সুদর্শনের সামনে একটি বালিকা বধূ। কোলে এক বছরের শিশু।

বরটিও নাবালক। সুদর্শন ভাবে নেহাতই রূপজ মোহ। একটা মেয়ের দায়িত্ব নিতে গেলে আর একটু সাবালক হওয়া প্রয়োজন। অবুঝ শিশুটি বোঝে না কোন্ খেলার ছলে তাঁর জন্ম হয়েছে।

সুদর্শন ঠিক ঠাক হয়ে বসে বের করে পুস্তকটি। পড়তে থাকে—২৪ পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জের দক্ষিনাংশ জুড়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন। পূর্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ১৮০ মাইল, প্রস্থে ৬০-৮০ মাইল। সুন্দরবনের পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, পূর্বে মেঘনা। ভূমি ক্রমশ সমুদ্রের দিকে ঢালু হয়েছে। ইছামতী, যমুনা ও কালিন্দীর শাখা মিশেছে রায়-মঙ্গলের সঙ্গে। রায়মঙ্গল সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশাল আকার। ২৪-পরগনার সুন্দরবন উঁচু বাঁধ দিয়ে নোনা জল ঠেকানো হয়েছে। খুলনা জেলার সুন্দরবন নিম্নভূমি বলে জনবসতি নেই। বাখরগঞ্জের ভূমি উঁচু বলে বাঁধ দিতে হয় না। মনুষ্যবসতি ও চাষবাস আছে। ২৪পর-গনার সুন্দরবনের নদীর জল বেশী নোনা। বর্ষাকালে বড় নদী-গুলিতে দু'টি বিপরীত মুখী স্রোত দেখা যায়। একটা সমুদ্রজলের, অন্যটা বর্ষার জলের স্রোত। নিম্নভূমিতে জোয়ারের জল ওঠে এবং পলি জমে। নদীর বহুস্থানে চড়া পড়ে গেছে। কিছুটা পড়ে দু'পাতা বাদ দিয়ে আবার পড়া শুরু করে। গাছ গাছরা লতা পাতার বর্ণনা পড়ে পশু পাখির কথায় আসে। সুন্দরবনের কেঁদো বাঘের মত হিংস্র ও সাহসী বাঘ পৃথিবীতে বিরল। অসংখ্য বানর, বন্যবরাহ, হরিণ, চিতা, বিষধর সাপ সর্বত্র। আজকাল বন্য মহিষ (বয়ার) গণ্ডার দেখা যায় না। বর্ষাকালে অসংখ্য পাখি দেখা যায়। দূর দূরান্ত থেকে উড়ে আসে।

কুমীর, বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাঠুরিয়াও মাঝি মাল্লারা গাজি মোবারক আলির স্মরণ নেয়। ফকির মন্ত্র পড়তে পড়তে বনে ঢোকে। বৃত্ত এঁকে লতাপাতা দিয়ে সাতটি ঘর বানায়, জগবন্ধু, মহাদেব ও মনসাদেবীকে তিনটি ঘর উৎসর্গ করে। জঙ্গলের উপদেবী রূপাদেবীর জন্য বেদী তৈরী করা হয়। চতুর্থ ঘরের একদিকে মা

কালী, অপর ভাগ উৎসর্গ করা হয় তাঁর কন্যা মায়াদেবীকে। তারপর বনের উপদেবী ওড়পরীর বেদী। পঞ্চম ঘরের একভাগে কামেশ্বরী, অন্যভাগে বুড়াঁঠাকুরানী। তৎপরে রক্ষা চণ্ডী নামে সিঁদুর লিপ্ত একটা গাছের গুড়ি থাকে। ষষ্ঠ ঘরের একদিকে গাজী সাহেব, অন্যদিকে স্থাপন করা হয় তস্য ভ্রাতা কালুকে। সপ্তম ঘরে গাজী সাহেবের পুত্রদের উৎসর্গ করা হয়। ঘটে সিঁদুর দিয়ে দেবতাদের ছবি এঁকে নিশান উড়িয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দেওয়া হয়। কাঠুরিয়া বা মউলের দেওয়া নতুন কাপড় পরে ফকির পূজা দেন। বাঘের মন্ত্রপড়া হলে কাঠুরে বা মউলেরা বনে ঢোকে।

সুদর্শন পড়তে পড়তে হেসে ফেলে। তার হাসি দেখে বৌটি মুচকি হাসল। অজিতবাবু বললেন, কি হে হাসছো কেন?

সুদর্শন পড়ে শোনাল। আশে পাশের সবাই তন্ময় হয়ে শোনে। বৌটির স্বামী বলল, আজকাল এ ভাবে পূজা হয় না; শুধু বনবিবির হয়। মন্ত্রের কোন গ্যারান্টি নেই। ঠাকুরদার মুখে শুনেছি কোন জেলে বা কাঠুরে বনে মারা গেলে নৌকার হাল।দাঁড় উল্টে মাটিতে পুঁতে রাখত। হালের মাথায় এক টুকরো সাদা কাপড়ের নিশান উড়িয়ে একমুঠো চাল কাপড়ে বেঁধে দিত। আজকাল এসব দেখা যায় না।

সুদর্শন কথা বাড়ায় না পড়তে থাকে—

কারও কারও মতে এক সময় সুন্দরবনে লোকালয় ছিল। মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচারে বহু লোক ঘর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। জনশূন্য হয়ে যায়। তার উপর ভূমির অবনমন হেতু ঘর বাড়ী মাটির তলায় তলিয়ে যায়। খননের ফলে কোথাও বাঁধানো পুকুর ঘাট, মন্দির, পাকাবাড়ী, গাছ, মূর্তি ও ব্যবহৃত জিনিষপত্র পাওয়া গেছে।

আবার দু'পাতা বাদ দিয়ে পড়ে, রায়মঙ্গল নদীর মোহনার মুখে সমুদ্র ৫০-৬০ ফুট গভীর। কয়েক মাইল পরেই সমুদ্র হঠাৎ ১৭০০ থেকে ১৮০০ ফুট গভীর। এই গভীর অংশকে 'অবতল (swatch of no ground) বলে। ফার্গুসন সাহেবের মতে, জলের প্রবল ঘূর্ণির ফলে

মাটি থিতাতে বা পলি জমতে পারে না। নদীগুলি বঙ্গোপসাগরে-পড়ার সময় অতল তলের মুখে ধাবিত হয়। তাই সুন্দরবনের দক্ষিণে মোহনার চরগুলির অগ্রভাগ অতল তলের দিকে মুখ করে থাকে। পূর্ব দিকের চর পশ্চিম মুখী, পশ্চিন দিকের চর পূর্বমুখী। হঠাৎ ভূমিকম্প ও অবনমনের ফলে বনের স্থানে স্থানে মাটি বসে গেছে। ভাঙাগড়া চলছেই। এটাই সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য। বর্ষাকালে একটা শো শো আওয়াজ শোনা যায়। বরিশালের গান বা 'গৈবী' আওয়াজ বলা হত এক সময়। আসল কারণ আজও অজ্ঞাত। তবে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, বায়ু ও জলের মধ্যকার ঘর্ষণে এমন আওয়াজ হতে পারে।

সুদর্শন বইটি বন্ধ করে। ওর খিদে পেয়েছে। সুধীরবাবুর দেওয়া মিষ্টিগুলির সদব্যবহার করবে বলে প্যাকেট খুলে অজিতবাবুদের হাতে দিল। সুকন্যা গম্ভীর। আনন্দ, উচ্ছলতা নেই। বাণীদেবীও নীরব। সুদর্শন ওদের রোগ বোঝে। খেতে লাগল উচ্চবাচ্য না করেই। ওরা চায় সে আর কোন মেয়ে বৌর সঙ্গে না মিশুক। বাণী-দেবী চান সে সুকন্যাকে নিয়ে মজুক। অনন্যা শরীর সর্বস্ব। রেডিও, টি. ভি. আর সিনেমা ছাড়া রুচি নেই অন্য কিছুতে। কত মূল্যবান সময় এরা নষ্ট করে টি. ভি.র বাজে প্রোগ্রাম দেখতে। ঐ সময় কত ভাল ভাল বই পড়তে পারে। সুদর্শন সামনের বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে আ— আ করতে লাগল। খুশিতে নাচতে লাগল দুলে দুলে।

বৌটি বলল, ছেলে কারও কোলে যেতে চায় না। কান্নাকাটি করে। আপনার কোলে দিব্যি গেছে। আপনি যেন ওর কত চেনা।

—ও মানুষ চেনে। আমি ভাল মানুষ। তাই কাঁদছে না। কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী হেসে উঠল। বরটির চোখ আছে। প্রেমে পড়ার মতই মেয়ে বটে। যেমন রং, তেমনি চোখ। মিষ্টি মুখ। সতেজ শরীর।

প্রায় তিনঘণ্টা লঞ্চ চলল। মাঝে মাঝে ঘাটে দাঁড়ায়, তবে যাত্রীদের ওঠা নামা কম। এত কম যাত্রীতে ইঞ্জিনের তেল খরচ কি ওঠে! কিছু সময় পর লঞ্চ দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এগুতে পারবে না। ভাঁটার টান চলছে। চড়ায় ঠেকে যাবে। ক্যানিং-এর ঘাট অদূরে। উঁচু বাড়ীগুলি দেখা যায়। মানুষদের দূর থেকে ছোট পুতুলের মত দেখাচ্ছে। তিন থেকে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করলে জোয়ারে জল বাড়বে।

কে আর বসে থাকে? ঝপাঝপ অনেকে লাফিয়ে জলে নামল কয়েকটা ডিঙ্গী নৌকা এগিয়ে এলে মালপত্র বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে নৌকায় উঠল কেউ কেউ। নৌকা হাঁটু জল পর্যন্ত যাবে। তারপর জলে নামতেই হবে। এপথে যারা নিত্য চলাফেরা করে তারা মাঝি মাল্লাদের হাত ধরে নেমে যায়। বাদ সাধল সুকন্যা ও বাণীদেবী।

অজিতবাবু প্যাণ্ট গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুলে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে নেমে গেলেন। সুকন্যা 'বাবা' 'বাবা' বলে চেঁচাতে লাগল। বাণী-দেবী ও মা কত জল, আমি নামব না, ডুবে যাব বলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

অজিতবাবু ধমকের সুরে বললেন, এত মরার ভয় কেন? নেমে পড়। বলেই তিনি হাঁটতে লাগলেন।

বাণীদেবী অগত্যা কাপড় গুটিয়ে নিলেন। তু'জন মাঝি হাত ধরে নামাতে এল। বাণীদেবী ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। জীবনে প্রথম নদীতে নামছেন। এমন অবস্থায় তিনি ভয় পাবেনই। ভারী শরীর। ওরা ভার রাখতে পারলনা। নৌকার ওপর পড়ল ধপাস করে। সুকন্যাকে পাঁজাকোলা করে নামাল। ভয়ে বোবা হয়ে গেল। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ও সঙ্কুচিত ভাব ওর।

ডিঙির মাঝখানে সুদর্শন দাঁড়িয়ে। তু'পাশে বাণীদেবী ও সুকন্যা। ওদের শক্ত করে ধরে আছে। ভয়ে ওদের লজ্জা মাথায় উঠেছে। উন্নত শরীর অসংলগ্ন হয়ে থাকে।

কিছুদূর এসেই নৌকা থামল। এবার নামতে হবে। বাণীদেবী

হাঁটু সমান কাপড় তুলে নেবে যায়। সুকন্যা আপত্তি জানালে সুদর্শন ওকে নামিয়ে আনে। ভয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। সালোয়ার ভিজে যাওয়ায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, এমন অবস্থা হবে জানলে আসতাম না, যত সব অসভ্য, বুনো মানুষের বাস।

আবার বাজে কথা বলছো। জলে ডুবিয়ে দেব। এসব অর্ধসভ্য মানুষদের জন্যই তোমাদের সভ্যতা টিঁকে আছে। তোমাদের বাবু-গিরি চলছে। তোমার ভবানীপুরের পার্কে ধান হয়, না মাছ হয়? যারা অন্নবস্ত্র জোগাবে তাদের নিন্দা করবে? তোমার বিয়ে দেব এই বুনোদের সঙ্গে। সুদর্শন গম্ভীরভাবে বললেন।

সুকন্যা ধ্যাৎ বলে সুদর্শনকে ঠেলা দিল। বালির উপর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে, কিছুদূর কাদা ভেঙে ঘাটে উঠল ওরা। একটা বড় রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে ব্যাগপত্র রেখে হাত পা ধুয়ে গরম গরম কচুরি, জিলিপি ও কাঁচগোল্লা খেয়ে স্টেশনে গেল আধঘণ্টা পর ট্রেন। ওরা একটা বেঞ্চে বসল। অজিতবাবু বসেই সিগারেটে আগুন ধরালেন।

ট্রেনে উঠে একটা সিটে সুদর্শনের পাশে সুকন্যা বসল। আলো কম। ক্লান্তি ও অবসাদে সুদর্শনের শরীর ঢলে আসে। মা ও মেয়ে চুপচাপ বসে থাকে। যাত্রীরা রূপসী যৌবন ধন্যা নারীর দিকে তাকিয়ে দেখছে। পথে ঘাটে এদের উদ্দেশ্যে কত অশ্লীল মন্তব্য টিটকারী বর্ষিত হয়। একশ্রেণীর পুরুষ যৌন তাড়নায় আচ্ছন্ন। সুপ্রজননবিধি, জন্মশাসন নেই। পৃথিবীতে বহু পুরুষের কাছেই নারী এখন ভোগ্যপন্য। নারীর শরীরটির জন্য কত অঘটন ঘটে যাচ্ছে দেশে-দেশে। পুরুষই নারীকে প্রলুব্ধ করে, নারীরা পুরুষদের বিশ্বাস করে খপ্পরে পড়ে। নারীর চরিত্রের চেয়েও পুরুষের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। পুরুষদের স্বরূপ কি তা সুদর্শন বোঝে।

তবে সুদর্শন একথাও বিশ্বাস করে পুরুষ নারীকে ভালবাসে বলেই তার চরিত্রে উদারতা আছে। সে নারীর মত সকীর্ণ মনা নয়। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, নারীবিদ্বেষ পুরুষের চরিত্রে কম। পৃথিবীর সর্ব-

দেশের সর্বকালের নারী পুরুষের ইতিহাস পড়ে সুদর্শন এ ধারণায় এসেছে। তার মতে পুরুষ খেলোয়াড়, নারীরা খেলার সামগ্রী। এ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তার তর্ক বাঁধে। সুকন্যা, ওর মার সঙ্গেও কম তর্ক হয়নি।

দু'ঘণ্টা পর আবার সেই পরিচিত শহর। গাড়ী, ঘোড়া, মানুষজন হৈ হল্লা, ব্যস্ততা। বুকে যেন প্রাণ ফিরে আসে। দূরে কোথাও গেলে শহরটির আকর্ষণ বেড়ে যায়। এমন মোহময়ী শহর ভূভারতে বিরল। কলকাতার জন্য তাই এত গর্ব।

বালীগঞ্জ স্টেশনে নেমে যে যার ঘরের পথ নিল।

সুন্দর বনে দ্বিতীয় যাত্রা

সুদর্শন কলকাতায় এসে সুন্দরবনের গল্প করে। বাড়িতে, অফিসে, আড্ডায় শুধু সুন্দরবন প্রসঙ্গ। বন দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে অনেকেই প্রকাশ করল। বাঘ দেখবে, মধু আনবে, মাছ খাবে – এক এক জনের এক এক রকমের ইচ্ছে। কেউ ওদের সুখ দুঃখের কথা জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল না। শুধু স্বার্থ। এজন্য ঐ অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষরা শহরের মানুষদের এড়িয়ে চলে। ওরা সভ্য-জগতের মানুষদের ধূর্ত ও লোভী বলে মনে করে।

দেখতে দেখতে শীত, বসন্তকাল কেটে গেলে। চৈত্র অবসান হল। অধ্যাপক অজিতকৃষ্ণ বসু চিঠি দিয়েছেন। তাঁর 'যাদুকাহিনী'র সংস্করণ বের হয়েছে। কাগজে সমালোচনা করতে হবে।

কাজটি না করলেই নয়। গুরু দক্ষিণা। তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে সুদর্শন একজন। এক প্যাকেট মিষ্টি কিনে তাঁর বাসায় গেল একদিন। উনি এখন অবসর নিয়েছেন। এক সময় নানা পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। আধুনিক পাঠক ও সম্পাদকরা তাঁকে ভুলে গেছেন।

ঘরে ঢুকতেই অধ্যাপক বললেন, কতদিন পর এলে। তোমার মত কৃতী ছাত্রদের দেখলে পরমায়ু বেড়ে যায়। তোমার কথা দীপককে বলেছি। দীপক খুব ভাল যাদু খেলা দেখায়। ওর শো দেখে কিছু লেখ।

দীপক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আপনার কথা স্যারের মুখে কত শুনেছি। কয়েকমাস আগে সজনেখালি সম্পর্কে আপনার রিপোর্ট পড়েছি। গতকাল পড়লাম 'হ্যামিলটনের গোসাবা'। খুব তথ্য বহুল লেখা। এবার আমাদের দেশে চলুন। বন নেই তবে লেখার মত প্রচুর বিষয় আছে। মানুষের দুঃখ কষ্ট।

— কোথায় গড় ভাই? কি পড়ছো? দেশ কোথায়?

—আশুতোষ কলেজে বি. এ. পড়ি; ফাইন্যাল ইয়ার। মৃণাল রায়ের কাছে যাদু খেলা শিখছি। স্যারও গাইড করছেন। সামনেই গরমের ছুটি। চলুন। যোগেশ গঞ্জের গোবিন্দকাটিতে আমার বাড়ি। এখানে গড়িয়ার একটা মেসে থাকি।

—এই তো আমি গোসাবা ঘুরে এলাম। খুব ভাল লাগল। ছুটি পেলেই যাব। দেখি অফিসে কথা বলে। তুমি কলেজে ছুটি হওয়ার এক সপ্তাহ আগে দেখা করবে। দিনক্ষণ দেখে নেব। দীপক খুব খুশী। ঠিকানা লিখে নিল।

অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ পেয়েছেন। ২৪ পরগণার ডি. এম. রাণু ঘোষ যোগেশ গঞ্জে যাচ্ছেন। নতুন খালের উদ্বোধন করে সি. পি. এম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী নেতাদের নালিশ জমে আছে। বরাদ্দ অর্থ নয় ছয় করা সম্পর্কে নিজের চোখে দেখবেন।

একদিন সম্পাদক তলব করে বললেন, সুদর্শন ভাগ্য তোমার সহায়। ছুটি নিতে হবে না। বড় নিউজ করবে। ফটোগ্রাফার নিয়ে যাবে। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল সুদর্শন।

দীপক একদিন ওর বাড়ি দেখা করতে এল। চন্দননগরে ওরা যাদু সম্মেলন করবে। যেতে হবে। দিনক্ষণ ঠিক হয়, সুন্দরবন যাওয়ার। সুদর্শন ও দীপক এক সন্ধ্যায় বসির হাট চলে এল। মিত্র বাড়িতে এসে উঠল। সুদর্শনের আত্মীয়। অবস্থাপন্ন ঘর। অতিথি পরায়ণ।

দীপকের খুব ডিমাণ্ড। টুম্পা, ঝুম্পা, বাবু, ওর কাছ, থেকে নড়ে না ওরা নাম দিয়েছে ম্যাজিক কাকু। কয়েকটা খেলা দেখেই ছোটরা মজে গেছে।

গোপেন মিত্র, দীপেন মিত্র খেতে বসে বলল, আমাদের বাড়িতে সুন্দরবনের কত মানুষ এসে থাকেন। এ বাড়ির ভাত খেয়েছেন বহু স্কুলের হেডমাষ্টার। বাবা বেঁচে থাকতে দু'খানা ঘর ওদের জন্য ফাঁকা রাখতে হত।

চায়নাদেবী, গোপেনবাবুর বৌ হেসে বললেন, আমাদের আর বন

দেখা হল না। একবার আপনাদের সঙ্গে যাব।

বানীদেবী দীপেনবাবুর স্ত্রী চায়নাদেবীর কথা সমর্থন করতেই সুদর্শন বলল, দাদারাও ছেড়েছেন, আপনারাও গেছেন! রাধা নাচবে না, তেলও পুড়বে না।

ওরা বেশী রাত করল না। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে। খেয়ে আধঘণ্টা গল্প করে বৈঠকখানার ঘরে দু'জন শুয়ে পড়ল। বাচ্চারা অনেক আগেই শুয়ে পড়েছে। কাল সারাদিন পথে কাটবে।

হাসনাবাদ

সকালে গরম গরম লুচি, সুজি ও রসগোল্লা খেয়ে বেড়িয়ে পড়ল। সাত সকালে ভাত খাওয়ার অভ্যাস নেই। পথে যেতে কিছু খাবার কিনে নিয়েছে। দুপুরে ভাত খাওয়া হবে না।

সাড়ে ন'টায় হাসনাবাদ পৌঁছে লঞ্চের অপেক্ষায় বসে রইল। একটা পত্রিকা কিনে নদীপথের লঞ্চগুলির নাম ও গন্তব্যস্থান লিখে নেয়। বাজার পেরিয়ে 'গ্রহরাজের' মন্দিরে ঢুকে মূর্তিগুলি দেখে। সুন্দরবনের একপ্রান্তে হাসনাবাদ। এক সময় উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল। লঞ্চঘাটের অদূরে নদীতীরে মন্দিরটি গড়ে উঠেছে ১৩৫৫ সালে। নামে নবগ্রহ মন্দির হলেও বড় মূর্তিটি শনি ঠাকুরের। ভক্তরা ঐ নামটি উচ্চারণ করেন না বলেন 'বড়বাবার' মন্দির। সাতক্ষীরার শৈলেন্দ্রনাথ আচার্য ছিলেন পুরোহিত। এখন সেবাইত নরেন্দ্রনাথ আচায। মন্দিরের দেয়ালে জ্যোতিষচর্চার বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ে।

সেবাইত আচায মহাশয় জানালেন হাসনাবাদে এর চেয়ে পুরোনো মন্দির আর নেই। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণপক্ষের শনিবার ও অমাবস্যার দিন খুব ভিড় হয়। আর প্রতিষ্ঠা দিবসে তো তিলমাত্র জমিও ফাঁকা থাকে না। যাই হোক লঞ্চে ওঠার আগে, সুন্দরবন যাওয়ার মুখে এ মন্দিরে কপাল ঠোকেন না, এমন মানুষ বিরল। দীপক ছবি তুলল। ক্যামেরাটা ওর এক রুমমেটের থেকে চেয়ে এনেছে।

দোকানপাটের কোন সৌন্দর্য নেই। এলোমেলো সব। কলা পাউরুটি, সবেদা কিনে লঞ্চঘাটে এল। লঞ্চের ভো শোনা যাচ্ছে। দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে। বেলা এগারোটা। "মানবলক্ষ্মী" ঘাটে ঢুকল। সুদর্শন ও দীপক ভাল জায়গায় বসার জন্য ডেকের উপর উঠে চারদিক দেখে নিল। নদী তত চওড়া নয়। এপার ওপার দেখা যায়। ছোট ছোট ঘর, জলে প্রচুর ডিঙ্গী নৌকা। ঐ পারে ফাঁকা মাঠ। ঠাণ্ডা বাতাস। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

বড় লঞ্চ। আরও কিছু লোক উঠতে পারত। লঞ্চ ছাড়ল প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে। জল তোলপার করে। ওরা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগল। লঞ্চ এগিয়ে চলে। ঘাটে ঘাটে দাঁড়ায়। দীপক বিভিন্ন স্থানের নাম বলে দেয়। সুদর্শন লিখে নেয়।

একঘণ্টা পর সিটে এসে বসল। হাতে নারায়ণ সান্যালের 'সত্যকাম'। তার প্রিয় লেখকদের একজন নারায়ণবাবু।

সামনের সিটে এক নব দম্পতি। হাতে ফিচার ম্যাগাজিন। অন্য যাত্রীদের থেকে আলাদা। শহুরে ভাব। আধুনিক পোশাক। চার-পাঁচটা ছেলে একপাশে বসে বিড়ি ধরিয়ে অশোভন কথা বলছে। একটু বয়স্করা ঝিমোচ্ছে ; অলস মধ্যাহ্ন। সুদর্শন পাঠে বিমুখ। নবদম্পতির ঘন ঘন দৃষ্টিপাত তাকে পুলকিত করে তোলে। নতুন গল্পের প্লট তৈরী করে মনে মনে।

গোবিন্দ কাটি

কামদেবপুর, কাটাখালি পেরিয়ে লঞ্চ হিঙালগঞ্জে দাঁড়ায়। সুদর্শনের চোখ ক্যামেরার মত সৌন্দর্য ধরে রাখে। মনে মনে বলে, কি সুন্দর গ্রাম বাংলা। বহু লোক উঠল। অধিকাংশই গরীব মানুষ। নদীর ধারের কুঁড়েঘর দেখে বোঝা যায়, এরা প্রকৃতির কোলে শিশুর মত দিনগুজরান করছে। ঠাসাঠাসি বসল সবাই।

গোসাবার নদীর মত দৃশ্য। ডিঙ্গীনৌকা, ড্রামের সঙ্গে জাল বাঁধা। জেলেরা মাছ ধরছে। তার পাশে রোগা মত একজন যুবক এসে বসে। হাতে একগাদা কাগজ। কথায় ধার আছে। দুনিয়ার খবর রাখে। কৌতূহল হল ওর। কি কাগজ? কোথায় নামবেন? জিগ্যেস করল।

—সাহেবখালি নামব। 'গণশক্তি' পত্রিকা। এ অঞ্চলে অন্য কাগজের চেয়ে গণশক্তি বেশী চলে। অনেক লড়াই দিয়ে কংগ্রেসকে হটিয়েছি। এ নির্বাচনে কংগ্রেসের কমল বসু হারবে। আমাদের ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত জিতবেন।

—এত বিরোধীতা সত্বেও বড় বড় কাগজগুলি তো আপনাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে। তবু জিতবেন?

—নিশ্চয়। আপনাদের কলকাতার মানুষ বলে মনে হয়। ভদ্রলোক, বাবু মানুষ। দূর থেকে আমাদের দুঃখ বুঝবেন না। কংগ্রেস গত বিশ বছর এ অঞ্চলে কিছু করেনি। সাধারণ মানুষ আমরা, ছোট লোকেরা বামফ্রণ্ট ছাড়া বুঝি না। ঘুরে ঘুরে দেখবেন।

সুদর্শন পরিচয় গোপন করে রাখল। পার্টির জন্য এরা কেমন জীবন সর্বস্ব পন করে কাজ করছে। অন্য দলে যদি এমন নিষ্ঠাবান কর্মী থাকত, দেশ কিছু কাজ পেত। আপনারা কি করেছেন, যে এত আত্মবিশ্বাস? প্রশ্ন করে সুদর্শন পরে মুখের দিকে তাকাল।

—আপনি এদিকে মনে হয় এই প্রথম? কোথায় যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, এদিকে ঘুরতে এসেছি। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—সুন্দরবনের মানুষ জমির আলের ওপর দিয়ে হাঁটত। সাপের ভয়ে মানুষ আতঙ্কে থাকত। এখন নদীর বাঁধ, রাস্তাঘাট চওড়া ও উঁচু করা হয়েছে। জন মজুররা জোতদারদের খেয়াল খুশী মত পারিশ্রমিক পেত। এখন পাচ্ছে সরকারী রেটে। রাস্তাঘাট, স্কুল মেরামত, খাল সংস্কার ও অন্যান্য জনহিতকর কাজ হয়েছে। জোতদার, ফড়েরা অপপ্রচার চালালেও কাজ বন্ধ হয়ে নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডুলডুলি পেরিয়ে গেল। আশেপাশের অনেকেই ওদের কথা শুনছে। তর্ক উঠতে পারে, তাই সুদর্শন আর প্রশ্ন করল না। যুবকটি বলল, তার নাম অমিয় মণ্ডল, অঞ্চল প্রধান। সঙ্গে বিনয় রায়। সি. পি. এম সদস্য।

কালিন্দী নদী পেরিয়ে সাড়ে তিনটায় লঞ্চ সাহেব খালিতে দাঁড়ায়। অমিয় মণ্ডলরা নেমে গেল। এদিকে কিছু পাকা ঘর বাড়ী আছে। অন্যদিকে ছোট বনভূমি। নাতিদীর্ঘ গাছ গাছালী। ভীর অনেকটা কমে যায়। বৌটি তাকিয়ে হেসে ফেলে। সেও সংক্রামিত হয়, ঐ হাসিতে।

দুপুরে ওদের ভাত খাওয়া হয়নি। রুটি ও মিষ্টি খেয়ে নিল। কমলালেবু, সবেদাও খেল। আগামী নির্বাচন ও সাহিত্য জগতে ডুবে গেল দীপক আর সুদর্শন।

সূর্য ডোবা বিকেল। আকাশে মেঘ। গরম হাওয়া, ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে তেমন ঢোকে না।

কিছু সময় পর সন্ধ্যা নামল। আঁধার এল ঘনিয়ে। লঞ্চের সার্চ লাইটের আলো জলে ঘুরপাক খাচ্ছে। লঞ্চ ঘাট এলে আলো স্থির হয়ে যায়। মানুষজন ওঠে নামে। শ্যামা পোকার উৎপাত শুরু হয়। পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। চাড়ালখালি ছেড়ে লঞ্চ এগিয়ে চলে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সঙ্গে মেসিনের ভট্ ভট্ শব্দ মিতালি পাতিয়ে বিকট ছন্দ সৃষ্টি করেছে।

সুদর্শনদা সৎ হলেই কি জীবনে উন্নতি করা যায়? পরিশ্রমী ও

গুণী মানুষ মানসম্মান পান না, আবার কত অযোগ্য মানুষ প্রচার ও মানসম্মান পাচ্ছেন। আমাদের স্যার অজিতকৃষ্ণ বসু) কত সুন্দর মানুষ, সৎ লেখক। কে তাঁর খোঁজ রাখে? কত অলেখক আপনাদের দৌলতে কাগজে প্রচার ও পুরস্কার পাচ্ছেন।

—চরিত্র, সততা একটা আলাদা জিনিষ। যে যাই করুক না কেন সততা থাকলে চরিত্রে একটা দৃঢ়তা জন্মায়। কেউ কেটা হতে না পারলেও সাধারণ মানুষ তাকে সমীহ করে চলেন। মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠা কর্মফলে হয়।

কর্মফল হলে বনফুল, অচিন্ত্যকুমার, বিভূতিভূষণ প্রমুখ তেমন পুরস্কৃত হলেন না। অথচ আজকাল একজন তৃতীয় শ্রেণীর লেখক কত পুরস্কার পাচ্ছেন, দেশ বিদেশে যাচ্ছেন। পত্রপত্রিকার প্রচারে প্রচুর অর্থ ঘরে তুলছেন। মদ ও নারীতে আসক্ত, নষ্ট চরিত্র সত্বেও তিনি লেখক হওয়ার যোগ্যতা পেলেন কোন্ কর্মফলে?

ভালো প্রশ্ন করেছো। আমিও তো ভেবেছি, অনেক সাধু পুরুষকে প্রশ্ন করেছি তাঁরাও বলেন, ঐ কর্মফল, ভগবানের ইচ্ছে গত জন্মে লেখার সাধনা করেছেন, চরিত্রের সাধনা করেননি।

তবে আর চরিত্র টরিত্র নিয়ে গর্ব করে লাভ কি? সবই যখন কর্মফল, গতজন্মের ব্যাপার! যেমন খুশি চলা যায়—

—না দীপক, নিজের বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। ভগবান সৎমানুষদের দেখেন, একটা বিশেষত্ব থাকেই। তাছাড়া এজন্মের শুভকর্মের ফল কিছু পাওয়া যায়। পরজন্মেও পাওয়া যাবে। হিন্দু শাস্ত্র তাই বলে। আর এসব হীন চরিত্রের লেখকরা তো সীজন ফ্লাওয়ার। কোন পাঠক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে না। এদের বই ঘরের আলমারিতে স্থান পায় না। বরং চরিত্রবান মহৎ লেখকরাই যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেন, তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে।

দীপক আর তর্ক করে না। মেনে নেয়। সুদর্শন শেষে বলল, সর্বত্র প্রতিভার দৈন্য চলছে। সাহিত্য সংস্কৃতিতে দৈন্য দশা। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। ওরা ধূর্ত শেয়াল, সাধারণ মানুষ বোকা ছাগলের

ভূমিকায় আছে। তবে বেশী দিন নয়। দিন বদলের পালা শুরু হয়ে গেছে।

বৃষ্টি নামল। লঞ্চের তু'পাশে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লোকজন ভেতরে চলে এল।

কিছুক্ষণ পর দীপক বলল, প্যান্ট ফোল্ড করুণ। মালেকানা ঘুমটিতে নামব। হেঁটে তু'মাইল যেতে হবে। গোবিন্দ কাটির পথ এটাই। চটি হাতে নিন। বাঁশ ধরে সাবধানে নামবেন।

ঘাটে লঞ্চ দাঁড়াল। কোন সিঁড়ি বা ইঁট বাঁধানো ঘাট বলে কিছু নেই। কাদার মধ্যে নামতে হবে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। জোয়ার থাকলে পাড়ের কাছে নামতে পারত। ভাঁটা থাকায় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাঁশ ধরে কাদায় নামতে হল। ভয়, এই বুঝি পিছলে পরে যাবে। অন্যরা তরতর করে নেমে গেল অবশ্য।

প্রায় হাঁটু সমান কাদায় পা ডুবে গেল। দীপকের হাত ধরে উপরে উঠে এল। ধারে জলকল নেই। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দীপকের হাত ধরে সুদর্শন হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার মাটিও পিচ্ছিল। উঁচু নীচু। টর্চের আলোয় অতি সাবধানে হাঁটলেও পা হড়কে যায়। পায়ের পাতা এঁটেল মাটিতে ভারী হয়ে ওঠে।

—দীপক, আমরা কি পশ্চিমবঙ্গে আছি? এর চেয়ে পাহাড়ে ওঠা অনেক সহজ। অজিতবাবুরা এলে কেঁদে ফেলতেন।

- দাদা, আমাদের কষ্ট দেখুন। কলকাতায় থাকেন, ট্রামে বাসে চড়েন। আমাদের তুঃখ শহুরে লোকেরা কি বুঝবে? সুন্দরবন নামেই যা সুন্দর। এখন ঠ্যালা বুঝছেন তো। আজ পর্যন্ত কোন সাংবাদিক এ তল্লাটে আসেননি।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্ক প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছেন। সব কি নোনা জলে খেয়ে নিচ্ছে?

দেখতে পাবেন সবই। বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।

দীপক তু'জন মানুষকে দাঁড়াতে বলে। ওরা দাঁড়িয়ে দীপকের কথা শোনে। ওঁদের কাছে সুদর্শনের পরিচয় দিল দীপক। বসন্ত কয়ালদা

ও মুরারী মণ্ডলদা ছু'জনেরই পেশা শিক্ষকতা, নেশা রাজনীতি। কংগ্রেস পার্টির কর্মী ওরা। প্রতি নমস্কারের পর ওরা বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানালো দীপককে। বিশেষভাবে বলে দিলো সুদর্শনকে নিয়ে যেতে। কিছু নালিশ জানাবো সরকারের বিরুদ্ধে।

ওরা অন্যপথ নিলে, দীপক বলল, ছু'জনেই প্রচুর জমির মালিক, জোতদার। এ তল্লাটের ডাকাবুকো মানুষ।

পথ যেন আর শেষ হয় না। হাঁটছে তো হাঁটছেই। নেহাৎ কৌতূহল। সুদর্শনের সুন্দরবনের মাঠঘাট, মানুষজন দেখবে বলে এত উৎসাহ।

ক্লান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় দীপকের বাড়ি এসে পৌছল রাতে। সারাদিন অস্নাত, অন্ন পেটে যায় নি। ফলে শরীরে অস্বস্তি। দীপকের হাঁক শুনে একজন প্রৌঢ় বাতি নিয়ে এগিয়ে এলেন। ওদের ভাষায় টেমি। কালো চিকন দেহ। দীর্ঘাঙ্গী না হলেও বেঁটে নন। দীপকের নাতুস নতুস, চেহারার বিপরীত। ঘরের দরজায় পৌছলে ওর মা বেরিয়ে এসে বললেন, নাড়ু এসেছিস! কতদিন পর এলি। এই খোকা, দেখ দাদা এসেছে। উনি কে? চিঠি না দিয়ে হঠাৎ এলি যে?

দীপক ওর পরিচয় দিল। ও'র বাবা ব্যাগ ধরে ঘরে তুললেন। হ্যারিকেন এগিয়ে দীপকসহ ঘাটে যেতে বললেন। গরীবের সংসার কোথায় বসাই? কষ্ট করে থাকবেন।

—কিছু ভাববেন না। জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। ছোট ভাইর বাড়িতে এসেছি। কষ্ট হবে কেন? সব রকম অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত। লজ্জা দেবেন না।

—আপনি এলেন বলে, নাড়ু সাত আট মাস পর বাড়ি এল। কলকাতার মোহে ধরেছে। ও ছিল মায়ের আঁচল ধরা ছেলে।

—উপায় নেই। মানুষ হতে গেলে শহরে থাকা চাই। কাব্যে গ্রাম চলে, বাস্তবে শহরের ভূমিকাই বড়ো। খবরের কাগজেও গ্রামের ভূমিকা নগণ্য। রেডিও, টি. ভি.-তেও শহরের লোকদের প্রাধান্য।

পুকুরে আলো নিয়ে দীপক আগে আগে যায়। সুদর্শন সাপের ভয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে চলে।

পুকুর না বলে ডোবা বলা ভাল। ভিটের মাটি তুলতে যে গর্ত হয়েছিল তাতেই জল জমেছে। নিচু জমি, তাই বারোমাস জল থাকে।

ওরা হাত পা ধুয়ে বারান্দায় মাদুরে বসল। দীপকের মা চা, মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা, বাটি ভরে এনে দিলেন।

—মাসীমা, এখন এসব কেন ? একেবারে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ব। খিদে নষ্ট হয়ে যাবে। লঙ্কা, পিঁয়াজ আমি খাইনা।

তবু অনুরোধে চা ও একমুঠো মুড়ি খেতে হল। দীপকের ভাই ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে। সুদর্শন ভাইয়ের হাতে চকোলেট দেবু, ওর মার হাতে সন্দেশের বাক্স দিল।

চা খেতে খেতে সে লক্ষ্য করেছে, মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি, ঘরের পরিবেশ অপরিছন্ন হলেও, এক আলমারি বই সযত্নে আছে। খাটের উপর কিছু নতুন বই।

সুদর্শন চা খেয়ে দীপকসহ ঘরে এসে বইপত্র দেখতে লাগল। রবীন্দ্র, বংকিম, শরৎ রচনাবলী। বিভূতিভূষণ, নারায়ণ সান্যাল, মার্ক্স, লেনিন ছাড়াও বিশ্ব সাহিত্যের হরেক রকম বই সযত্নে সাজানো।

—বাবা খুব পড়ুয়া মানুষ। ভাল বই পেলেই কেনেন। তবে আধুনিক কবিদের পছন্দ করেন না। উনি বলেন আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের চেয়ে বেশী কথা কি লিখেছেন ? ছন্দ নেই। ভাব নেই। অর্থও দুর্বোধ্য।

—তাই তো তোমার মত গুণী ছেলের জন্ম হয়েছে। বাবার নাম রাখবে। দীপককে বোঝায় সুদর্শন।

—ভাঙা ঘর ঠিক হচ্ছে না। শুধু বই কিনলে চলবে কি করে ?

—আমার দায়িত্ব ছেলে মেয়েদের মানুষ করা। বড় হয়ে ওরা ঘর বাড়ি করবে। সুদর্শনকে উদ্দেশ্য করে বলে সমর্থন চান রায়বাবু।

—ঠিক কথা। মানুষ না হলে ঘরবাড়ি দিয়ে কি হবে ? তারপর

সুদর্শন খাটের বইগুলি দেখে। উনি সদ্য কিনে এনেছেন। ভক্তি-বেদান্ত স্বামীর 'আত্মজ্ঞান লাভের উপায়', প্রণবেশ চক্রবর্তীর 'দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ,' নন্দলাল ভট্টাচার্যের 'চৈতন্য কথামৃত,' সংসঙ্গের 'নানা প্রসঙ্গে,' 'কথা প্রসঙ্গে' আরও কত বই

—বাবা কট্টর কম্যুনিস্ট। অথচ সব রকমের বই পড়েন।

—ভালই তো। সব কিছু জানা প্রয়োজন। মার্কসও তাই বলেছেন। লেনিন বিরাট পড়ুয়া ছিলেন।

রাতে সুদর্শন ঘুমোতে পারল না। হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক, ছাগলের ভ্যা ভ্যা, তার উপর ছেঁড়া মশারীতে মশার গুঞ্জন। সাপের ভয়ও কম নয়। শুয়ে শুয়ে সারাদিনের কথা, পর দিনের পরিকল্পনা ভাবল। শেষ রাতের তন্দ্রা টুঁটে গেল মোরগের ডাকে। তবু শুয়ে থাকে। বিশ্রাম হচ্ছে তো!

সংসারের জন্য দীপকের মা এত কাজ করেন। ছাগল, গরু—কি নেই? দু'টো পয়সার জন্য কি পরিশ্রম। ওর বাবাও তাই। মাঠ, স্কুল, হাট বাজার সবই করতে হয়। কর্মী মানুষ।

সুদর্শন বেলায় উঠে যথারীতি সূর্য প্রণাম করল। ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস। দীপকদের ঘরের পেছনে ধানক্ষেত। মাঠের পর মাঠ, যত দূর চোখ যায়। অপূর্ব দৃশ্য। সবুজ গাছ বাতাসে দুলে দুলে ওঠে। অনিদ্রা সত্ত্বেও সে অবসাদ বোধ করল না। শুদ্ধ বাতাস। মুখ ধুয়ে সে বারান্দায় বসে।

দীপকের বাবা পুকুরে জাল ফেলে ছোট মাছ ধরে আনেন। এদিকে মানুষের হাতে বন প্রায় নিশ্চিহ্ন। এখন বৃক্ষরোপন, বনসংরক্ষণ কত কি হচ্ছে সময় কালে দেখলে এ অবস্থা হত না। নদী, খাল আর নোনা জমির ওপর কত মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে। চাষীরা ফসল ফলাচ্ছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কারও কারও আঙ্গুল ফুলে কলা-গাছ। জোতদার রক্ত চোষারা লুটে পুটে খাচ্ছে। শতশত বিঘা জমি জোতদারদের দখলে। এখানে অর্থ শোষণ করে শহর এলাকায়

বাড়ি বানাচ্ছে, ব্যবসা করছে। আমরাও লড়াই দিচ্ছি। ছাত্রজীবনে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি সব ধাপ্পা। এম. এল. এ হাজারীলাল মণ্ডলও কংগ্রেস ছেড়ে সি. পি. আই পার্টিতে ঢুকেছেন।

কাদের কাছ থেকে আঘাত পেলেন? আপনার কাছে এসেছি কিছু শুনতে। অভিজ্ঞ মানুষ আপনি। এদিকের রাজনীতি কোন্ পথে চলছে?

দীপক মার সঙ্গে রান্নাঘরে কথা বলে। ওর ভাই সন্দীপ বই নিয়ে চুপচাপ ছবি দেখছে।

অনুকূলবাবু জলকাদার পায়ে দাওয়ায় বসেন। এদিকে নমশূদ্র তপশীল সম্প্রদায়ও মাতব্বর। আমরা নমশূদ্ররা, আদিবাসী সর্দারদের মানুষ বলেই মনে করিনা। বর্ণহিন্দুদের ওপর আমাদের অভিযোগ মিথ্যা। বরং ওদের সহযোগিতাই আমি পেয়েছি। এখানে মণ্ডল, রায়, বিশ্বাস গাইনরা ক্ষুদে জমিদার। ক্ষমতা ও অর্থ পেলেই মানুষ শোষক ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। জাতবর্ণ লাগে না। গরীব চাষী, ভাগচাষী, জনমজুরদের ওপর ওরা কম জুলুম করেছে? আমি কম্যুনিজমের মধ্যে মনের খোরাক পেয়েছি। আজ আমাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষরা আছে ওদের বিপুল সমর্থন নির্বাচনে আমরা পেয়েছি, আগামী নির্বাচনেও পাবো। যে যাই বলুক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ছাড়া মানুষ খাঁটি মানুষ হতে পারে না। আজ কিছু পদবীধারী দ্বিজের অসামাজিক কাজকর্ম দেখে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে ভুল বুঝলে চলবে না। আর্যরা এই সংস্কৃতি দেশে দেশে বয়ে নিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে যে সব জাতি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তারাই আর্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছেন। আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারবো সরকার শিক্ষা ও চাকুরীর যত সুযোগই শূদ্র ও উপজাতিদের দিন না কেন, যারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মেনে চলছেন না তাদের ঘরের ছেলেপুলেরা অসামাজিক হয়ে উঠছে। মা বাবাকে মানছে না। শহরে চাকুরী করে বাবু হয়ে যাচ্ছে বন্ধুদের কাছে বাবাকে চাকর বলে পরিচয় দিচ্ছে। আম্বেদকর ও শূদ্র আন্দোলনের নেতাদের অনেককেই

আমার মনে ধরে না।

—আম্বেদকর তো 'মনুসংহিতা' পুড়িয়েছেন শুনেছি। ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নানা সুযোগ পেয়ে ব্রাহ্মণ বিরোধিতাই করে গেছেন।

—তাতে কি আসে যায়? সাধারণ মানুষ তাকে কতটুকু মূল্য দিয়েছেন? ভারতীয় সংবিধান ও ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর ধর্মজ্ঞান ঠিক ছিল না।

—ঠিক বলেছেন, ধর্মকে কোন গুরুত্ব দেননি, মানুষের নৈতিক চরিত্রের কোন বিকাশ হচ্ছে না। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি, তবু মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে যেখানে ক্ষমতায় আছে দুর্নীতি, ধান্দাবাজী ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। ভারতবর্ষের মানুষদের দেখলে দুঃখ হয়।

সুদর্শন এসব নিয়ে বহু তর্ক করেছে, লিখেছে পত্রপত্রিকায়। আজ একজন সৎ, শক্তমনের মানুষ পেয়ে খুশি হলো। ন্যায্য কথা বলেন। একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এ অঞ্চলে সকলেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাই বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। আফ্রিকার মানুষ আর ইংল্যাণ্ডের মানুষে, বুলডগ আর নেড়ী কুকুরে পার্থক্য কেন? কেন উদ্ভিদের মধ্যে গুল্ম, বিরুৎ আর বৃক্ষের শ্রেণী বিভাগ? কেন হিন্দুর ঘরের মেয়ে বিয়ে করে খ্রীস্টান বা মুসলমানদের ঘরে সুসন্তান জন্মাচ্ছে না? কেন ব্রাহ্মণ কন্যা অব্রাহ্মণ পাত্রের ঘরে গিয়ে ব্যাধিগ্রস্থ, দেশদ্রোহী ও অস্থির মস্তিষ্কের সন্তানের জন্ম দিচ্ছে? সব মানুষের যতই রক্তমাংসের শরীর হোক না কেন, কোথায় যেন ফাঁক আছে। রক্তের মধ্যেই পার্থক্য। বৈজ্ঞানিকরা ব্যাখ্যা জানেন না।

উনি পুনরায় বললেন—এখন জাত বর্ণ বলতে বুঝি, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং শোষক-শোষিত। যাক ঐ সব কথা। আপনার কথায় আসি এই দ্বীপের চারদিকে নোনা জলের মেখলা দিয়ে ঘেরা। দ্বীপের মধ্যে অসংখ্য খাল, পুকুর। খাল কেটে মিঠা জলের সরবরাহ বাড়িয়ে অনাবাদী জমিকে দু'ফসলি করা হচ্ছে। গত ত্রিশ বছর এসব নিয়ে নেতারা ভাবেননি। এই জমি নিয়েই এখানে যত

মারামারি, দাঙ্গা বাংলা দেশ থেকে তাড়া খেয়েও আমাদের স্বভাব পাল্টায় নি। আজ কাকদ্বীপ কত বড় গঞ্জ। তেভাগা আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে।

—আপনার মত মানুষ এখানে এলেন কি করে? ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে কিভাবে? কলকাতা যেতে আসতেই দু'দিন চলে যায়।

—বাবা খুব গরীব ছিলেন। কোথায় আর যাবেন। খুলনা থেকে সোজা এখানে। মাঠের ধান, খাল বিলের মাছ, বনের কাঠ গরীবদের পক্ষে যথেষ্ট। দেখতে দেখতে বিশ বছর হয়ে গেল। তবে মেদিনীপুরের লোকই বেশী এসেছে।

—এদিকে ধান থেকে চাল হয় কি ভাবে? বিদ্যুত নেই। ধানকল আছে?

—আগে ঘরে ঘরে ঢেঁকি ছিল। এখন প্রতি গ্রামে একটা করে ধানকল, ডায়নামো দিয়ে চালানো হয়। জোতদারদের ঘরে টি. ভি. পর্যন্ত চলছে। পয়সা থাকলে কি না হয়?

আজ দীপকের দিদি জামাইবাবু এল। ছিপছিপে গড়ন। সঙ্গে ছোট ছেলে। নারকেলের নাড়ু এনেছে। একবাটি মুড়ি, গোটা দশেক নাড়ু দিয়ে ও বলল, খেয়ে নিন। দীপকের মুখে আপনার পরিচয় শুনলাম। ধন্য আমরা। বাবা তুমি হাত পা ধুয়ে এস, চা নামাচ্ছি। মিষ্টি সুরে বাবাকে বলল।

এক ঘটি জল হাত ধুয়ে অনুকূলবাবু চা মুড়ি নিয়ে বসলেন। খেতে খেতে বললেন—সুন্দরবনের জন্ম কবে কেউ জানেন না। তবে মোঘল আমল থেকে এর ইতিহাস জানা যায়। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যশোরের বড় ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে আসেন। প্রতাপাদিত্যের আমলের পাল—সেন—গুপ্ত যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য আবিষ্কার হয়েছে। বেড়াচাঁপার কথা আপনি জানেন। খ্রীঃ পূর্ব প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীর পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে।

—উন্নয়ন মূলক কি কি কাজ হয়েছে বা হচ্ছে ?

—শুনেছি সরকার চল্লিশ হাজার প্রান্তিক চাষীকে সতেরো হাজার একর জমি চাষের জন্য সাহায্য দিচ্ছেন। পানীয় জল, সেচ, শিক্ষা, বিদ্যুত, রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ চলছে। সরকার আরও প্ল্যান নিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন দু'লক্ষ টাকার কাজ করছেন। আপনি সল্ট থেকে 'সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদে' যোগাযোগ করলে অনেক তথ্য পাবেন। ১৯৮১ সালে এই পর্ষদের জন্ম হয়েছে। এমন দুর্গম স্থানের উন্নতি ধীরে ধীরে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হলে কাজ করা সহজ হতো। অন্য জেলারও কি সব কাজ হয়ে গেছে ? সরকারের হাতে তেমন অর্থ কোথায় ? পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা কি কম ?

অনুকূলবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বাজার ঘুরে আসি। সুন্দরবন না বলে সুন্দরগঞ্জ বলা ভাল। জয়নগর, মজিলপুর, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, ক্যানিং, পাথর প্রতিমা, রায়দীঘি এখন বড় গঞ্জ। বন বললে মানায় এখানকার ধান, মাছ, তরমুজ, ডিম ও শাকশব্জী কলকাতার বাজার ছেয়ে ফেলছে। নোনা মাটি বলে ভাল ঘাস হয় না, যার জন্য দুধের জোগান কম। আপনি দীপককে নিয়ে ঘুরে দেখুন। আমি একটু ঘুরে আসি।

একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি। নাতি বায়না ধরলে ওর দিদা এসে কোলে তুলে নিলেন। লজেন্স খাওয়ার বায়না ধরেছে ও।

সুদর্শন ও দীপক প্যান্ট শার্ট পড়ে বের হল। একটা খালের ধার মাটি ফেলে চওড়া রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। কিছুদূর গিয়ে দীপক বলল—এদিকে কেউ আসতে চায় না। কলকাতার মানুষদের ধারণা, সুন্দরবন মানে বাঘ, সাপখোপের স্থান। এত জনপদ, হাট বাজার আছে তা বিশ্বাস করতেই চায় না। দাদুর মুখে শুনেছি, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে টলেমি এসে এই পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে লিখে গেছেন কাটিয়াস রুফাস, শোয়ালরেক, মার্শম্যান, ভিনসেণ্ট স্মিথ, ডিওডোরাসের লেখায় কিছু তথ্য পাবেন। আর বিনয় ঘোষ, নীহাররঞ্জন

য়ায়ের লেখায় কিছু তথ্য আছে। লিপি, মুদ্রা, পাত্র ও মূর্তিতে গ্রেকোরোমান ট্রেডিং এর ছাপ পাওয়া গেছে। এখানে পূর্বে মানুষ নাকি কাঠের ঘর বানিয়ে বসবাস করত। এখনকার 'মউলে,' 'বাউলে', 'মঙ্গলীরা, পুরানে 'মঙ্গলিকী' জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। গানিনি মহাভাষ্যে সুন্দরবনকে 'কলকবন' বলে উল্লেখ আছে। এখন অশিক্ষিত লোকেরা বলে সোঁদরবন'।

—দীপক, তোমরা একদিকে ভাল আছো। সিনেমা, ফ্যাশান, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি বাদে খরচ নেই। এখানকার একজন শিক্ষকের যে বেতন কলকাতার শিক্ষকেরও তাই। কার খরচ বেশী?

তা ঠিক অশ্বিনীবাবু, পঞ্চাননবাবু ধনী মানুষ শিক্ষকতাও করেন। শুধু সেটলম্যাণ্ট অফিসারকে ঘুষ দিয়ে শতশত বিঘা জমি অনেকই নিজেই নামে রেকর্ড করে দখল নিয়ে আছেন। কে দেখছে এসব? ভোগ দখল হয়ে গেছে। এরাই গ্রামের মাথা। সি. পি. এমের শত্রু। তবে একসময় এদের অবদান ছিল। তারপর আখের গুছিয়ে নিয়েছে। স্বার্থ সর্বস্ব হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

দীপক পঞ্চানন বাবুর বাড়ী ঢুকল। বাগান ঘেরা বাড়ী। বনেদী বলে মনে হয়। সুদর্শন পঞ্চাননবাবুর মুখোমুখি চেয়ারে বসল। সুদর্শনকে পেয়ে প্রাণ খুলে নালিশ জানালেন। স্থানীয় রাজনীতি, শিক্ষা-নীতির কড়া সমালোচনা করে বললেন, শিক্ষকদের শিক্ষাকর্মীদের বেতন বাড়ালেও ডি. আই. অফিসের লাল ফিতার গাঁট যা ছিল তাই আছে। অবসর কালীন ভাতা পেতে চটির তলা ক্ষয়ে যায়। ডেপুটেশান ভেকেন্সিতে কোন শিক্ষক নিতে গেলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে, এমপ্লয়মেণ্ট অফিসকে জানিয়ে, প্রার্থীদের ইনটারভ্যু করে, ডি আইর অনুমতি নিয়ে তবে নিয়োগ করতে পারা যাবে। ততদিনে বছরের অর্ধেক শেষ। তাছাড়া ডি. আই প্রায়ই অফিসে থাকেন না। ক্লার্করা ঘুষ ছাড়া কাজে হাত দেয় না। ঘুষ না পেলে কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে। আরও অনেক কথা বললেন। সুদর্শন মন দিয়ে শুনল। সময় মত লিখবে।

পাশের বাড়ি অশ্বিনীবাবুর। কম কথার মানুষ। বেশ অবস্থাপন্ন মানুষ, দেখলেই বোঝা যায়। খুব একটা বললেন না। চায়ের কথা বলতেই সুদর্শন বারন করল। সবেমাত্র পঞ্চাননবাবুর বাড়ীতে খেয়েছে। ঠোঁট এখনও গরম।

কিছু সময় রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্রদের সমস্যা পঞ্চায়েতে দুর্নীতি প্রসঙ্গে কিথা বললেন। শেষে বললেন—জ্যোতিবাবুরা বেকারদের জন্য কিছু করেছেন না। পুলিশ আরও দুর্নীতি পরায়ণ হয়েছে। সরকারী অফিসগুলিতে কোন কাজ হচ্ছে না। মাসের পর মাস ফাইল জমে থাকে। ঘুষ ছাড়া নড়ে চড়ে না। আইন আদালতে মামলার ফয়সালা হচ্ছে না। উকিল মোক্তার শুধু পয়সা গুনতে শিখেছেন। বিরোধী পক্ষ কংগ্রেসীরা যখন খেয়োখেয়ি করে দুর্বল হয়ে আছে, তখন বামফ্রন্ট শক্ত হাতে কাজ করছেন না কেন? বেলা বয়ে যায় এদের হাতে সময় কম। অথচ প্রোগ্রাম অনেক।

দীপক বলল চলুন, আমাদের ক্লাব ঘর ঘুরে যাবেন। মাটির রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। সুদর্শন দেখল পঞ্চায়েত কিছু কাজ করেছে এ অঞ্চলে। হাইস্কুলের বাড়ী ইটের কিন্তু কোন সৌন্দর্য্য নেই। ক্লাব ঘরটা মাটির। চারদিকে গরানের ডালের বেড়া, মাথায় খড়। একদল ছেলে মাঠে ক্রিকেট খেলছে, অন্য ছেলেরা ঘরের মধ্যে কেরাম খেলছে। আর আড্ডা দিচ্ছে কিছু ছেলে। আজ যোগেশগঞ্জের সঙ্গে ক্যানিং-এর ফাইনাল খেলা।

ক্রমশঃ ওরা নদীর ধারে এগোচ্ছে। এক পথ দিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়েছে, ঘুরে অন্যপথ ঘুরে বাড়ী ঢুকবে। উদ্দেশ্য গ্রামটা দেখার। প্রায় দু'মাইল হেঁটে নদীর দিকের রাস্তা ধরল ওরা। মুক্ত বাতাস। মন পাখি খাঁচা ছাড়া।

—দীপক, এটা কি গরু ঘর? যখন তখন ভেঙ্গে পড়বে।

—না দাদা, সর্দ্দার পাড়ার প্রাথমিক স্কুল। বর্ষা নামলে গরু এসে ঢোকে। স্কুল ছুটি হয়ে যায়। কেউ দেখার নেই।

মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে ওরা নদীর বাঁধে ওঠে। মাঠের মধ্যে

কোথাও কোথাও কিছু ঘর বাড়ী, গাছ পালা, পুকুর। মরুভূমির মরুদ্যানের মত। বাঁধ থেকে একদিকে দিগন্ত প্রসারী ভূখণ্ড, অন্য-দিকে নদী, জল আর জল দেখা যায়।

ঘরে ফিরতে বেলা একটা। জলের কল অনেক দূরে। ঐ ডোবায় স্নান করতে হল। খেয়ে দেয়ে বিছানায় বসতেই চোখ টেনে ঘুম এল। গত রাতের অনিদ্রায় আজ সুদর্শনের কোন সাড় ছিল না। ঘুমের শেষ দিকে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখল সে। স্বপ্নটা হল

সুন্দর বনের বনাঞ্চলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক দীর্ঘ রাস্তা চলে গেছে। মাথার ওপর থেকে রাস্তার দু'পাশ মোটা তারে ঢাকা। চিড়িয়াখানার বাঘের ঘরের মত শক্ত লোহার বেড়া কিছু-দূর হাঁটতে হাঁটতে সুদর্শন দেখল হরিণ-হরিণী ঘুরছে। ঠিক গরুর মত লম্বা উঁচু। কি মসৃণ, কি অপূর্ব গায়ের রং। হরিণ ছুটে এসে মুখ বাড়িয়ে দেয়। আনন্দে ছোলা ছুড়ে দিচ্ছে। বনের আরও গভীরে বিশাল অজগর হরেক রকমেব সাপ তারের গায়ে বেয়ে বেয়ে উঠছে নামছে সাঁকো পেরিয়ে গভীর বনে গেলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার জান্তব ক্রোধে তারের ওপরে থাবা দিচ্ছে। কোথাও বাঘের বাচ্ছা বাঘিনীর দুধ খাচ্ছে। সত্যি বন্যেরা বনে সুন্দর মাথার ওপরে হরেক রকমের পাখি, বক, শকুন, কাক। কি অপূর্ব প্রকৃতি ও প্রকৃতি জাত প্রাণীর সহবস্থান। আনন্দে মন ভরে ওঠে। একটা হরিণীকে পাতা খেতে দিতে যায়, বড্ড মায়াবী ওর চোখ। পাতা ধরে টান দিতেই মশারী ফরফর করে ছিঁড়ে নাকে মুখে পড়ে। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

কি হল দাদা ? দীপক দরজায় এসে জিগ্যেস করে।

সুদর্শন উঠে বসল, হাতে মশারী ধরা। স্বপ্নের কথা ভেবে লজ্জা পেল। কিছু বলল না। দ্রুত মশারী সরিয়ে মাটিতে দাঁড়াল।

দীপকের, মা ছোট্টখাট্ট রোগা মানুষ। অথচ কেমন করিৎকর্মা। খাঁচায় হাঁসকে গুগলি, মুরগিকে ধান ছড়িয়ে দিয়েছেন। গরুর বিচুলিতে খৈল মাখছেন। তার আগে রান্নাঘর, বারান্দা ঝারা লেপা হয়ে গেছে। এত কাজ একজন মানুষ করতে পারে! সুদর্শন বিস্ময়ে

তাকিয়ে থাকল। এমন রোগাপটকা মানুষকে হঠাৎ দেখলে যে কেউ অকেজো বলে মনে করবে। অথচ কি কাজের মানুষ যে উনি!

দীপক সুদর্শনের কৌতুহল নিরসনের জন্য বলল—মাকে গত বিশ বছর এভাবেই দেখে আসছি। ভোর চারটায় উঠে রাজ্যের কাজ করেন। কোন অসুখ বিসুখ হতে দেখি না। বাবাও তাই। ঐ দেখুন মাছ ধরছেন। সাত সকালে জমির ফসল দেখে এসেছেন।

সুদর্শন একজন প্রৌঢ় মানুষকে জলে নেমে জাল ফেলতে দেখে আরও বিস্মিত হল এদের এত জীবনী শক্তি! পেছনে তাকিয়ে দেখে মাঠ শুধু মাঠ। ধানের শিস বাতাসে দুলছে। সবুজ ও সোনালী রং এর একটা মিশ্রণ দূরে বহু দূরে চলে গেছে। শত শত একর জমিতে শুধু ধান আর ধান।

বিকালে চার আসরে পাড়া পড়শীরা কয়েকজন, দীপকের পাঁচ জন বন্ধু এল। দীপকের দিদি গান শোনাল খালি গলায় ছোট ভাই ও ভাগ্নে আবৃত্তি করল। অনুকূলবাবু বসতেই আসর থেমে গেল। একটা বিড়ি ধরিয়ে তিনি শুরু করলেন—হেমনগর থেকে দুলদুলি পর্যন্ত পনেরো মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি পাকা হচ্ছে। দ্বীপের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সমস্ত গ্রামে যাতায়াত সহজ হয়ে যাবে। পনেরোটি প্রাথমিক স্কুল, একটি মাধ্যমিক ও দু'টি জুনিয়র হাইস্কুল এ দ্বীপের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার চাহিদা মেটাচ্ছে। গোবিন্দকাটির স্কুল পাকা হচ্ছে। যোগেন সেনের বাড়ীর এক আদেশে হাসপাতাল হয়েছে। ঐ বাড়ীর এখন মালিক সুকুমার মণ্ডল। পুকুর ঘাট, পাকা বাড়ী, গোবর গ্যাস সবই আছে। ধনী মানুষ।

—যোগেশ সেন কে? হাসপাতালে ডাক্তার আছে?

-এখানকার জমিদার ছিলেন বলতে পারেন। তাঁর ছেলে বীরেশ সেন এক সময় এখানে কংগ্রেসের এম. এল. এ. ছিলেন। সব বেচে দিয়ে কলকাতা চলে গেছেন। একবার ভাগ চাষীদের মাঠের ধান লুঠ হয়ে যায়। তাসের গাজী হাইকোর্টে মামলা করে জিতে যান। অন্যরা কোর্টের নির্দেশে। ভাগ চাষীরা জোতদারদের

বন্ধ করে দিয়েছিল। সে অনেক কথা।

—এদিকে মুসলমান আছে? চোখে পড়েনি একজনকেও।

—খুব কম। অনেকেই বিনিময় করে চলে গেছেন। রামপুরে নকশালরা বহু সি. পি. এম কর্মী খুন করেছে। যোগেশ গঞ্জে ডাকাতি হয়েছে। পুলিশ, কংগ্রেসী শাসকরা কোন তদন্ত পর্যন্ত করেননি। রাতে পথে লোক বের হত না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অবস্থা। নাগরিকরা রাত বিরেতে যেখানে খুশি যাচ্ছে। সি. পি. এম. ক্ষমতায় এসেও প্রতিশোধ নেয়নি। আপনি কংগ্রেসীদেরই জিগ্যেস করে দেখুন।

জেলা পরিষদের সদস্য গোপাল গায়েন, যোগেশগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক। তিনিও কিছু ফিরিস্তি দিলেন। বললেন—এখানকার শিক্ষকরা ভাল আছেন। ছাত্র পড়াচ্ছেন আর জমি দেখছেন বর্ষা-কালে নামমাত্র ব্যয়ে ফসল উঠছে। বিদ্যুৎ এসে গেলে তো কথাই নেই দ্বিগুণ ফসল ঘরে তুলবে। যত জ্বালা ক্ষেত মজুরদের। ছ'মাস বসে থাকতে হয়। কোন কাজ থাকে না। সে সময় নাম মাত্র ব্যয়ে ওদের জোতদাররা খাটায়। ওরাও ইউনীয়ান করেছে। আর বেগার খাটবে না।

অনুকূলবাবু পাড়ায় কোন এক সালিশীর ব্যাপারে উঠলেন। সুদর্শন বসে বসে দেখল দীপকের মা বিদ্যুত বেগে হাঁস তুলছেন, মুরগি ঢুকোচ্ছেন, গরুর নাদায় বিচুলি দিচ্ছেন। কুকুরের জন্য বাসী ভাত ঢেলে দিচ্ছেন। তারপর হ্যারিকেন, বাতির পেটে তেল পুরছেন। রোগা হলেও কর্মঠ। বসে থাকেন না।

দীপকের দিদি বিকালের টিফিনের জন্য আটা মাখা শুরু করল। ওর ছেলেও বর বেড় হল পাড়ায় ঘুরতে। দীপক পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে মশগুল। সুদর্শন দু'চারজনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায়। খোশ মেজাজে আছে ও।

আমতলির খাল

· পরদিন সাত গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে। দীপকদের বাড়ী থেকে পঞ্চানন বাবুর বাড়ী পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ডি. এমকে দেখেনি কেউ। তার উপর মহিলা ডি.এম। ওদের ধারনা ডেম (ডি. এম.) রামু ঘোষের ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়।

পঞ্চায়েত সদস্যরা এসেছেন। অভিযোগকারী কংগ্রেসী নেতাদের দীপক দেখিয়ে দেয় এক এক করে। স্বপন মণ্ডল, মুরারী মণ্ডল, পঞ্চানন বিশ্বাস, অশ্বিনী গায়েন ও পার্টির অন্যান্য নেতারাও আছেন।

দীপক ফটো তোলায় মন ছিল। ডি. এমের সঙ্গে ও.সি. এস. ডি. ও, বনবিভাগের অফিসার, পঞ্চায়েত ও পার্টির নেতারা একে একে খালে নামালেন। জল কাদায় কি আসে যায়। রাণুদেবী খালের প্রস্ত, গভীরতা ইত্যাদির মাপ কি হিসাব করলেন।

সাংবাদিক এখানে কেন? এত কষ্ট করে এখানে সাংবাদিকরা আছেন? হোটেল নেই, গাড়ী নেই। ডি এম রসিকতা করলেন।

—তা ঠিক। আপনি এলেন বলে আসা। আপনি বলুন ইচ্ছে করলেই কি আসা যায়? যাতায়াত ব্যবস্থা আজও খারাপ। বেসরকারী লঞ্চ। মালিকদের খেয়ালে চলে। সরকারী কোন উদ্যোগ নেই কেন? মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন।

—আপনি লিখুন; তারপর আমি বলব।

—আচ্ছা লিখব। আপনার ক্ষমতা কম?

সবদেখে শুনে ডি. এম বললেন, আপনারা বাঙালী তো! কোন কাজ ঠিকমত করবেন না। অন্য কেউ করলে শুধু খুঁত ধরবেন, আর অভিযোগ করবেন। ঠিক আপনাদের। খাল বাকীটুকুও কাটা হবে। আরও দু'লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলাম। আপনারা কাজ চালিয়ে যাবেন। টাকার অসুবিধা হবে না।

ডি. এম. উঠে বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ালেন। জনতাও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। বিরোধীরা আরও কিছু অভিযোগ জানালে নাকচ করে দেন।

দীপক ক্যামেরা গুটিয়ে নেয়। কিছুদূর গিয়ে দু'জন ঘরে ফিরে আসে আজ। খেতে দেরী হবে। স্বপনবাবু বারবার অনুরোধ করেছেন। সুদর্শন ও দীপক আজ তাঁর অতিথি।

হাতে সময় পেয়ে রিপোর্ট লিখে ফেলল।

দীপকের ভগ্নিপতি কলকাতা ডাক্তার দেখাতে যাবে। নিউজ, নেগেটিভ ফিল্ম, হাত চিঠি অফিসের নির্দেশ দিয়ে সে সস্তি পেল। বিধাতার কি ইচ্ছে। আর " দু'দিন থাকতে পারবে সে। দীপকও ভগ্নিপতিকে বুঝিয়ে বলে। ওরা স্নান সেরে নেয়। স্বপনবাবুর বাড়ীতে খেয়ে মুরারীবাবুর বাড়ী যাবে। মুরারীবাবু এখন কোন রাজনৈতিক দলে নেই। স্বপনবাবুর সঙ্গে বিরোধ চলছে। তাই পার্টি'র কাজে ইস্তফা দিয়েছেন।

সুদর্শন আর দীপক দীর্ঘপথ হাঁটল। পথে পরিচিতদের সঙ্গে সুদর্শনের পরিচয় করিয়ে দিল দীপক। ওরা কৌতুহলী চোখে দেখে।

সুদর্শন উৎসাহ বোধ করল। ডাকাবুকো মানুষ স্বপন মণ্ডল। পোড় খাওয়া মানুষ। কথাবার্তায় দৃঢ়তা আছে। উনি ডি এম এর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ফিরে এসে সুদর্শনের পথের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন। আশেপাশের বাড়ীর লোক জন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছেন। সাংবাদিক দেখার খুব আগ্রহ।

হাত পা ধুয়ে সুদর্শনরা খেতে বসল। এলাহী ব্যাপার। স্বপনবাবুর মেয়েরা পরিবেশন করছেন, স্ত্রী রান্নাঘরে। জল, নুন, দৈ, মিষ্টি, তরিতরকারীর বাটি পর পর সাজানো। খেতে সে পারে না। পাঁচ ছ' রকমের তরকারী। সে বেছে বেছে খেল। পাতে নুন, খেতে বসে জলও খায় না সে। 'ভরা পেটে ফল, খালি পেটে জল' নীতিটা সে মানে। চিনির জিনিষও পছন্দ নয়। তবু অনুরোধে

দু'টো মিষ্টি খেল। সে খেতে খেতেই বলল, মানুষ খেতে জানে না। জল খাওয়ারও নিয়ম আছে। ভরা পেটে জল বা ভাত খেতে বসে জল খেলে পেটের গণ্ডগোল হবে। কাঁচা নুন খেলে বেশী প্রেসারের হেরফের হয়। মিষ্টি বেশী খেলে, বিশেষত বেশী চিনি খেলে রক্ত নষ্ট হয়ে যায়, চর্ম রোগ ও চামড়া খসখসে হবে চোখের দৃষ্টি কমে যায়।

শিবানন্দ সরস্বতীর খাদ্য নীতির বহর কথা বলল। ওরা খাওয়া-দাওয়ার পর পুকুরের ঘাটে বসল। বিরাট পুকুর। কলকাতার মানুষরা বলবেন দীঘি। কথায় কথায় একটু উদাসীন হয়ে পড়েছিল সুদর্শন। তার সম্বিত ফিরে এল। গলার স্বর প্রায় বন্ধ, হৃদপিণ্ড ধুপ্ ধাপ করে উঠল ভয়ে। একটা কালো কুকুর তার দু'হাঁটুর উপর পা তুলে কুঁই কুঁই করে উঠল।

সুদর্শনের রক্ত জমে যাওয়ার মত। মুখে কথা নেই। স্বপনবাবু মুহূর্তে বুঝে নিলেন ওর অবস্থা। মুখ ফ্যাকাসে, চোখে ভয়ের ভাব। কুকুরটিকে নামিয়ে দিলেন। মেয়েকে ডেকে বললেন, এই পিয়ালী কুকুরের শিকল পরিয়ে দে, নতুন দেখছে তো!

দুর্লভ প্রজাতির পুনঃ শিকারী কুকুর। খুব বিশ্বস্ত। তিন মাসের বাচ্চার দামই হাজার টাকা। বহু ক্রেতা এখনই ঘুরছেন বাচ্চার জন্য।

কিছু সময় লাগল তার স্বাভাবিক হতে। বিকালের বাতাস বেশ তৃপ্তিকর। সে স্বপনবাবুর মেয়েদের গল্প করার সুযোগ খুঁজল, বিশেষ হল না। ওরা ঘরের বারান্দা, জানালা থেকে তাকে দেখতে লাগল। স্বপনবাবু বলতে লাগলেন—আমাদের কথা কিছু লিখুন। চাষীদের ফসল নষ্ট করে যাচ্ছে। জল নেই। জনমজুররা ঘরে বসা। জেলেদের মাছ ধরা বন্ধ। গরীব মানুষরা পুলিশদের পয়সা দিয়ে কাঠ, মধু, মোম সংগ্রহ করতে পারছে না। মাঠের পর মাঠ ফেটে যাচ্ছে। মাটির অবস্থা চাতক পাখির মত ধানগাছে পোকা ধরেছে। ঐ দেখুন মাঠ কেমন বিবর্ণ।

—আপনার কি? আপনি তো মহাজন মানুষ, কম্যুনিষ্টদের কথায় বুর্জোয়া। রসিকতা করল সুদর্শন।

এই বলেই তো আমাদের শত্রু করে রেখেছে। অন্যদের কি দোষ দেব? আমার দাদা, ভাই অপপ্রচার করছেন। বর্ষায় জল হয়নি, দু'তিন হাত ধান গাছ সবুজ বিপ্লবের কেতন ওড়াতে না ওড়াতেই ধূসর হয়ে উঠেছে। জমিতে ফসল না হলে মহাজনরা টিকবে কি ভাবে? আপনি কলকাতা গিয়ে কাগজে ভাল করে লিখুন। মুখ্যমন্ত্রী দেখুক।

কথায় কথায় বিকেল শেষ। রোদ দিক চক্রবাল রেখার নিচে মুখ ডুবিয়েছে। এবার ওঠার পালা। দীপকই বলল, উঠি কাকু। রাতে মুরারী কাকুর বাড়ীতে থাকব। খুব সকালে বনে যাব। সুদর্শনদা বন দেখতে এসেছেন।

স্বপনবাবু রাস্তা পর্যন্ত এসে বললেন, আবার আসবেন, সুদর্শনবাবু খুব ভাল লাগল। আপনি সত্যি ভাল মানুষদের মধ্যে একজন।

সুদর্শনকে সকলেই ভালবাসে। সেও নতুন মানুষদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। যেন কত পরিচিত। চেনা জানা। আপন জন সব।

বিকেলে হাইস্কুল, হাসপাতাল, বাজার ঘুরে মুরারীবাবুর বাড়ী ঢুকল। প্রাচীর ঘেরা দ্বিতল বাড়ী। পুকুর, গোশালা, ধানের জমি। এদিকের মাঠ ভর্তি ধানগাছ সবুজ বিপ্লবের কেতন ওড়াচ্ছে। ধান লুঠের ভয়ে জমি ঘিরে নিয়েছেন। একবার ডাকাতিও হয়ে গেছে তার বাড়ীতে।

খবর পেয়ে মুরারীবাবুর জমি থেকে বাড়ী এসে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন ওদের। চেয়ার টেনে ওদের বসতে দিয়ে হাঁক দিয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন।

—দেখ, কে এসেছেন। সাংবাদিক তোমার ঘরের অতিথি। দীপক কতদিন পর এল। জল খাবারের ব্যবস্থা কর।

—বৌদি এখন থাক। দুপুরে গলা সমান খেয়েছি। অস্বস্তি লাগছে। রাতে সামান্য কিছু খাব। আমরা খেতে আসিনি। কথা বলতে এসেছি। দেখতে এসেছি। দীপক বলল।

ছিপছিপে বৌটি। গ্রাম্য সারল্য। হাসিখুশি মুখ। বেশ আলাপী। ছেলেটিও মার মত। একমাত্র ছেলে। বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

—সুদীপ কাকাদের প্রণাম কর। তুমি কথা বল। কাকুরা অনেক গল্প জানেন। এই আসছি বলে স্বামী-স্ত্রী নিচের ঘরে নেমে গেলেন। কিছু সময় পর বড় দু'গ্লাস দুধ নিয়ে মুরারীবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। মুরারীবাবুর হাতে একবাটি তেলমুড়ি। সুদর্শন শিউরে উঠল। স্বপনবাবুর বাড়ীর খাবার এখনও গলা সমান হয়ে আছে। নতুন জায়গা। অনিয়মে ও অনিদ্রায় শরীর কষে আছে। বেশী খাওয়া মানেই অসুস্থ হওয়া। সাবধান থাকা ভাল।

কে শোনে। বারবার অনুরোধ। দীপক চোখ টিপল। মুরারীবাবু একতলার ঘরে যাওয়া মাত্র দীপক একটা ঠোঙ্গায় ভরে আড়াল করে রাখে। বেশ কিছু সময় পর স্বামী স্ত্রী এসে খালি পাত্রগুলি তুলে নিয়ে গেল।

দীপকরা ঠিক করল ঐ খাবারগুলি রাতে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলবে। মাছের পেটে যাবে।

মুরারীবাবু বসলেন। এখন আর কাজের তাড়া নেই। প্রথমেই বললেন—স্বপনের বাড়ী কি করে উঠলেন? ওর বাড়ীর প্রতিটি অন্নে পাপ বমি করে ফেলে দেবেন।

—আমি নতুন এসেছি। শত্রুমিত্র জানি না। দীপক আমার গাইড।

সুদর্শন সংক্ষেপে বলল। গোবিন্দকাটির হাজারী মণ্ডল, পঞ্চানন মণ্ডল, দেবেন মণ্ডল, অশ্বিনী গায়েন, হেমনগরের তারাপদ মণ্ডল, পারঘুমটির বসন্ত কয়াল, ঝিঙ্গাখালির আশুতোষ মণ্ডল, হেমনগরের কালীপদ মণ্ডল সমাজের মাথাওয়ালা মানুষ। অবস্থাপন্ন মানুষ। এদের কাজ কর্মে বহু মানুষ সি. পি. এম-এ যোগ দিয়েছে সাধারণ মানুষকে এরা মানুষ বলে গন্য করেন না। ক্ষমতা পেলে মানুষের সহজ সুন্দর ভাব নষ্ট হয়ে যায়। চাষী, মজুররা কংগ্রেসী সমর্থক ছিল।

আজ উল্টো, সব সি. পি. এম সমর্থক। খরায়, বন্যায় অভাবে এরা মানুষের পাশে দাঁড়ায় না। বছরের ছয় মাস কাজ না থাকলে এদের বিনাস্বার্থে সাহায্য দেয় না। ওদের বৌদের ঝি হিসাবে খাটায়। মুরারীবাবুর নালিশ।

সুদর্শনের মতে পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষমতাবান মানুষদের কর্মপদ্ধতি একই। আর দীন দরিদ্রের ওপর শোষণ ও অত্যাচারও চলে। তখন রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি মনে পড়ে। কবিতাটি অত্যাচারিত মানুষদের কবচ করে রাখা উচিত।

—সত্যি তাই কালীতলা, হাটখোলায় নিম্নবিত্ত ও সর্দার শ্রেণীর লোকদের বসবাস বেশী। প্রায় ৯০% ভাগ। আমরা বর্ণহিন্দুদের দোষ দেই না. আমাদের ধনী নমশূদ্র সম্প্রদায়, গরীব নমশূদ্র বা সর্দ্দারদের জন্য কি করছেন? শুধু সরকারের গালমন্দ করছেন: ধনী, মধ্যবিত্ত—নিম্নবিত্ত—হতদরিদ্রদের চরিত্র পৃথিবীর সর্বত্র একই। সবারই সমাজ আলাদা।।

মুরারীবাবু হেমনগর থেকে তুলতুলি পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ থাকার জন্য কংগ্রেসীদের দোষারোপ করলেন। তিনি গান্ধী-ভক্ত মানুষ। কংগ্রেসের দলাদলি ও নেতৃত্বের প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই: তাই আজ জনগনের প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারিয়েছে কংগ্রেস: মুরারীবাবুর স্পষ্ট কথা। আমার কি মনে হয় জানেন?

—কি বলুন।

—ভারতবর্ষের মানুষ কমুনিষ্ট হতে চায় না। কমুনিজম্ বোঝে না। দেখছেন না জ্যোতিবাবুরা মিশ্রনীতিতে রাজত্ব চালাচ্ছেন। গত ৪০ বছর কংগ্রেস যদি ঠিক চলত, মুখের কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকত. ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। আজও দেখুন ভারবর্ষের কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলি কেমন নাবালকের মত চলছে। কত আদর্শের বুলি, মাঠে মারা যাচ্ছে।

সে যেন ভূতের মুখে রামনাম শুনছে। হ্যাঁ, কংগ্রেসীরাই পারে আত্ম সমালোচনা করতে। এখানেই ওদের জয়।

সুদর্শন শুধু বলল, আমিও বুঝি না, যে কংগ্রেসীরা আর্য সভ্যতার জন্য ভারতীয় আদর্শের জন্য গর্ব করেন তারাই আবার অশ্লীল সিনেমার ছাড়পত্র দেন কিভাবে ৯৯% হিন্দী ছবি, দক্ষিণ ভারতের ছবিগুলি কি করে ছাড়পত্র পায়? আজ দেশ জুড়ে যে অবৈধ জীবন, ভ্রূণ হত্যা, বধূ হত্যা, খুন, রাহাজানি দেখা যাচ্ছে তা সিনেমারই অবদান। কি নির্লজ্জভাবে পোস্টার দেওয়া হয়। ফিল্ম ফ্যাস্টিভালে যৌন ছবির মেলা বসে। যুববর্ষ, ঘোষণা করেও রাজীবগান্ধী যুবকদের চরিত্র সম্পর্কে নীরব রইলেন।

মুরারীবাবু বললেন, আমি কম্যুনিজম পছন্দ করি না। এদেশে চলবে না। তবু বামফ্রন্টের "অপসংস্কৃতি" আন্দোলনের আমি সমর্থক। আজ সুন্দরবনের ছেলেরাও পুজোর সময় বা কোন উৎসবে অশ্লীল-ভাবে নাচে, গায়। এদের মধ্যেও ঢুকে গেছে। আমার মনে হয় সিনেমা না থাকলে আমাদের ছেলেরা এত অসভ্য ও ইতর হত না। সাধারণ মানুষরা সত্যজিৎ রায়কে বোঝেন না। তাঁর প্রভাব—নেই এদের মধ্যে।

মুরারীবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন—আমি কমুনিজম পছন্দ করি না। তবে জ্যোতিবাবু যা করছেন সমর্থন আছে। কংগ্রেসে শুধু দলাদলি। এখানকার জনমজুর, সাধারণ মানুষ সকলেই কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। নেতা ও কর্মীদের অপকর্মে সবাই ঘুরে গেছে। সাধারণ মানুষকে এরা মানুষ বলেই গণ্য করত না। অপ-সংস্কৃতি এখানেও ঢুকেছে।

অনেকক্ষণ রাজনীতি চর্চায় রাত হল। আসরে বসে কথা শুনছিল কয়েকজন জনমজুর ও তারাও এবিষয়ে একমত।

আজ রাতে ভূরিভোজ। এত কষ্ট করে রান্না করেছি খাবেন না কেন? বলেই বৌটি পাতে ঢেলে খাওয়াল। খেয়েদেয়ে সামান্য গল্প করে ওরা শুয়ে পড়ে। খুব সকালে বের হবে দীপকরা।

সুদর্শন যথারীতি 'মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া' ও 'ব্রোমো ভ্যালেরিণ' টেবলেট খেয়ে শুয়েছিল। তবু ঘুম এল না। বায়ু চড়া হয়ে

অনিদ্রার সৃষ্টি হয়েছে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবল পৃথিবীর যেখানেই অনিয়ন্ত্রিত রাজনীতি সেখানেই ক্ষমতাবানরা শোষণ করে, অত্যাচারী হয়। ওদের কর্ম পদ্ধতি একই। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি ঘুরে ফিরে মনে আসে। তার মতে কবিগুরুর শ্রেষ্ঠ কবিতা এটি। প্রোলেতারিয়েতদের রক্ষা কবচ।

শুয়ে শুয়ে সুদর্শন ভাবে, এত করে ও অজিতবাবু স্ত্রীর মন পাচ্ছেন না। আর মুরারীবাবুর একঘেয়ে জীবন। স্ত্রী কত সুখী, সেবা পরায়ণ। কেমন গতানুগতিক জীবন। বছরে একবার বাপের বাড়ী যায় কিনা সন্দেহ। পরক্ষণেই অনিমার মিষ্টিমুখ, সুকন্যার অভিমানী ও অহংকারী মুখ ভেসে ওঠে। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

দীপকরা খুব সকালে উঠে তৈরী হয়ে নিল। সুদীপ ও দীপক দুধ, কলা, চিড়া পেট ভরে খেয়ে নিল। সুদর্শন এত সকালে কিছু খেতে পারে না। লেবু জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ইট বিছানো রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে। সুদীপ ওর বাপের হাত ধরে চলছে। দীপক আর সুদর্শন পাশাপাশি। একটু অন্য-মনস্ক হলেই হোঁচট খেতে হবে। তবু সৌন্দর্য্য না দেখে থাকা যায়। দু'পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে ধান আর ধান গাছের আধেক জলের তলায়। বাকী অর্ধেকের গর্ভে থোর, গর্বে মাথা উঁচু করে আছে। বাতাস মাঝে মাঝে ঢেউ খেলে যায়। এত বিস্তৃত ধানক্ষেত ইতি-পূর্বে সুদর্শন দেখেনি। অপূর্ব সে দৃশ্য।

এক মাইলের মত হেঁটে ফাঁকা উঁচু একটা মাঠ দেখল। দু'মাইলের মাথায় প্রাইমারী স্কুল, দোকান পেরিয়ে ওরা যখন রায় মঙ্গল নদীর বাঁধের ওপর, তখন সূর্য উঠে গেছে। আলোয় ঝলমল দৃশ্যপট। লোকজন পথে বের হয়েছে। নদীর তীরে ডিঙ্গী। ডিঙ্গী নৌকায় মাছ তুলছে। নদীর অপর তীর দেখা যায় না, শুধু জল আর জল। এ অঞ্চলের বড় নদী রায়মঙ্গল।

একটা ভটভটি (মোটর যুক্ত নৌকা) ঠিক করে ওরা চেপে বসল।

প্রচণ্ড শব্দে কান ধরে যায়। সুদর্শন এমন দৃশ্য চোখে ধরে রাখে। দীপক কয়েকটা ছবি তোলে। কিছুদূর গিয়ে ঝিরিয়া নদীর পাশ দিয়ে ভট্‌ভটি চলতে থাকে। ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা চলার পর দূরে সবুজ রেখা দেখতে পেল। ঐ বনভূমি। তারপরই কুমীরমারী। লঞ্চ যায় ঐ পর্য্যন্ত।

ওরা হেমনগরের শেষ প্রান্তে এসে নামল। ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিক। কাদায় নেমে বাঁধের ওপরে উঠল। বাঁধের পাশেই তারাপদ মণ্ডলের বাড়ী। কোমড় সমান উঁচু বারান্দা। মাটির ঘর হলেও বেশ মাজা ঘষা ও পরিচ্ছন্ন। মুরারীবাবুর ডাক শুনে আরও কয়েক-জন কাছে এল। সাংবাদিক দেখতে ছেলে মেয়ে বৌরা বাদ গেল না। সুদর্শন লজ্জায় পড়ল। কলকাতায় ক'জন পোঁছে তাকে? আর এখানে? সাংবাদিকরা দুর্লভ বস্তু। তাই অনেকে দেখতে এসেছে

এক প্রস্ত চা মুড়ির ব্যবস্থা হল। সুদর্শনের সত্যি এবার খিদে পেয়েছে। খাওয়ার পর তারাপদ এখানকার কিছু সমস্যার কথা বললেন সুদর্শন লিখে নেয়।

শিবমিস্ত্রী ওদের সঙ্গী হলেন। বোম্বের শিল্পী নাসিরুদ্দীনের মত বলিষ্ট গড়ন। মুখে বসন্তের অনেকগুলি দাগ। ভারী গলা। রাগী মানুষ।

ভট্‌ভটিতে উঠে বনে বাঘ মারার, বাংলাদেশী ডাকাত মারার শেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বন্দুকের লাইসেন্স চলে যাওয়ার গল্প করল। সুদর্শন মন দিয়ে শোনে। একটা গল্পের উপাদান জোগার হয়ে যায়।

বেশ গরম। দীপক সার্ট খুলে বসল। সুদর্শন লজ্জায় খুলল না। গভীর নদী। ভটভটি খুব স্পীড নিয়ে এগিয়ে চলে। সুদর্শনের কাছে এ্যাডভেঞ্চারের মত। ভয়ে ভয়ে থাকে। জল পড়লে সাঁতার জানলেও রক্ষে নেই। হাঙর ও কুমীর ওঁৎ পেতে আছে।

একঘন্টা গল্পে গল্পে কেটে যায়। আসর বেশ জমে ওঠে। ভটভটি কালীতলার চিংড়ী খালি হাটে দাঁড়ায়। হত দরিদ্র গ্রাম।

অধিকাংশ মাটির ঘর। বহু ঘরেই বেড়া নেই। জন, মজুর, চাষী অধ্যুসিত এলাকা।

হাটের মধ্যে একটা দোকানে সুদর্শনকে বসালো। অপরিচ্ছন্ন টিনের তেলচিটে গ্লাসে জল খেতে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠল ওর।

একদল চাষী পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বসে আছে। নদীর জল ঢুকে সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে বলে সরকার কিছু ক্ষতিপূরণ দেবেন। আর জন মজুরদের 'ফুড ফর ওয়ার্ক' কাজে কিছু সাহায্য। ওদের পরনে গামছা। মুরারীবাবু বললেন, এক বস্ত্রেই ওদের দিন কাটে। সরকার না দেখলে এবার ওরা মরে যেত। ডোল পেলেও গুগ্‌লি, শালুক ও কচু খেয়ে দিন কাটছে ওদের।

ওদের অনুরোধে ধানের ক্ষেত দেখতে যেতে হল। হলুদ ও বিবর্ণ ধানগাছ, কোথাও কোথাও মাথার টাঁকের মত ফাঁকা। মাঠের পর মাঠ, ধানগাছ নষ্ট হয়ে গেছে। দুঃখের কথা শুনে মন খারাপ হল সুদর্শনের।

সুদর্শন কথা দিল কলকাতা ফিরে বিশেষভাবে কাগজে লিখে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পঞ্চায়েত অফিসে এসে পঞ্চায়েত সদস্য রতিকান্ত মণ্ডলকে সরকারী সাহায্যের কথা জিগ্যেস করল, ও বলল—যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি বলে এবং নদীর ভয়াবহতার জন্য দ্রুত কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। সরকারকে সব অবস্থা জানানো হয়েছে।

রতিকান্তবাবু বললেন—আমরা সরকারকে জানিয়েছি। এখনও কোন সাহায্য আসে নি। এলে নিশ্চয়ই দেব। কলকাতার সঙ্গে এখানে যোগাযোগ দুঃসাধ্য ব্যাপার। শুধু জনমজুর নয়, মৎস্যজীবী, কাঠুরে সবাই বেকার। অধিকাংশ গরীব ও অশিক্ষিত। কিছু বোঝান যায় না। বর্ষায় প্রতিবার এ দিকটায় নোনা জল ঢুকে ফসল নষ্ট করে। এরা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে চলে। খরা যেমন আতঙ্কের তেমনি নদীর জোয়ারও সমান আতঙ্কের। ৯৯% মানুষ সাহায্য-প্রার্থী। কি করতে পারি বলুন। সরকারকে জানিয়েছি। অখাদ্য

কুখাদ্য খেয়ে বহু মানুষ অসুস্থ। মহামারী লেগে যাবে। তাছাড়া থানা, ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল ধারে কাছে কিছু নেই। চুরি, ডাকাতিও বাড়ছে। আমরাও চিন্তিত।

সকল মানুষ, সোজা কথা বলল দীপক সমর্থন সূচক ইঙ্গিত দিল। সুদর্শন বিশ্বাস না করে পারল না।

নৌকায় সকলে উঠতে যাবে এমন সময় একটা সোরগোল উঠল। সুদর্শনরা উৎকর্ণ হয়ে থাকল। দূরে বহু মানুষের হল্লা।

কিছু সময় পর মানুষগুলি কালীতলা বাজারের দিকে এগিয়ে এল। বন্দুকধারী দু'জন, লাঠি হাতে জন ছয়েক পুলিশ দু'টি ছেলেকে হাত বেঁধে আনছে, সঙ্গে একটি মেয়ে। লজ্জায় মাথা নত। ছেলে বুড়ো শতাধিক লোক পেছন পেছন আসছে।

—কি খবর আবদুল মিঞা? মুরারীবাবু কৌতূহলী হলেন।

—কি আর খবর। মুখে দুধের গন্ধ, প্রেমের ঠেলায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

সুদর্শন পুলিশকে পরিচয় দিল। ব্যাপারটা জানতে চাইল। থানার মেজবাবু বললেন, শ্রীমান চাঁদপাড়া থেকে মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। নদী পেরোতে পারলেই ঐপারে বাংলাদেশে চলে যেত। আমরা আজ ক'দিন খুঁজে খুঁজে এখানে এসে ধরেছি। বি. এস. এফ জল পথে, আমরা স্থল পথে ওদের ঘিরে ফেলি। একটা বাড়ীতে লুকিয়েছিল। এই শ্রীমান ওর বন্ধু, আশ্রয়দাতা। পুলিশ দ্বিতীয় ছেলেটিকে দেখালেন।

মেয়েটির বাবা কোথায় সুদর্শন ব্যাপারটা বিস্তৃতভাবে শুনতে চায়। পুলিশকে প্রশ্ন করে সে।

—এই তো সেনবাবু। চাঁদপাড়ার বড় ব্যবসায়ী। উনি আবার ইস্‌কনের একজন বড় কর্মী।

সেনবাবু সুদর্শন পুরুষ। সাথে আর এক ভদ্রলোক আশিষ চৌধুরী। বীরপুরুষের মত চেহারা। এই স্থানে অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর দেহসৌন্দর্য যেন আরও ফুটে উঠেছে।

নানা রসিকতা, বাক্যবান চারদিক থেকে প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হল এই ফাঁকে সুদর্শন সেনবাবুকে ঘটনাটির কি পূর্বাপর জানতে চাইল।

প্রশ্ন শুনে পাশের ভদ্রলোক বললেন—আমার নাম আশীষ চৌধুরী। সেনবাবুর পার্টনার। আমরা আজ ক'দিন বনগাঁ, বারাসাত ও বসিরহাট চষে বেড়াচ্ছি। থানায় থানায় খবর পাঠিয়েছি। গোসাবা থানার বড়বাবু প্রথম গুরুত্ব দেননি। পরে থানার বড়বাবুকে হাজার টাকা বকশিস দেব বলায় রাজী হন। চাঁদপাড়ায় দুর্গাপূজার সময় সেনবাবুর মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে প্রতিমা দেখতে বেরোয়। যশোর রোডের পাশেই দাঁড়িয়ে প্রতিমা দেখছিল। খুব ভিড় ছিল। হঠাৎই বিদ্যুত বন্ধ হয়ে যায়। তারপরই ঠেলাঠেলি, গুতোগুতি। যে দিকে যে পারল ছুটল। মেয়ে আর ফিরছে না। চারদিকে খুঁজেও পাওয়া গেল না। হাবড়া, বনগাঁয় ও গাইঘাটা থানায় ফোন করে ঘটনা জানিয়ে দিলাম। সীমান্তে পুলিশের কাছে খবর গেল। আমাদের কথায় রাস্তার মোরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোন গাড়ী যায় কিনা লক্ষ্য রেখে ছিল পুলিশ। এভাবে পাঁচ দিন চলে যায়। শেষে মেয়ের সহপাঠীকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে শুনলাম। ওদের পিছু পিছু চার পাঁচটি ছেলেও ঘুরছিল। তারমধ্যে সেনবাবুর মেয়ের প্রেমিক আর ওর বন্ধু ছিল।

আমরা ঐ ছেলের বাড়িতে পুলিশ নিয়ে হাজির হয়ে শুনলাম, ছেলে ক'দিন বাড়ী ছাড়া। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

ঐ কথা শুনে পুলিশ খুব শক্ত ভূমিকা নিল। ছেলে কোথায় কোথায়, কাদের সঙ্গে খেলে, পূজোর সময় কে তার বাড়ী বেড়াতে এসেছে? এসব প্রশ্ন শুনে ছেলের বাবা মুখ খুললেন—সঠিক ঠিকানা দিতে পারেননি। শুধু বলেছিলো যোগেশগঞ্জের ঐদিকে থাকে ওর এক বন্ধু। পূজায় এসেছিল বেড়াতে।

ছেলে খুব সেয়ানা। নিজের বাড়ীতে না উঠে বাংলাদেশের কাছাকাছি ওর এক মাসীর বাড়ীতে উঠেছে। খোঁজার মত খুঁজে

ধরেছি। আর কয়েক ঘণ্টা দেরী হলেই পালিয়ে যেত।

সুদর্শনবাবু বেলা হয়ে যাচ্ছে। চলুন নৌকায় উঠি। মুরারী-বাবু, বসন্তবাবু দু'জনেই বললেন। সুদর্শন আর দেরী করল না। নৌকার দিকে পা বাড়াল সকলে।

এদিকে মুরারীবাবুরা চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি কিনে নিয়েছেন। হাঁড়ি, হাতাও কেনা হয়েছে। দশ বারোজন নতুন সঙ্গী উঠল নৌকায়। বনে রান্নাবান্না হবে।

ভ্রমণে শিহরণ জাগলেও বেলা দশটা। খিদেয় পেটে ছুঁচোর ডন মারছে। বলতেও পারছে না, কিছু কিনে খেতেও পারছে না।

সতীন্দ্র মণ্ডল, আশুতোষ মণ্ডল, রাসমোহন দত্ত সুদর্শনকে নানা প্রশ্ন করে। নিজেদের সমস্যার কথাও বলল। রাসমোহন দত্ত এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজে করে। সাহিত্য জগতের খবর রাখে। সুদর্শনের লেখার খুব ভক্ত বলল, আপনার লেখার মধ্যে নানা তথ্য, জ্ঞানের কথা থাকে। সাধারণ মানুষের উপযোগী ভাষা। 'জলকর' সম্পর্কে আমার মতামত লিখে পাঠাবো। চিঠিপত্রে ছাপিয়ে দেবেন।

সুদর্শন এদের সঙ্গ পেয়ে খুশী হয়। চার পাঁচ মাইল দূর থেকে এরা হেঁটে এসেছে। সুদর্শনকে পেয়ে ওরা বাড়ী না গিয়ে সঙ্গ নিল। সবাই বনে যাবে।

ঝিঙ্গা খালির ওপর দিয়ে নৌকা বয়ে যায়। বেলা বাড়ার সংগে সংগে নৌকার গতিও বাড়ে।

বনে পিকনিক

চেকপোষ্ট থেকে বনে ঢোকার অনুমতি নিতে হল। চেকপোস্টের বড়বাবু উৎপল কুমার দত্ত, আলিপুর জুয়ার থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। বসন্ত কয়ালবাবুর চেনা জানা মানুষ। সুদর্শনের কথা বলাতে দু' একটা রান্নার সরঞ্জামের ব্যবস্থাও করে দিলেন। শেষে বললেন— দ্বীপান্তরেও মানুষ এমন নিঃসঙ্গ থাকে না। আমার স্ত্রী তো কান্নাকাটি করে একসা। মেজোবাবু সন্তোষ মিত্র শক্ত মানুষ। হাসনাবাদ থেকে সদ্য এসেছেন। জলপথ, বনপথে জীবনের অর্ধেক কাটিয়েছেন।

একঘণ্টা পর ভট্ভটি নোঙর করল। ধুতি, প্যাণ্ট, শার্ট, পাঞ্জাবী, চটি খুলে রেখে অনেকেই ঝটপট নেমে জলকাদায়। সুদর্শন, দীপক ও সুদীপ বসে থাকল সুদীপ ছোলা ভাজা বের করে চিবোতে থাকে।

ক্যাওড়া, ধুধুল গাছের শ্বাসমূল উর্ধ্বমুখী। শরশয্যা যেন। একটু শক্ত মাটিতে নারকেল গাছের মত গোল গাছ। এ গাছের পাতায় ঘরের চাল ছাউনি হয়। কাণ্ড থেকে ফল বের হয়েআছে। আদিবাসী যুবক অনিল সর্দার এক থোকা ছুঁড়ে দেয়। মিষ্টি ফল। ছেলেটা দেখতে কৃষ্ণকালো, তবে বেশ ফিটফাট, ফিল্মের মিঠুন চক্রবর্তীর মত। সুঠাম শরীর নিয়ে ঝট্পট শুকনো ডাল ভেঙে নেয় জ্বালানি হবে। আশুতোষ, সতীন্দ্ররা গর্ত থেকে লাঠি দিয়ে টেনে কাকড়া বের করে। বসন্তবাবু তিনটা মোটা ডাল সম উচ্চতায় মাটিতে পুঁতে উনুন তৈরী করলেন।

সাহস করে অভিজ্ঞতার জন্যে সুদর্শনরাও নেমে এল। শিবমিস্ত্রী বনের মধ্যে নিয়ে গেল। বাঘ, হরিণ, শুয়োর ও বানরের পায়ের ছাপ দেখালেন। বাঘের রাজ্য এটা। এবনে তিনি বহু বাঘ, হরিণ

মেরেছেন যৌবনকালে। তখন আইনের কোন কড়াকড়ি ছিল না; মুক্তাঞ্চল ছিল।

সুদর্শনরা ঘুরে ফিরে নদীর তীরে এল। হাতে কিছু ক্যাওড়া ফল। খুব টক। গরমে অস্বস্তি। রাঁধুনী ছাড়া সবাই নদীতে স্নানের জন্য নামল। সুদর্শন ভয়ে ভয়ে তু'ডুব দিয়েই উঠে গেল। কালীতলায় একজন জেলের পা কামটে কাটলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়ার পক্ষে কাটা পা থেকে অজস্র রক্ত ঝরে নদীর জল লাল হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া এভাবে স্নানের অভ্যাসও তার নেই।

খিদের চোটে সবাই পেটপুরে খেয়ে নিল। আলুর দম, কচু ভাতে ও মুগ ডাল দিয়ে এক পেট ভাত খেল সুদর্শন। অন্যদের মাছের ঝোল ও কাকড়া সেদ্ধ একসট্রা আইটেম।

সুদর্শন নোনা জলে মুখ ধুয়ে নৌকার মধ্যে বাঁশের পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ল। দীপক এক পাশে, অন্য পাশে সুদীপ। নৌকা ছাড়ল পড়ন্ত বেলায়। অনেক দূর যেতে হবে। ঝড় বৃষ্টি উঠলে রক্ষে নেই। নৌকার ছাদে বসে বসন্তবাবুরা গান ধরল কোরাসগান। শ্রুতি মধুর নাহলেও পরিবেশে মানিয়ে যায়।

এবার নৌকা রায়মঙ্গলের মাঝ বরাবর। কোনাকোনি এগিয়ে চলল। তু'পাশে জল আর জল। চতুর্দিকে বনের অস্তিত্ব দিকচক্রবাল রেখায় যেন মিশে গেছে।

এই নদীতে কত নৌকা, লঞ্চ ও মানুষ ডুবি হয়েছে। গতবারও খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ডেড লাইন সংবাদ ছিল। সুদর্শন ভাবে এমন পরিবেশই অর্থাৎ বিপদে পড়লে মানুষ ঈশ্বরের স্মরণ নেয়। বিপদে কেউ কেউ ঐশ্বরিক কৃপাও পেয়ে যান। এবং অলৌকিক বিষয়ে কত গালাগাল জন্ম নেয়। বড় বড় ঢেউ দেখে সেও ঈশ্বরের স্মরণ নিল।

মাঝিদের গান থামার পর কি মুনির পাল। সারাদিনের ধকলে সবাই শ্রান্ত। কালীতলা এল শিবমিস্ত্রী ও অনিলরা নেমে যেতে সুদর্শনকে নিমন্ত্রণ করল। বসন্ত কয়াল ও অনুরোধ জানালেন

দীপক বলে দেয়। আজ রাতে মুরারীদার বাড়ী থেকে আগামীকাল সকালে বসির হাট ফেরার পথে ঐ দিকটা ঘুরে যাবে।

আকাশে মেঘ। গরম। বসন্তবাবু মাঝপথে নেমে গেলেন। নৌকায় শুধু সুদর্শনরা চারজন ও মাঝি।

সন্ধ্যাঘাটে নামার সময় ঝির ঝির বৃষ্টি হলে সুদর্শন কাগজ পত্র একটা পলিথিনের প্যাকেটে ঢুকিয়ে কাঁধে ঝুলানো কাপড়ের ব্যাগে রাখল। অনেক তথ্য এই ঝোলায়। লেখালেখির কাজে লাগবে।

জলকাদা ভেঙ্গে পথে উঠতেই জোর বৃষ্টি লাগল। সঙ্গে বাতাস ভিজতে হচ্ছে। উপায় নেই। সঙ্গে ছাতাও নেই। মুরারীবাবুর হাতের টর্চ মিটমিটে আলো ফেলছে। পথও ভাল দেখা যাচ্ছে না। চটি হাতে নিয়ে হাঁটছে। ইটের টুকরোগুলি জলকাদায় পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। আন্দাজে প ফেলতে ফেলতে চলছে ওরা।

সুদর্শন দু'তিনবার হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিলেও শেষ পর্যন্ত হাত থেকে গরান, ও বাইনগাছের জল ফেলে দিতে হল। শার্ট ভিজে গায়ে লেপ্টে গেছে। এভাবে দু'মাইল হাঁটতে হবে। মুরারীবাবু রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে বললেন। সাপের ভয় আছে। দু'পাশে জলাভূমি ও ধানক্ষেত।

তাঁর হাতের টর্চের বাল্ব গেল ফিউজ হয়ে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে চোখ আরও আঁধার ঘনিয়ে এলেও রাস্তা ঠিক আছে কিনা বোঝা যায়।

ছেলেকে সামলাতে গিয়ে মুরারীবাবু হোঁচট খেয়ে পরে গেলো। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলেন। কারও কিছু করার নেই অন্ধকারে।

পথ যেন আর ফুরোচ্ছে না। কপালে শেষ পর্যন্ত এত কষ্ট ছিল। অথবা, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে? মরার উপর আবার খাঁড়ার ঘা একিধরনের পোকা ওঁদের গায়ে এসে বসছে আর হাত পা চুলকাচ্ছে। ঈশ্বরের স্মরণ নিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল।

রাত ন'টায় মুরারীবাবুর বাড়ী এসে পৌছল ওরা। তার স্ত্রী গরম জল সাবান, ধুতি ও খাবার রেডী করে রেখেছেন। আজ

সুদর্শনের খাওয়া দেখে উনি খুশি হলেন। নারকেলের এমন পায়েস সে কোথাও খায়নি। তার জন্য হরেক রকমের নিরামিষ রান্না করেছেন উনি। একটু ভাল স্বাদ পেয়ে সুদর্শন লোভী হল। কথায় কথায়, অনেকটা পেটে পুরল খিদেও পেয়েছিল। পথের কষ্টে, সারা-দিনের পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে এল ওদের খেয়ে দেয়ে যার যার বিছানায় উঠল কিছু সময়ের মধ্যেই নিদ্রায় ডুবে গেল সকলে।

সকালে বিদায় নিল সুদর্শন। ওদের আতিথিয়তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হল সে। মুরারীবাবুরা গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। সুদর্শন কথা দিল, সময় পেলে আবার বেড়াতে আসবে।

বসন্তবাবু, ডাঃ নরেন বিশ্বাসের ঘরে বসে ছিলেন। তিনি দীপককেও যেতে বললেন। দীপক যাবে না। বাড়ীতে কাজ আছে তাছাড়া বাড়ীতে বলা নেই। ডাঃ মণ্ডল মাধ্যমিক পাশ করার পর হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী নিয়ে এখন প্র্যাক্টিস করছেন ইয়ং ছেলে বেশ আলাপী। সুদর্শনের চোখ জ্বালা করছিল, কাল রোদ বৃষ্টিতে ভিজেছে। ডাক্তার মণ্ডল হ্যানিমেন কোম্পানীর 'আই-লেক্স' দু'ফোটা চোখে ফেলে দিয়ে বললেন একটু পরেই আরাম বোধ করবেন তারপর যা বললেন তা সুদর্শন আশ্চর্য হয়ে গেল। ঔষধ বেঁচে তার তেমন পয়সা হয় না প্রতিদিন চার পাঁচটা গর্ভপাতের কেস করেন। মাথা পিছু পঁচিশ, পঞ্চাশ টাকা নেয়। দু'বছরের মধ্যে তার পাকা বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে।

এখানে ও প্রসব চলছে। মানুষের কি হল। অসংযম ও অবৈধ যৌন সংযোগ সর্বত্র সংক্রমিত হচ্ছে। এ কি কলির প্রভাব? অথচ শাস্ত্রের নির্দেশ নিজ স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন ছাড়া সহবাস নিষেধ। কে শোনে শাস্ত্র বাক্য!

দীপক চলে যায়। বসন্তবাবু হাঁটতে হাঁটতে বলেন গোসাবায় গিয়েছিলেন আপনি সুধীরদাকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর মত মানুষ দুর্লভ দীপকের মত ছেলেরা শহরে গিয়ে গ্রামের কথা ভুলে যায়।

ওর বাবা সত্যি একজন কর্মী, মানুষ। আরও শহরের জৌলুসে এমুখো হতে চায় না। নিজনিজ বাসস্থানকে উন্নত না করলে ভালো ছেলে দিয়ে কি হবে? এ অঞ্চলের বহু কৃতি ছেলে শহরবাসী হয়ে গেছে।

রোদ চড়ছে। প্রায় দু' মাইল হেঁটে বসন্তবাবুর বাড়ী পৌছল। তাঁর দোতালা ঘর। বাড়ীর সামনে ঘাট বাঁধানো পুকুর। গোশালা, ধানের গোলা। এ অঞ্চলের ধনী মানুষ উনি। তাঁর দাদা জ্যোতিষ কয়াল এখানকার রাজনৈতিক নেতা। প্রাথমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক। প্রচুর ধানের জমির মালিক। একটা লঞ্চের সার্ভিস ও চালু আছে। তাঁর।

দোতালার ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হল। ঘরে ওদের গুরুদেবের ও নেতার ফটো। আর এক আলমারি বই।

পোষাক ছেড়ে পুকুরে হাত পা ধুয়ে নিল। দু'ভাইর বৌই রোগা স্বাস্থ্যহীন। কোন রোগ হয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে এমন স্বাস্থ্যহীন দেখে ওর দুঃখ হল। জ্যোতিবাবু আজই বসিরহাটের বাসায় যাবেন। হাতে গতকালের খবরের কাগজ। কলকাতা থেকে এখানে কাগজ আসতে আসতে বিকাল, কোথাও রাত হয়ে যায়। একখানা কাগজ দেখতে দশবাড়ীর মানুষ জড়ো হয়। একজন পড়েন সকলে শোনেন। বিশেষতঃ রাজনৈতিক খবর, খুন খারাবির খবর। এখানকার, স্থানীয় পত্রিকা 'জলজঙ্গল'। সুদর্শনের কথায় কয়েকখানা 'জলজঙ্গল' জ্যোতিবাবু তাক থেকে নামিয়ে দিলেন। তথ্য লিখে নিতে বললেন।

কিছু সময় পরে খবর পেয়ে স্থানীয় ছাত্রপরিষদের নেতা দীনেশ বৈদ্য আসেন। বসন্তদার মুখে অপনার কথা শুনেছি। আমার কিছু কথা আপনাকে শোনাতে এলাম। এই বলে ও একটা চেয়ারে বসল? জ্যোতিবাবুও বললেন ওর কথাগুলো লিখে নেবেন, আমাদের পার্টির খুব একনিষ্ঠ কর্মী। আমার ছেলে বিদ্যুতের বন্ধু। বিদ্যুত বসিরহাটের ছাত্রপরিষদের নেতা খুব চিনি। বেশ স্মার্ট ও মিশুকে ছেলে প্রতি শুক্রবার বাড়ীতে ধর্মসভা হয়। সুদর্শন কথা

শুনে জ্যোতিবাবু গর্ব অনুভব করেন। চোখেমুখে উজ্জলতা এনে বলেন—বিদ্যুৎ আমার বড় ছেলে। টাউনে একটা বাড়ি করেছি, ছেলেদের পড়াশুনা? ডাক্তার বদ্যি কোর্ট সব ব্যাপারে সুবিধা। এখান থেকে রোগী যেতে যেতে পথেই শেষ হয়ে যায়। আর মামলা? একদিন আগে গিয়ে হাসনাবাদ বা বসিরহাটে হয় কুটুমবাড়ীতে, নয় হোটেলে থাকতে হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব? কোন প্রকার লড়াই করে টিকে আছি। ইলেকশানের কাজকর্ম আছে। ছেলেমেয়েরা ঘরে এসে নতুন কাকুকে দেখে। সে ওদের হাতে চকোলেট দেয়। কি নাম? কি পড়ে? ইত্যাদি জিগ্যেস করে। মেজ বৌ মুড়ি, কলা, দুধ এনে সামনে রেখে বলেন গরীবের বাড়ী, সামান্য আয়োজন, খেয়ে নিন। শহরের মত এখানে দোকান নেই

দীনেশ বৈদ্য সাংবাদিককে পেয়ে একগাদা নালিশ জানালেন। পাটঘরার মহাদেবদের মাঠের ধান লুট হয়ে গেছে। হাইকোর্টে অপারেশান বর্গার মামলা ঝুলছে। হাইকোর্টে আসা যাওয়া, কলকাতায় কোথাও থাকা এবং গাড়ীঘোড়ার ভাড়া জোগান গরীব মানুষদের পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। এখানে কোন ফাঁড়ি নেই। বাংলাদেশী ডাকাতদের উৎপাত লেগেই আছে। পুলিশ সহজে আসে না, এলেও এত সময় নেয় যে ডাকাতরা বাংলাদেশে ঢুকে যায়। আপনি এখানে একটা ফাঁড়ি করার কথা লিখুন। নকশাল আমলে এটা মুক্তাঞ্চল ছিল। পিকীং বেতার কেন্দ্র ও চীনা অস্ত্র শস্ত্র প্রচুর উদ্ধার হয়েছিল এখানথেকে। আরও অনেক নালিশ জানায় সে তাকে।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। বড়বৌ ও মেঝবৌ তাঁকে স্নানের জন্য বললেন। বসন্তবাবু ধানের জমি থেকে ঘুরে এলেন। জ্যোতিষবাবু খেয়ে দেয়ে লঞ্চ ধরতে চলে গেছেন অনেকক্ষণ আগেই। ছেলে-মেয়েরা পুকুরে সাঁতার দিচ্ছে।

সুদর্শন এমন একটি সুখী দেখে খুশি হলো। দু' বৌ ঠিক দু' বোনের মত। ওদের মুখের ভাবভঙ্গীই বলে দেয় সুখ, শান্তি, ও

ঐশ্চর্য সবই আছে।

খেতে বসে বসন্তবাবু বললেন—তার বাবা স্বর্গীয় কালীপদ কয়াল এখানে নাম করা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ও কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। গোসাবার মন্দির, কালকুনি আশ্রম, স্কুল ও মোল্লাখালির স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রচুর অর্থ সাহায্য আছে তার। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অযাচিত বহু কৃপাও পেয়েছেন তিনি।

খেয়েদেয়ে ঘরে এসে দেখে টেবিলে একগ্লাস জল ঢাকা, মৌরী, সুপুরির কুঁচি একটা প্লেটে। বিছানায় বসে বজ্রাসন ও প্রাণায়াম করা তার ছাত্রজীবন থেকেই অভ্যাস।

বসন্তবাবু ধুতি পাঞ্জাবী পড়ে এসে বললেন, আপনি বিশ্রাম নিন। আমি যোগেশগঞ্জে যাচ্ছি। নির্বাচনী মিটিং আছে। সন্ধ্যায় ধর্মসভা। ফিরতে রাত হবে। আপনি নিজের বাড়ী মনে করে থাকবেন। বিকেলে ছেলেকে নিয়ে রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ী যাবেন। ওঁর ভাইপো মুক্তেন্দুকে আমার কথা বলবেন। রাজকৃষ্ণবাবু এখানকার ধনী মানুষ। দু'তুবার এম. এল. এ. ছিলেন। শেষে ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর কাছে হেরে যান। তিনিও আমার গুরুভ্রাতা। প্রচুর দানধ্যান আছে। বাবা আর রাজকৃষ্ণকাকু গুরুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আপনার সেবা যত্ন করতে পারলাম না। ক্ষমা করবেন। বর্ণহিন্দুর সেবা করলে পুন্য অর্জন হত।

—আর লজ্জা দেবেন না। আপনারা বর্ণহিন্দুদের চেয়ে কম উন্নত কিসে? হিনমন্যতা রাখবেন না। আজকাল এসব অচল।

—জাতপাত মানি না, তবে বর্ণভেদ মানি। বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থা। ইঞ্জিন না হলে গাড়ী চলে? ব্রামণরা সমাজের ইঞ্জিন ছিল

—শুধু ইঞ্জিনে গাড়ী চলে না। বগি, চাকাও লাগে। তেল, কয়লা বা বিদ্যুৎ ও প্রয়োজন। ব্রাহ্মন ইঞ্জিন হলে, বগি ক্ষত্রিয়, চাকা হল বৈশ্য। আর তেল বিদ্যুৎ অর্থাৎ জ্বালানী হল শূদ্র। সমাজে সবার প্রয়োজন। বিহিতভাবে স্ব স্ব কর্ম করাই ধর্ম।

—গুরুদেব তাই বলেন, 'শূদ্রইতো জাতির চাকা, বৈশ্য যোগায়

দেশের টাকা / ক্ষত্রিয়েরা রাজার জাত, সবার পূরণ বিপ্রধাত।'

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে সে এখানকার একটা ইলেকশান রিপোর্ট লিখে ফেলে। কিছু স্থানীয় মানুষের কথায় উদ্ধৃতি ও জুড়ে দিয়েছে। বার্তা সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখে ফেলে। কাল ডাকে ফেলবে।

এমন সময় মেজো বৌ এলেন। কি করছেন? এখানে এসেও লেখা? বিশ্রাম নেন কখন?

—আমাদের আর বিশ্রাম? পুলিশ, ডাক্তারদের মত চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। খবর হলেই লিখতে হবে। এখানে ওখানে ছুটতে হবে।

—বিয়ে করছেন না কেন? একা একা ভাল লাগে?

—কেন আপনাদের মত বৌদিরা আছেন। কত মহিলা জানা-চেনা আছে। বিয়ে করে কি হবে।

—তাতে কি হয়? নিজের মেয়েছেলে চাই।

এই তো ভালো। নয়ত মান, অভিমান, দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। বেবীফুড, ডাক্তার কত এনার্জী ব্যয় হয়। ভাবুন তো।

—তবু মজা আছে। একজন নিজের মাঝে সুখও দুঃখের সঙ্গী হয়। সংসারে থাকলে বিয়ে করতে হয়। নয়ত পূর্ণাঙ্গ জীবন হয় না, বনের সন্ন্যাসীতে কোন কাজ হয় না, গৃহী সন্ন্যাসী চাই। রামকৃষ্ণ ঠাকুর জোর দিয়ে একথা বলেছেন।

দেখা যাবে। মনে থাকবে। দিনতো আপাতত চলে যাচ্ছে। সুদর্শন অনিমা, সুকন্যা এদের কথা চেপে গেল। প্রেম, ভালোবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জীবনে নারীরও প্রয়োজন। সে রসিকতা করল শুধু। বিয়ের কথা মনে মনে ভাবছে সে।

সুদর্শন চারটায় পোষাক পরে তৈরী হয়ে নিল। জ্যোতিষবাবুর ছেলে এসে বলল, কাকু চলুন, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। মেজো বৌ চা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। চা না খেয়ে লেবু জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

সুদর্শন হাঁটতে দু'পাশে তাকায়। ধান ক্ষেত। সোনালী রং।

কোথাও ধান কাটছে। কোথাও গাদা মেরে রেখেছে, কিছু জনমজুর বাঁকে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসব রাস্তায় কোন ভ্যান বা গোরুর গাড়ী চলতে পারে না। তাই মাথায় বা কাঁধে বয়ে নেওয়াই একমাত্র উপায়। এদিকের জমি উঁচুনীচু, রাস্তা, চলতে আল। গাড়ী চলবে, পথ কোথায়? কি কষ্ট মানুষের। চাষী, গৃহস্থ, জনমজুর সবার মুখে হাসি। মোটা ভাত, খালবিল পুকুরের মাছ। অতিথি আপ্যায়নে ভয় পায় না।

বিকেল শেষ। পারঘুমটি বাজারে এসে পৌছল। পার্শ্বস্থ মাঠে ছেলেরা বল খেলছে। চারপাশে লোক। খেলা দেখছে। মুকেন্দুও খেলছিল। মুকেন্দু সুদর্শনদের খবর পেয়ে এগিয়ে এল। এর বাড়ীর কাছে এসে সংলগ্ন পুকুরে হাত পা ধুয়ে নিল।

বহু কামরা যুক্ত দ্বিতল বাড়ী। পুরানো দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। নিচের ঘরে এদের বসতে দিল। অপরিচ্ছন্ন ঘরের মেঝে ধান, পাট, ডাল ইত্যাদির সহবস্থান। একটা খাট, ছেঁড়া কাঁথা ও নোংরা বালিশ। ভাঙ্গা চেয়ার দু'খানার কোন প্রকারে বসল ওরা। অসদাচারী। মুকেন্দু বলল—রামকৃষ্ণ জ্যাঠা বসির হাটে থেকে কোর্টে ওকালতি করেন। রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন অনেককাল। যতটা সময় পান গুরুর কাজে ডুবে থাকেন। মুকেন্দু পীড়াপীড়ি করলেও সুদর্শন কিছু খেল না। এমন অপরিছিন্ন পরিবেশে খাওয়া মানে অসুস্থ হওয়া ভেবে সে বেশী সময় বসল না। উঠে বাজারের মধ্যে দোকান পাট দেখে উঁকি মারল। ঘরে কালীমূর্তি। একটা বটগাছ ছাদ ভেদ করে উঠেছে। ছোট বড় বহু ইঁটের টুকরো ঝুলানো। মানুষের সংস্কার। একজন বৃদ্ধ বললেন, এমন্দির কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে কেউ জানে না। ছোটবেলা থেকে তিনিও দেখছেন। সুন্দরবনের আদি মন্দির বলে স্থানীয় লোকদের ধারনা তামাম উত্তর সুন্দরবনের হাজার হাজার লোক আসে বার্ষিক মেলায়।

বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে কিছুদূর এসে হাজারীলাল মণ্ডলের বাড়ী ঢুকল ওরা। ধনী মানুষ। ব্যাটারী দিয়ে টি. ভি. চালাচ্ছেন।

তার 'জয়দুর্গা' লঞ্চ সার্ভিস চালু আছে। সে ও তপন ঘরের বারান্দায় বসল। সামনে শশধর রায়, কালিপদ গায়েন, চণ্ডী রায় এসে বসলেন সামনে। চণ্ডী রায় বললেন—তার ঘর ঝড়ে পড়ে গেছে, গরীব মানুষ কোন সাহায্য পায়নি। লেখালেখি, ধর্ণা সব বৃথা গেছে। শুধু নালিশ আর নালিশ। সাংবাদিক বলে কি আর কিছু শোনার নেই? জানার নেই? ভোটা ভোটির কিছু কথা বলল ওর ছেলে। রাজনীতির রোগে এরাও আক্রান্ত।

তপন হাঁটতে হাঁটতে বলল—রাজকৃষ্ণ মণ্ডল এখানে ১৯৫৬ সালে এম এল. এ. নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি দু'বার পর পর জয়ী হ'লেও সরকারী অর্থ আদায় করে কিছু করতে পারেননি। তারপর ভোলানাথ ব্রহ্মচারী জয়ী হয়ে কিছু কাজ করেন বটে, জনসাধারণের চাহিদার অনেকটাই বাকী থাকে। পরবর্তীকালে হাজারী মণ্ডল সি. পি. আই পার্টি থেকে দাঁড়িয়ে জিতলেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। আত্মস্বার্থই বুঝেছেন। এখন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন উনি। ভোলানাথবাবু, রাজকৃষ্ণবাবুরা থাকেন না তাই সুবিধা। কংগ্রেসে তারমত পয়সাওয়ালা ক্ষমতাবান মানুষ নেই। ওর ভাই সি. পি. এম পার্টি'র সমর্থক। তেলের ডিলার ব্ল্যাকে তেল বেঁচে বহু পয়সা করেছেন। এখন সি. পি. এম-এর রাজত্ব স্থানীয় সি. পি. এম নেতা সুধাংশু মণ্ডল এখন এম-এল এ। সবাই এক চরিত্রের আপনি এলেন বলে, নয়ত আমি এদের বাড়ী আসিনা।

তপন বুঝিয়ে বলল, ইচ্ছামতী, কালিন্দী আর রায়মঙ্গল নদী দুল-দুলি থেকে হেমনগর পর্যন্ত ঘিরে আছে। সাহেবখালি, যোগেশগঞ্জ, কালিতলা, রমাপুর, মালেকানা ঘুমটি, সামসের নগর, গোবিন্দকাটি এলাকার উল্লেখযোগ্য গ্রাম। হাসনাবাদ থেকে হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে দুলদুলি দিয়ে মালেকানা ঘুমটি আসা সহজ। এখান থেকে রাস্তা ধরে সোজা হেমনগরে যাওয়া যায়। সাহেবদের শাসনকালে এরাস্তা হয়েছে রাস্তা বাধানো হলে গ্রামগুলি আরও উন্নতি হত। আপনি লিখুন, যদি সরকারের টনক নড়ে।

আবার বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটা। এবড়ো খেবড়ো। অন্যমনস্ক

হওয়ার উপায় নেই। গ্রামের একদিক দিয়ে এনে অন্যদিক দিয়ে ঘরে ফিরছে ওরা। গ্রামটা দেখা হয়ে যাবে। সন্ধ্যা উতরে গেছে। টর্চ নিয়ে সে আগে আগে হাঁটছে, ছেলেটা পেছন পেছন। ঘরে ফিরে সুদর্শন কিছু কাজ সেরে নেয়। ডায়েরী, লেখার বিষয়ে কিছু তথ্য লিখে রাখে। তারপর আলমারি থেকে গান্ধী চরিত বেরকরে কয়েক পাতা পড়ল।

রাত দশটায় তপন মাঝি খেয়েদেয়ে হাজির। বসন্তবাবু ওকে বলে দিয়েছেন, ভোর রাতে লঞ্চঘাটে তুলে দিতে। সুদর্শন ও খেয়ে নিল তাড়াতাড়ি। খেতে বসে বৌদিদের সঙ্গে কিছু গল্প করল সে।

তপন মেঝেতে শোয়ার জন্য বিছানা করলে সুদর্শন আপত্তি জানায় খাটেই জায়গা করে। তাড়াতাড়ি শোবে বলেও গল্পে গল্পে রাত সাড়ে এগারোটা বেজেগেল। মেজো বৌ বললেন, শুয়ে পড়ুন। তিনটায় উঠে লঞ্চ ধরতে হবে। ঘুম ভাঙবে না শুয়েও ওরা গল্প করল কিছু সময়। স্থানীয় ঘটনা জেনে নেয়। ছেলেটি খুব সপ্রতিভ। অনেক অনেক খোঁজ খবর রাখে। মামার বাড়ী এসে জন খাটছে। কোন টাকা পয়সা দেয় না। শুধু থাকা খাওয়া। আরও বলল, কলকাতায় একটা কাজের চেষ্টায় আছে। না হলে বাংলাদেশে মা বাবার কাছে চলে যাবে। ঘুম আসার পরও ও বকে যাচ্ছিল। সুদর্শনের কোন সাড়া না পেয়ে হয়ত ও থেমেছে।

রাত তিনটা নাগাদ মেজ বৌ ডেকে দিলেন। চোখে ঘুম। তবু উঠতে হবে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তৈরী হয়ে নিল। তপনও রেডী হয়ে আছে সঙ্গে মেজো বৌ একটা হ্যারিকেন নিয়ে সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এলেন।

চারদিকে অন্ধকার। পৃথিবীর পশুপাখি, মানুষ উদ্ভিদ এসময় ঘুমোচ্ছে। শুধু তারা তিন জন প্রাণী এ বাড়ীতে জেগে আছে। বাড়ীর দরজায় এসে বৌটি বললেন, আবার আসবেন, ওনারা নেই কথা বলতে পারলেন না। আপনি খুব ভালোমানুষ। গুরুদেব আপনার মতো মানুষ চান। তাঁর বই পত্র পড়বেন। তাঁকে স্বীকার করলে, অনেক

বড় হতে পারবেন। গুরুদেব বলতেন, ধর্মকে তুমি রাখলে, ধর্মও তোমাকে রাখবে।

ভেবে দেখব। আপনাদের কথা মনে থাকবে। ডায়েরীতে লিখে রেখেছি। বাড়ী গিয়ে গল্প করব। সুদর্শনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

লঞ্চে উঠে খেয়ে নেবেন। এখন তো কিছু খেলেন না। এই বলে ব্যাগের মধ্যে এক ঠোঙ্গা চিড়া, গুড় ও কয়েকটা কলা ঢুকিয়ে দিলেন।

—এত কেন? দু'তিন জনের খাবার এখানে।

—না মশাই, হাসনাবাদে যেতে বেলা শেষ হয়ে যাবে। দিনে ভাত তো আর পেটে পড়বে না।

—আর কত ঋণী করবেন? আমি আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলাম না। শুধু শুধু খাটিয়ে গেলাম।

—আবার বৌসহ এসে বেশীদিন থেকে যাবেন।

রাস্তায় পা দিল সুদর্শন। কাঁধে ব্যাগ, হাতে টর্চ। তপন এ্যাটাচিটা হাতে নেয়। পথে নেমেই ও কথা বলতে শুরু করে।

সুদর্শন রাগে না। খুব সরল ছেলে। কি স্বার্থ ওর রাত জেগে দু মাইল হেঁটে পৌঁছে দেওয়ার কিছুদূর গিয়ে কোনাকুনি মাঠের মধ্যে নেমে তপন আগে, সুদর্শন পেছনে হাঁটছে। সদ্য ধানগাছ কাটা মাঠ ভিজে মাটি। চটি জলে কাদায় একসা। তার উপর শুরু হল ঝির-ঝিরে বৃষ্টি। দ্রুত হাঁটতে লাগল দু'জনে।

মালেকানা ঘুমটি ক্যাম্পে পৌঁছতে ভোর চারটা। একটা কুল গাছের তলায় ওরা দাঁড়াল। মশার উৎপাত। নদীতে জেলেরা মাছ ধরছে। টিমটিমে বাতি (ওদের ভাষায় কুপি) জ্বলছে।

একটা লঞ্চের হেডলাইট আলো ফেলতে ফেলতে ভোঁ ভোঁ করে এসে ঘাটে থামে। ওরা হেঁকে বলল, আজ কোন লঞ্চ হাসনাবাদ যাবে না। হাসনাবাদের লঞ্চ খারাপ হয়ে পথে আটকে আছে।

অগত্যা তাকে ছোট মোল্লাখালি যেতে হবে। ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। আলো ফুটে উঠছে। নৌকার মধ্যে কুঁচো চিংড়ির স্তূপকে তুলোর স্তূপের মত মনে হচ্ছে। ওরা ও প্রমাদ গুনল। হাসনাবাদে

মাছ পাঠাতে না পারলে সব পচে যাবে। আর রাতের সব পরিশ্রম জলে গেল।

তপন বলল, এই হতভাগ্য জেলেদের জীবন এমনই অনিশ্চিত যে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় প্রভাবেই কেটে যায়। এরা দিন আনে দিন খায়। থাকে কুঁড়ে ঘরে।

তপন এটাচি লঞ্চের সীটে রেখে নামতে যাবে এমন সময় একটা ছেলেকে ডেকে বলল, এই বিমলেন্দু সুদর্শনদার সঙ্গে থাকবে। তোমাদের গ্রামে যাবেন। তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে। বড় লেখক। সাংবাদিক। বসন্ত বাবুর বন্ধু লোক।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করল। সুদর্শন বারন করলেও শুনল না। তপন নেমে যেতে পাঁচ টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, কলকাতা গেলে দেখা করবে। তুমি অনেক কথা জান। মনে থাকবে তোমাকো চিঠি লিখবো।

তপনও পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ওর মুখ গম্ভীর। চোখ জল ছল। এরা এত ভাল যে সহজেই আপন হয়ে যায়। খুব সরল প্রকৃতির মানুষ এরা।

হাত পা ধুয়ে বিমলেন্দু সুদর্শনও সিটে গিয়ে বসল, পাশাপাশি। তখনও ভোর হয়নি। সবাই ঘুমোচ্ছে কয়েকজন পুলিশ শুধু জেগে আছে। ওরা ডিউটি থেকে ক্যাম্পে ফিরছে। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে যাচ্ছে। যাত্রীরা অতি সাধারণ মানুষ। জন, মজুর, চাষী ও জেলে বলে মনে হয়।

সুন্দরী তখনও ঘোমটা দিয়ে আছে। ইঞ্জিনের আর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। বিমলেন্দুকে কয়ালদের বাড়ীর কথা বলার সময় কণ্ডাকটার কান পেতে শুনছিল। ভাড়া দিতে গেলে নিল না। বলল, এটা ওদের লঞ্চ। আপনি ঐ বাড়ী থেকে এইচেন, ভাড়া নেব কেনে?

একঘণ্টা ঝিমিয়ে নেওয়া যাবে। সে বিমলেন্দুকে বলল—এখন ঘুমোও। সুন্দরবনে উঠলে কথা বলব। কাল দিনভর বিশ্রাম হয়নি, রাতে সিকি ভাগ ঘুমিয়েছি।

একটু বেলা হলে ওরা ফ্লাস্কের জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। সূর্য যেন মিয়ানো সিঁদূরের টিপের মত দেখাচ্ছে। দু'জনে চা বিস্কুট খেয়ে নেয়। বিমলেন্দু মুড়ি নাড়ু বের করে। সুদর্শন বলে, রেখে দাও বেলা হলে খাবো। বিমলেন্দু পুনরায়। চোখ বুঁজে থাকে কিশোর বালক রাতের ঘুম পুষিয়ে নিচ্ছে।

সুদর্শন বই বের করল। জর্জ টমসনের 'ধর্ম ও সমাজ' অর্ধেকটা পড়া ছিল। বেশ জোরালো ভাষায় লেখক যুক্তি দিয়ে ধর্মের অসারতা ও নাস্তিক্যবাদের গুণগান করেছেন। পড়তে পড়তে তারও মনে হয় ধর্মটর্ম সব মিথ্যা। মানুষ কর্মে ফাঁকি দিয়ে দৈবনির্ভর হতে চায়।

দেখতে দেখতে কাটাখালি চলে যায়। সাত সকালে জেলে-জেলেনীরা ছেলেমেয়ে নিয়ে মাছ ধরতে নেমে গেছে। যখন তখন নদীতে কুঁচো চিংড়া পাওয়া যায়। গরীবদের জন্য প্রকৃতির অফুরন্ত দান। সারি সারি হাড়ি বসানো। ধরছে আর হাড়িতে রাখছে। ওরা বাগদা চিংড়ির বাচ্চা ধরে নিয়ে বিক্রী করে। পুকুরে, ডোবায় ফেলার জন্য বিক্রী হয়। ফড়েরা সংগ্রহ করে চালান দেয়।

কুমোড়পাড়া পেরিয়ে গেলে আবার পড়ায় মনোযোগী হয় সুদর্শন।

ছোট মোল্লাখালি

ছোট মোল্লাখালি পৌঁছতে বেলা শেষ হয়ে যায়। দুপুরে অস্নাত অবস্থায় থাকে। চিড়া, নাড়ু ও কলা খেয়ে দিন কাটে। গরমে অবসন্ন। ঘাটে নেমে একপলক দেখে নেয়। গঞ্জের বড়হাট। টিন, ইঁট, টালি, খড়ের কয়েকটা ঘর। একটা দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে বিমলেন্দুর পিছু নিল।

বিমলেন্দুর বাবা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার। সবাই সমীহ করেন। তার নিজের বাড়ী যোগেশগঞ্জ থেকে পাঁচ মাইল দূরে। স্থানীয় মানুষদের অনুরোধে এখানেই সাত বছর আছেন। বিমলেন্দুর মা, বোন ও ভাই থাকে। দাদু, কাকা, ও পিসী যোগেশগঞ্জের বাড়ীতে থাকেন। নিজেদের বংশের পরিচয়ের কথা বিমলেন্দু বলে যায়। বাজারের পাশেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ভাড়া নেওয়া ছোট পাকা বাড়ী। আশেপাশে আর কোথাও পাকা বাড়ী নেই। বাড়ীর মালিক কলকাতা থাকেন বলে তার বাবা এখানে থাকতে পারছেন।

দরজার মুখে ওর মা দাঁড়িয়ে ছেলের অপেক্ষায়। ওর হাতের ব্যাগ ধরে ঘরে তুললেন। সুদর্শনের পরিচয় দিয়ে বলল, মা ভাত বসিয়ে দাও। খিদে পেয়েছে। দু'জনের একই অবস্থা।

ছোট ছোট ঘর। একটা ঘরে সুদর্শনকে বসালো। গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। লুঙ্গি পরে গামছা গায়ে দিয়ে স্নানের জন্য বিমলেন্দুর সঙ্গে স্নান করতে বালতি, মগ নিয়ে কলতলায় গেল।

জলের কল দেখে সুদর্শন খুশি। পুকুরের মত কাদা নেই। জল ও পরিস্কার। তবে বাথরুমে স্নান করতে সে অভ্যস্ত বলে, খোলামেলা স্থানে অস্বস্তি বোধ করে। স্নান করার পর আরাম বোধে ঘুমে ওর চোখ টেনে আনে। নানা রকম মকৃস করে জেগে থাকে। আধঘণ্টা পর

ওর মা দু'খানা রুটি আলুভাজা আর কাঁচাগোল্লা এনে বললেন, সুদর্শন-বাবু খেয়ে নিন। ছেলের সঙ্গে এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি। খাওয়া থাকায় কষ্ট পাবেন ক্ষমা করে নেবেন।

আশ্রয় পেয়েছি এই যথেষ্ট। বিমলেন্দুর সঙ্গে পরিচয় না হলে কোথায় থাকতে হত কে জানে। এ তো স্বর্গ পেয়েছি।

ওর মা খাওয়ার সময় কত কথা বললেন। বেশ বুদ্ধিমতী ও করিৎকর্মা মহিলা।

হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় বসল। চোখে ঘুম। শরীরে ক্লান্তি, অবসাদ।

দু'টি কিশোর কিশোরী ঘরে ঢুকে প্রণাম করল। সলজ্জ ভঙ্গি। বিমলেন্দুর মত পাতলা চেহারা হলেও দীপ্তি আছে। ওদের নাম, পড়া-শুনার খবর নিয়ে সুদর্শন বালিশে মাথা দেয়। কিছু সময়ের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আঁধার নেমে আসে ঘন হয়ে।

সুদর্শন বেশী সময় ঘুমোতে পারল না। মশার উৎপাত লজ্জায় মশারীর কথা বলল না চোখে মুখে জল দিয়ে বিছানায় বসল: রাত সাড়ে আটটায় বিমলেন্দুর বাবা এসে টেবিলে স্টেথিস্কোপ রেখে চেয়ারে বসলেন।

—আপনি এসেছেন শুনেছি। রোগীদের চাপে নড়তে পারিনি। আমি একজনই ডাক্তার। আউটডোর, ইনডোর সামলাতে হয়।

—আর কোন ডাক্তার নেই কেন? আপনি ছুটি নিলে কি হবে?

—কেউ আসতে চান না। এখানে কোথায় থাকবে? আর এক-ডাক্তার ছিলেন, মন্ত্রীকে ধরে বদলি নিয়ে চলে গেছেন। ছুটি নেওয়ার উপায় নেই। কর্তব্যের জালে আটকে গেছি নতুন ডাক্তার আসবে শুনেছি। আজ একবছর পথ চেয়ে আছি। কেরানীর কাজও আমা-কেই করতে হয়। তার উপর কত সমস্যা। তিনবার যানবাহন পাল্টে ওষুধ আনাতে হয়। ডি. আর. এস প্রতি তিনমাস পর লিস্ট দেখে ওষুধ পাঠাতেন। এখন সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওরা সময় মত, প্রয়োজনীয় ওষুধ পাঠান না। বিপদের সময়

কোন দামী ওষুধ পাই না। হাসনাবাদ বা ক্যানিং থেকে আসতে আসতে রোগী শেষ। লিস্টে যত ওষুধের উল্লেখ থাকে প্যাকিং খুলে দেখা যায় তত ওষুধ নেই। সি. এম ও. এইচ. এ বিভাগের হর্তাকর্তা ডাঃ এম ব্যানার্জী, ২৪ পরগনার প্রধান। কানে তুলো দিয়ে আছেন উনি। চোখও বন্ধ।

কি ধরনের রোগী বেশী আসে? রোগীরা এখানে আসে কি ভাবে?

— ডেলিভারী, সাপে কাটা, আগুনে পোড়া, হাঙর কামোটে কাটা কেসই বেশী। এদিকে বাঘের উৎপাত নেই। গরমকালে কলেরা, টাইফয়েড, আন্ত্রিক ও আমাশার রোগী শ'য়ে শ'য়ে আসে। ডাক্তারী করার সুখ চলে গেছে। ইনডোরে লাস্ট রাউণ্ড দেওয়ার সময় সঙ্গে যাবেন, দেখবেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা কত শোচনীয়।

—প্রাকৃতিক চিকিৎসার দিকে তাকান। রোগী আর ভেজাল ওষুধে দেশ ছেয়ে গেছে। গাছ গাছরা লতা পাতার কী অসীম গুণ। শিবকালী ভট্টাচার্যের 'বনৌষধি বনস্পতি' ঘরে ঘরে রাখা উচিত।

—ঠিক বলেছেন। একটা মাত্র ট্রেচার। কোন দিকে পাঠাই বলুন? মাথার ওপর ঝুড়িতে বসিয়ে বা বাঁশের দোলনায় তুলে মুমূর্ষ রোগীদের আনা হয়। পরশু একটা বৌ গায়ে আগুন দিলে দগ্ধ নগ্ন শরীর কলাপাতায় শুইয়ে মাচায় তুলে আনে। ভাল ওষুধ, বিশেষতঃ দামী ওষুধ আনতে হলে সেই বসিরহাট বা বারাসাত। ডাক্তার গ্রামে আসবে কেন?

—ঠিকই তো। দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অথচ রোগীর কোন ক্ষতি হলে ছেড়ে কথা বলবে না।

—অধিকাংশ রোগী গরীব ও অশিক্ষিত। কেউ বিষ খেলে গোবর খাইয়ে দেয়, পচা ঘা হলে ডিজেল ঢেলে দেয়। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে খাবার, বিছানাপত্র চায়। আপনি শহরের মানুষ, এসব কল্পনা করতে পারবেন না। বিমলেন্দুর মা যে কত দিক সামলায় কি বলব। একবার নার্সরা ধর্মঘট করলে ওর মা রান্না করে খাওয়ায়,

রোগীদের পরিচর্যা করে। রোগীরা ওকে মা বলে ডাকে। আগে সর্দার পাড়ার লোকরা কাজ করতো। এখন করতে চায় না। রাজনৈতিক উস্কানি। বামফ্রন্ট রেট বেঁধে দিয়েছে। ওদের ইউনিয়ন হয়েছে। তাই কম টাকার কাজ করতে চায় না। বেকার বসে থাকবে তবু কম টাকার কাজ করবে না।

এক ফাঁকে বিমলেন্দুর মা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার সেলাইর সখ ছিল। এখানে এসে সব গেছে।

—ভালোই তো, সেবার কাজ করছেন। সেবা হল বড় ধর্ম।

—ধর্ম কি জানি না। তবে আপনাদের আশীর্বাদে বিমল, কমল, সুতপা ক্লাসে প্রথম হচ্ছে। খুব নম্র ভদ্র। সবাই প্রশংসা করেন এই যা সান্ত্বনা।

—এটাই তো আশীর্বাদ। ছেলে-মেয়ে প্রতিষ্ঠা পেলেই মা-বাবার জীবন সার্থক। কীর্তিমান তিনিই যার সন্তান সৎ সুন্দর ও উন্নত। বাবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত অথচ সন্তান অসৎ ও নিম্নমানের, বুঝতে হবে কোথায় গলদ আছে।

সুদর্শন আরও কিছু সময় কথা বলে ডাক্তারবাবুসহ হাসপাতাল দেখতে গেল। ছোট হলেও বেশ পরিছন্ন। রোগীরা হাত জোর করে প্রণাম জানাল ওদের। ডাক্তারবাবু রোগীদের দেখে নিজের রুমে বসলেন। কি চিকিৎসা করব বলুন? স্টাফদের টি. এ. ঠিকমত আসেনা বলে কেউ কলকাতা যেতে চায় না। একজনের ওষুধ তিনজনকে ভাগ করে দিতে হয়।

আমাকে এঅঞ্চলের হাসপাতালগুলির কিছু তথ্য দিন। কলকাতা গিয়ে লিখব। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ।

লিখে আর কি হবে? স্বাস্থ্যমন্ত্রীই অসুস্থ। তাঁর সময় কোথায়? আমি এখানে আসার আগে সন্দেশখালিতে ছিলাম। ওখানে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও আছেন। কোন মোটর বোট নেই। স্ট্রেচার নেই। পরিবার কল্যাণ বিভাগ বহু কেস ফলস্ দেখায়। একশ্রেণীর দালাল ডাক্তারদের সঙ্গে যোগসাজস রেখে মোটা টাকা

পকেটে পুরছেন। ডি এফ. ডবলিউ. ও. নীরব।

হাসনাবাদের টাকীতে, বরুণহাটায় স্যাণ্ডেল বিলে ও ভবানীপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পঁচাশিটি বেড আছে। আর হিঙ্গলগঞ্জ থানার সাহেবখালিতে শুধু আউটডোর খোলা, দশটা বেড আছে রোগী নেই। সন্দেশখালির কোড়াকাটি, ঘোষপুর, হাটগাছিতে ভাল কাজ চলছে। রাধানগরে কোন ডাক্তার নেই, কমপাউণ্ডারই ডাক্তারের কাজ চালাচ্ছে।

সুদর্শন ঘুরে এসে ঘরে বসলে বিমলেন্দু কয়েকটা 'ভগবৎ দর্শন' পত্রিকা বের করল। কলকাতায় পড়তে গিয়ে বিমলেন্দু এক অধ্যাপকের মাধ্যমে 'ইস্কনের' ভক্ত হয়ে উঠেছে। নিয়মিত ওদের বইপত্র পড়ে।

সুদর্শন পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। কি ঝকঝকে ছবি! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কত লেখা। নিশ্চয় কিছু উজ্জ্বল সত্য আছে, তা না হলে এত মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে কেন? শেষ পর্যন্ত শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামীর আমেরিকায় শ্রীকৃষ্ণনামহট্ট সংঘ খোলার বিবরণ পরে মুগ্ধ হয়ে যায় যে। ৭৭ বৎসর বয়সে কী অসীম মনোবল ও গুরুকৃপা থাকলে এমনভাবে জয়ী হওয়া যায়। আজ তাঁর সংঘ পৃথিবীর দেশে দেশে সমাদৃত। চীন, রাশিয়াতে ও মন্দির হচ্ছে। ওর মার রান্না হয়ে গেছে। খেয়ে নিতে হবে। কখন আবার কল আসে। তাই বড় ঘরের মধ্যে পুরুষরা খেতে বসল। মা মেয়ে পরিবেশন করছে। খেতে খেতে আরও কিছু কথাবার্তা বলল ওরা।

খাওয়া দাওয়ার পর ছোট ঘরটায় তাকে শুতে দিয়ে ওরা সকলে বড় ঘরে শুতে গেল। বিমলেন্দুর মা কাজের মানুষ। ফাঁকে ফাঁকে দু একটা কথা বলেন। বেশী কথা বলতে ভালোবাসেন না উনি।

ওরা ঘরে গেলে সুদর্শন দরজা বন্ধ করে ডায়েরী লিখতে বসে। রাত এগারোটা পর্যন্ত লিখল। শরীরে আর দিচ্ছে না। হ্যারিকেনের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

বসিরহাটের পথে

একঘুমে সকাল সাতটা। হাত মুখ ধুয়ে চা টিফিন সারতে আটটা ন'টায় লঞ্চ আসবে। ভাত খেতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু বিমলেন্দুর মাব কষ্ট হবে দেখে বলল—শুধু শুধু কষ্ট করবেন। এত সকালে খেতে পারব না।

তাই স্নানান্তে রুটি, আলুভাজা ও মিষ্টি খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। বিমলেন্দু সঙ্গে। হাতে কিছু সময় আছে। বাজারটা ঘুরে নদীর ধারে কিছুদূর হাটল। এখানকার বাঁধ তেমন উঁচু নয়। রাস্তাঘাট ও অপ্রশস্ত। একটা স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন নারী পুরুষ হাড়ি কলসি নিয়ে বসে আছে। প্রায় দেড়শ পুরুষ বাটি গ্লাসে সে কি যেন ঢেলে খাচ্ছে।

—বিমলেন্দু, ওরা কি করছে? এত হাঁড়ি, মগ, বালতি কেন?

ও একগাল হাসল। দেশী চোলাই মদ। সদ্দার পাড়ায় তৈরী হয়। জনমজুররা কাজে যাওয়ার আগে খেয়ে নিচ্ছে। পচা গন্ধ পাচ্ছেন না? সন্ধ্যেবেলা আরও ভিড় হয়। তখন গৃহস্থরা ও লুকিয়ে খেয়ে যায়। এদের এই কাজ। খুব গরীব তবু অন্য কাজে যাবে না।

এখানেও মদের কারবার। সুদর্শন আশ্চয হয়। দূরে লঞ্চ সিটি দিচ্ছে। আর দেখা হল না। আর একবার আসতে হবে বিমলেন্দু। তোমার ছুটি হোক, গরম কমে যাক। এ ছুটিতে আর হল না। তোমার পরীক্ষা সামনে, আমারও সময় কম।

লঞ্চে খুব ভিড়। অনেক ঠেলেঠুলে একস্থানে বসল। বিমলেন্দু প্রণাম করে নেমে গেল। কলকাতা গিয়ে দেখা করবে বলল।

সুদর্শন চারপাশ দেখে নিল। এত ভিড় তার পছন্দ নয়। একটু বিরক্ত হল। কোন যাত্রী ওর পছন্দে এল না। তাই জর্জ টমসনের বইটি নিয়ে বসল। নদীর দৃশ্য একই। কি আর দেখবে। বই না পড়ে সে আনন্দ পায় না।

কখনও বই পড়া, কখনও ঝিমোনো, কখনও বা চুপচাপ বসে থাকা খাওয়া বলতে কিছু বিস্কুট। লঞ্চের ভাজাভুজি স্পর্শ সে করল না। পাশের এক ভদ্রলোক কয়েকটা আতা বের করে সুদর্শনকে দু'টো দিল। বাঙালী পোষাক। ভদ্রলোকের পড়নে বেশ ফিটফাট বাবু।

সুদর্শন হাত বাড়িয়ে ধন্যবাদ জানাল। তার খুব প্রিয় ফল। আপনার নাম কি? কোথায় থাকেন, কোথায় যাচ্ছেন?

—ধীরেন ঘরামী। খুলনা গ্রাম থেকে কালীনগরে যাচ্ছি। এই নদীটার ওপারে সন্দেশখালি, তার ওপারে আর একটা ছোট নদী পেরোলে খুলনা গ্রাম। বাংলাদেশের খুলনা নয়। আমি ওখানে শিক্ষকতা করি।

—কালীনগরে যাচ্ছেন কেন? নামটা খুব শোনা।

—হ্যাঁ, হাসনাবাদের কাছেই। এতবড় ধানের হাট ২৪পরগনাতে নেই। কালীনগর হাইস্কুলের মাটেই ধানের হাট বসে। বস্তা প্রতি চার আনা খাজনা নেয়। তাতেই প্রচুর ইনকাম। হেড মাষ্টার শশাংক মণ্ডল সি. পি. এম পার্টির সদস্য ও এ. বি. টি এর নেতা। ফুলগাছ বসিয়ে স্কুলটিকে খুব সুন্দর সাজিয়েছেন। স্কুলের কিছু সমস্যার জন্য তার সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে পোষ্টমাষ্টার ললিত দাশবাবুও যাচ্ছেন। উনি বসিরহাট পোষ্ট অফিসে যাচ্ছেন। দু'জনেই এ অঞ্চলের নানা অবস্থার কথা বললেন।

—খুবই দুঃখ জনক। আজকাল অভিযোগ শুনতে শুনতে বোবা হয়ে গেছি। কত আর লিখব এই বলে, সে যে সাংবাদিক, সুন্দরবনের ওপর বই লিখছে, তথ্য সন্ধান করছে, জানালো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই বললেন, আমাদের গ্রামে আসুন না একবার। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঞ্চায়েত, রাস্তাঘাট, দুর্নীতি নিয়ে অনেক নালিশ আছে। আমাদের বাজার দেখলে মনে করবেন কোন বস্তি এলাকা।

—ঠিক আছে। কথা বলতে বলতে সে ওদের নাম ঠিকানা লিখে নেয়। ওরা কংগ্রেসী সমর্থক। তাই সি. পি. এম সম্পর্কে নানা নালিশ।

হাসনাবাদ পৌঁছতে বেলা চারটা। একটা দোকানে ঢুকে কচুরি, জিলিপি খেয়ে নিল সুদর্শন। তারপর স্টেট বাসে ত্রিমোনী, বাকীপথ রিকসায়। মিত্র বাড়ীতে উঠল।

ঘরে ঢুকতেই গোপেনবাবু হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দেয়। নিউজ এডিটার লিখেছেন বসির হাটের ইলেকশান নিউজ পাঠাতে।

সুদর্শনকে আরও দু'দিন থাকতে হবে। তাকে দেখে বাবু, বুড়ান ছুটে আসে। ওদের হাতে চকোলেটের ঠোঙা দিয়ে, বড় বৌর হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিতেই বললেন, মধু কোথায়? এত মিষ্টি কে খাবে? বনে গেলেন আর মধু আনলেন না?

আমি টাউন হলের দিক থেকে ঘুরে আসছি। কি খবর এদিককার

ইন্দ্রজিৎবাবু জিতবেন, কংগ্রেসের খেয়ো খেয়িতে কারও শ্রদ্ধা নেই। হয়ত অধ্যাপক কমল বসুও যোগ্য মানুষ।

কিছু খেয়ে যান। মুখ চোখ তো বসে গেছে। মা খোকার জন্য দুঃখ করছেন। বাছা কতদিন ঘরে নেই। বড় বৌর মন্তব্য।

বড় বৌ খুব রসিক। বৌদি ঠিক বলছেন। আমিও মাকে না দেখে থাকতে পারি না। মন কেমন করছে।

—ঐ বৌ আসা পর্যন্ত। ছেলেরা বিয়ের আগে মার কোল, বিয়ের পর বৌর কোল পছন্দ করে।

—আপনার শুধু রসিকতা। এখন কিছু খাব না। ইচ্ছে করছে না। এসে ভাত খেয়ে নেব।

—তাড়াতাড়ি ফিরবেন। সুন্দরবনের গল্প শুনব।

—আচ্ছা বলে সে বাইরে এল। একটু ঘুরে আসি। দেরী করব না। আপনাদের ফেলে বাইরে যেতে মন চায় না। তবু দায়িত্বের জন্য যেতেই হবে। এসে কথা বলব।

—দেরি করবেন না। আজ টি. ভিতে ভাল বই আছে। মেজ বৌ মৃদু হেসে বলল।

সুদর্শন রাস্তায় বেড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখল দু'টো মিছিল মুখোমুখি হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সমর্থক বেশী। মিছিল খুব দীর্ঘ। কমল

বন্ধুর মিছিল শুধু কয়েকজন কর্মী। তবে দু'পক্ষের মাইকের জোর সমান। শ্লোগানে কান ঝালাপালা। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে পথ চলতি মানুষদের উক্তি শুনল। তারপর টেলিফোন অফিসে ঢুকে একে একে এস. ডিও, বি. ডি. ও থানায় ফোন করল, তথ্য ও জন-সংযোগ অফিসারের মতামত শুনল। তারপর ট্রাংকল বুক করে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠাল কলকাতার পত্রিকা অফিসে।

কিছু সময় এদিক ওদিক ঘুরে দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলে, ঘরে ফিরে এল। টি. ভিতে তখন শরৎচন্দ্রের 'জয়া' চলছে। ঘর ভর্তি লোক। সে ঘরে না বসে বারান্দায় বসে। বড় বৌ ঘর গুছিয়ে টেবিল সাজিয়ে রেখেছে। এম. এ. পাশ সুন্দরী। সৌন্দর্য বোধ আছে। কি আর করবে! সবাই যখন বসে দেখছে তখন তাকেও দেখতে হচ্ছে। দেখা ছবি তবু ভালো লাগল। যৌথ পরিবারের বড় ভায়ের ভূমিকা অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে। আজকাল সংসারগুলো ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এ সব কথার কে মূল্য দেবে? আজকাল কেই বা বুঝতে চায়? এ যেন যুগের হাওয়া। এমনটাই বুঝি সৃষ্টি-কর্তার ইচ্ছে। আজ কেউ কাউকে সহ্য করতে বা বহন করতে চায় না। ইচ্ছা, দ্বন্দ্ব, হিংসা ইত্যাদি রিপুর তাড়না।

কলকাতায় ফেরা

পরদিন ভোট। প্রচারকার্য বন্ধ। সকাল থেকে ভোটরা দলে দলে বুথে গিয়ে লাইন দিয়েছেন। পবিত্র দায়িত্ব ভেবে ভোট দিয়ে ঘরে ফিরছে কেউ কেউ। ভোট শেষ হলেই দিনটা ছুটির মুডে কাটবে। সুদর্শন সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ছোট বৌয়ের ঘরে গিয়ে বসে। পূবমুখো ঘর। আলো বাতাস খেলে খুব। ঢাকনা তুলে চেঞ্জার চালিয়ে দিল। প্রচুর রেকর্ড। বড়ে গোলাম আলি, ফিরোজা বেগম, অনুপ জলোটা ও পংকজ উদাসের গান বেছে দিল সে। এক এক করে বাজতে থাকে ওদের গান।

এদিকে বড় বৌ প্লেটে আম, টোস্ট, মিষ্টি এনে পাশে রাখলেন। এক গ্লাস হরলিক্সও। গান শুনুন, আর মুখ চালান। এতদিন বনে বনে ঘুরে শুধু সৌন্দর্যই উপভোগ করেছেন, পেটে আর কিছু পড়েনি।

—না বৌদি, খুব সেবাযত্নও পেয়েছি। সুন্দরবনের সবটাই বন নয়, আপনাদের কি যে ধারণা। সাধারণ গ্রামের দৃশ্য। বন কেটে এখন বসত হয়ে গেছে।

—সুন্দরবনে সুন্দরীও মেলে! কে এত সেবাযত্ন দিল? ভাগ্যবান মানুষ যে।

—আপনাদের মত বৌদির অভাব? আমার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র এমন সব সোনার চাঁদ বৌদিরা আছেন। সেবা, মায়া ও মমতা কি নেই আপনাদের? আপনারা না থাকলে বিখ্যাত মানুষরা এমন কর্মবীর হতে পারতেন না।

—বেশ ভালো কথা, বলতে শিখেছেন তো! নিন হাত মুখ চালান। আমি রাঁধুনীকে দেখিয়ে দিয়ে আসছি।

কিছু সময় গল্প করে বেলা ন'টা নাগাদ সে বের হল। এস. ডি. ও. অফিসে গিয়ে সরকারী গাড়ী চড়ে দূরের বুথগুলি ঘুরে দেখেন।

বুথেও রাস্তায় জনতা শান্ত। কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটেনি। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে বাসায় চলে এলো সে।

দুপুরে খেতে বসে সুন্দরবনের গল্প বলল। খাবাবের টেবিলে ছোটরাও খেতে বসে গল্প শুনছে।

দীপেনবাবু, গোপেনবাব খেয়ে নিয়ে টি. ভি. দেখছেন। ম্যাজিক-কাকু (দীপক) আসেনি দেখে ছোটরা তাকে অভিযোগ জানালো। ওরা তার কথায় ঠিক মজা পেল না। তখন এক ফন্দি আটল সে। খেয়ে উঠে ওদের বাঘিনী মারার গল্প বলবে ঠিক করল।

খেয়ে উঠেই ছোটদের গল্প বলতে শুরু করল সুদর্শন, শেষ বিকেল। আমি শিবুদা, অনিল, আরও চার পাঁচজন কুমীরমারির পাশ দিয়ে বনে ঢুকলাম। নদীর ধারে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে এগুচ্ছি দূরে একদল হরিণ দেখে শিবুদা শিস দিয়ে আমাদের থামতে বললেন। তার ইঙ্গিতে আমরা গাছে উঠে গেলাম।

শিবুদার হাতে বন্দুক, অনিলের হাতে বল্লম, অন্যদের হাতে তীর-ধনুক, লাঠি ইত্যাদি। অনিল হরিণের মত ডেকে গাছের কচিপাতা ভেঙ্গে নিচে ফেলতে লাগল। কিছু সময়ের মধ্যে একঝাঁক হরিণ এসে হাজির। কচিপাতা পেয়ে খুব খুশি, কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল। কয়েকটা হরিণ ঠিক বড় গরুর মত দেখতে। এমন তাজা ও মসৃণ গাত্রের হরিণ আগে দেখিনি সে। আমরা নিঃশব্দে লক্ষ্য করে যাচ্ছি। একটু শব্দ পেলেই হরিণ পালিয়ে যাবে। বানরের সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব। ওরা বিপদের খবর জানিয়ে দেবে। হরিণের পিঠে চড়ে ওরা বনে ঘুরে বেড়ায় হরিণের গায়ের লোমের মধ্য থেকে পোকা বেছে খায়।

চারিদিক নিঃস্তব্ধ। আমরা নিজেদের হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনছি। একটা পিন পড়লে শোনা যাবে। অধীর আগ্রহ। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। কখন বাঘ দেখতে পাব? কেমন দেখতে হবে? আমরা বিপদে পড়বো না তো?

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আমরা চমকে উঠলাম। একটা বাঘ এসে হরিণের উপর লাফিয়ে পড়ল। এক থাবায় হরিণের ঘাড় ভেঙে

ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম করে শিবুদার বন্দুক গর্জে উঠল। অনিলের বল্লমও পেটের মধ্যে অনেকটা ঢুকে গেছে। বাঘটা লুটিয়ে পড়ল। আমরাও ঝপাঝপ নেমে পড়লাম। আমার তখন হাত পা কাঁপছে। যদি লাফ দিয়ে ঘাড় মটকায়? চোখের সামনে কি ঘটে গেল নিমেষে? নতুন অভিজ্ঞতা।

গায়ে ডোরাকাটা দাগ। হাত বুলিয়ে দেখলাম কি মসৃণ, ঘুমোচ্ছে যেন।

শিবুদা বললেন, বিড়ালের বোনঝি দেখলে তো। এর নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

একজন একজন করে সকলেই চেষ্টা করল কেউ টেনে সরাতে পারল না।

শিবুদা বললেন, এ যে দেখি বাঘিনী।

—আমি বললাম, সুন্দরবনের সুন্দরী।

—সত্যি তাই। এত সুন্দর বাঘ খুব কম দেখা যায়। চল, কেটে পড়ি, পুলিশে দেখলে এখনই ধরে নিয়ে যাবে। এখানকার প্রাণী মারা নিষেধ। হরিণটা নিয়ে চল, মাংস খাওয়া যাবে। অনিল কাঁধে চাপিয়ে ডিঙ্গিতে এনে তুলল। আমরা দ্রুত নৌকায় উঠে পড়লাম। ওরা সুন্দরীকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে এল। ওরা গল্পে মজে গেল 'আরেকখানা' বলুন সমস্বরে অনুরোধ করে উঠল ওরা। পরপর তিনটি গল্প বলার পর ছ'বৌ এসে ওদের ঘরে শোয়াতে নিয়ে গেলেন। সুদর্শন বৈঠকখানার ঘরে শুয়ে বই পড়তে পড়তে ভাব রাজ্যে ডুবে গেল।

বিকালে উঠে বলল, বৌদি সন্ধ্যার মুখে কলকাতা চলে যাবো। কতদিন মাকে দেখি না। ভোট তো শেষ। আমার ডিউটিও শেষ। কাল পত্রিকায় দেখবেন আমার লেখা, 'বসিরহাটের ভোট নির্বিঘ্নে শেষ হল। জনসমর্থন বামফ্রন্টের দিকে যাবে' এই শিরোনামে বের হবে।

—ছুই বৌ বলে উঠলেন, আজ কেন? কাল সকালে যাবেন রাতে একটু গল্প করা যাবে।

— পূজোয় আসবো। আপনাদের মত সুন্দরী ও শিক্ষিতা বৌদিকে কি ভোলা যায়? মায়ের মত সেবা যত্ন পেয়েছি।

—কি যে বলেন ও এবার বৌ নিয়ে আসবেন। আমার বোনকে দেখতে পারেন। বি এ. পাশ, গান বাজনা জানে। সুন্দরী, স্মার্ট। জামসেদপুরের মেয়ে।

—মা কে বলবো সময় মত।

গল্পে গল্পে বেলা শেষ! শেষ বিকেলে ডি ল্যাক্স বাসে সিট ধরার জন্য আগে ভাগে বেরিয়ে পড়ল সে।

পোষ্ট অফিসের বাস স্ট্যাণ্ড। ইটিণ্ডাঘাট রোড। বিপরীত পাশে ইছামতী নদী। এ নদী ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী। অদূরে এ. ডি. ও-র বাংলো। শিশু উদ্যান কাছেই।

বাসস্ট্যাণ্ডে তেমন ভিড় নেই। উঠেই ভাল সিট দেখে জানালার পাশে বসে। ত্রিমেনী আসতেই ঠেলাঠেলি করে এক গাদা লোক উঠতেই অস্বস্তি বোধ করল সে। বাসের বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। চুপচাপ চোখ বুজে থাকে। গত ক'দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকে সে।

সুদর্শন কলকাতা এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মাকে দেখে খুশি হল খুব। কলকাতা মোহময়ী শহর। দূরে গেলেই শিরার টান অনুভব করে। প্রিয়তমার মত আকর্ষণ এ শহরের।

অনিমা, সুধীরবাবু ও সুভাষের তিনটি চিঠি টেবিলে। অনিমা লিখেছে, সুদর্শনদা আগামী মাসে মন্দিরে উৎসব আছে আসবেন কিন্তু। শ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম জন্মমহোৎসব। মামী চিঠি দিতে বলেছেন। অনেক কথা আছে। চিঠিতে সবকথা লেখা যায় না। আমার লেখার অভ্যাস নেই। বানান ভুল হবে, ভাষা ঠিক থাকে না। না এলে রাগ করবো। পড়াশুনা ভাল হচ্ছে না······।

সুধীরবাবু লিখেছেন, মন্দিরে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান আছে। শ্রীচৈতন্য-দেবের পঞ্চশত বার্ষিকী উৎসব হবে। সাতাশে আগষ্ট জন্মাষ্টমীর দিন অনুষ্ঠান। আগের দিন চলে আসবেন। সঙ্গে ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্যকে

আনবেন। আপনাকে কিছু বলতে হবে। অন্যথা করবেন না। চিঠিতে নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করবেন। পারলে অজিতবাবুকে আনবেন। খবরটা পেপারে দেবেন।

সুভাষ লিখেছে—আপনার জন্মাষ্টমীতে আসা চাই। সুধীরদা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাচ্ছেন। এদিকে অনিমা রোজ রোজ আমার বাসায় আসে। নিবেদিতার সঙ্গে গল্প করে আপনার কথা জানতে চায়। ওর এখন কানু ছাড়া গীত নেই। অন্ততঃ ওর কথা ভেবে আসবেন ।

সুদর্শন অনিমার চিঠিটা পুনরায় পড়ে টেবিলে নীল রংয়ের পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল। মন খুশিতে ভরে ওঠে। কিসের যেন একটা বিরহ বেদনা মোচড় দিয়ে উঠছে। অবসর সময় কত কথা মনে দোলা দেয়। ঐ অঞ্চলের মানুষদের সুখ দুঃখের কথা ভাবতে থাকে সে

গড়িয়ার অনিল দাস, দমদমের সুখময় গাংগুলি ও দত্তবাগানের ব্যানার্জীদা তার সঙ্গে যাবে। ওদের বহু দিনের ইচ্ছে। সঙ্গীর অভাবে যেতে পারছে না। তার সঙ্গ চান ওরা। কৃতজ্ঞ থাকবে।

পরদিন অনিমাকে চিঠি লিখতে বসল। 'শতবর্ষের প্রেমের কবিতা' বইতে যুৎসই লাইন দাগিয়ে রেখেছে। এক একটা চিঠিতে এক একটা কোটেশান লিখবে।

চিঠি লেখা যখন অর্ধপথে তখন সুকন্যা এসে হাজির। কি আমাদের বাসায় গেলে না যে?

—সময় হয়নি। খুব পরিশ্রম গেছে। ক'দিন ভাল ঘুম হয়নি। দাদা বৌদির খবর কি?

—তুমি এতদিন বাইরে ছিলে। আমিও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারিনি আর কখনও দূরে যাবে না।

—কাজ থাকলে যেতে হবেই। তোমার মার খবর কি!

—তোমাকে যেতে বলেছে। আমার জন্মদিন সামনে।

—ভালোই তো। ভালো আয়োজন করবে পেট ভরে খেয়ে আসবো।

—আর কিছু না? অভিমানী সুর।

—জানিনা। সুদর্শন চিঠিটা সরিয়ে রেখেছে। মন জুড়ে এখন শুধু অনিমা। সুকন্যার উপস্থিতি ভাল লাগছে না। ও চলে গেল যেন স্বস্তি পায়।

যেমনি কোন আশাব্যঞ্জক কথা না শুনে সুকন্যা মনে মনে রেগে যায়। বোকার মত বলে ফেলে, তুমি আজকাল অন্য একজনকে মনে ধরেছো। তাই আমাকে পাত্তা দিচ্ছ না।

—ভুল করছো, আমি কোন দিনই মাখামাখি করিনি। তুমি নিজেই বাড়াবাড়ি করছো। মা বাবা যা ভাল বুঝবেন করবেন। আমি যতদূর জানি বাবা পছন্দ করবেন না।

ওর চোখ ছলছল করে ওঠে। আর কথা বাড়ায় না। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে।

সুদর্শন আবার চিঠিটা টেনে নেয়, ভাষা দিয়ে কাব্য করে তিন-পৃষ্ঠা লিখল। বার দুই পড়ে মনে মনে হাসল ক্ষনিক। শেষে মন থেকে সুকন্যাকে ঝেড়ে ফেলে। গোসাবার সুধীরদা বলেছেন, স্ত্রী মনের বৃত্যানুসারী না হলে, সুপ্রজনন বিধি না মানলে, সুসন্তানের জন্ম হয় না। শাস্ত্রীয় অনুশাসন এ বিষয়ে কঠোর। অনুলোম বিয়ে শাস্ত্রীয় প্রতিলোম বিয়ে সমাজ ও বংশ নাশ করে—সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়।

পরদিন পত্রিকা অফিসে যেতেই নিউজ এডিটর ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার লেখা পাঠকরা খুব নিয়েছে। সম্পাদক তোমার প্রসংসায় পঞ্চমুখ। এবার তোমাকে নতুন স্থানে পাঠাবো সুন্দর-বনের মধ্যেই পড়ে, তবে খুব উন্নত জায়গা। চক্রতীর্থ, নিমপীঠের ওপর দু'টো ফিচার করবে। আজকাল পাঠক ফিচার চায়। নতুন নতুন ফিচার করবে। অজিতবাবুকে অন্য জায়গায় পাঠাচ্ছি। তুমি অন্য কোন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে যাবে। এ্যাডভান্স কিছু টাকা নিয়ে যাবে।

—কি ভাবে যাবো? থাকবো কোথায়? কোন্ রুটে পড়বে?

—লক্ষীকান্তপুর লাইনের ট্রেনে উঠবে। শিয়ালদা সাউথ থেকে ছাড়ে। জয়নগর—মজিলপুর স্টেশানে নেমে রিক্সায় নিমপীঠ আশ্রমে

উঠবে। আমি স্বামী বুদ্ধানন্দজীকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। পরদিন ঐখান থেকে স্টেশানের কাছে বাস ধরে চক্রতীর্থে যাবে। আমার বন্ধু আছে। ওরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। একটা অনুষ্ঠান আছে। আমাকে বহুবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি। নিউজটা করবে।

সুদর্শনের মন নেচে উঠল। আবার নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। ওর মা শুনে বলল, তোর কাজ কি শুধু পাখির মত উড়ে বেড়ানো। আর দেরী করব না। এবার বিয়ে দেবো। আমি আর সংসার সামলাতে পারছি না।

সুদর্শন খানিক হাসল। মনে বিয়ের ইচ্ছে আছে ষোল আনা। তবুও হেসে বলল,মা বৌ আনলেই তো শাশুড়ী বৌর দ্বন্দ্ব, নালিশ শুরু হবে। ঘরে ঘরে এই তো দেখছি। তার চেয়ে এই তো ভালো।

—তেমন মেয়ে আনবি কেন? ঠিকুজি মিলিয়ে আনতে হবে। আমি জ্যোতিষ ঠাকুরকে বলেছি, সুপাত্রীর সন্ধান দিতে। আমি শ্বশুর, শাশুড়ী নিয়ে ঘর করিনি?

দেখতে দেখতে দিন এসে গেল। এটাচি গুছিয়ে, সাইড ব্যাগে কিছু লেবু, আপেল নিয়ে ট্রেনে চেপে বসল একদিন। সংগে বিশ্বনাথ রক্ষিত। ভাল ফটো তোলেন, তাছাড়া ভূগোলের ছাত্র ছিলেন। ধর্মকর্মে অবিশ্বাসী হলেও কথায়, কাজে ভদ্রলোক। মথুরাপুর নেমে একঘণ্টা বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ট্রেনেও ছিল প্রচণ্ড ভিড়। কলকাতা থেকে রায়দীঘি পর্য্যন্ত স্টেটবাস চলে। এখান থেকে যে বাস ডায়মণ্ডহারবার যায় তা অনিয়মিত। ভিড়ও হয় খুব।

সত্যি তাই। বাস যখন এল তখন ভয়ে সুদর্শনের পা স্থির। বিশ্বনাথ বলল আমি ঠ্যালা দিয়ে জায়গা করে দিচ্ছি। তুই পিছু পিছু উঠবি। উঠলেই ঠিক হয়ে যাবে। পরের বাস কখন আসবে কে জানে। তাছাড়া সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

ওদের খুব বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। আধঘণ্টার মধ্যেই কাশীপুর নেমে পড়ল। বাসস্ট্যাণ্ডের পাশে কিছু দোকান পাট আছে।

একজন দোকানীকে ঠিকানাটি দেখাতেই বলল, সামনের ইঁট বিছানো পথ ধরে হাঁটবেন, দশ মিনিট পরই পেয়ে যাবেন।

সত্যি তাই। স্বপণ প্রামানিকের বিশাল বাড়ী। দূর থেকে স্কুল ঘর বলে মনে হয়। বাড়ীর সামনে বিরাট তোরণ, লোকজন, কীর্ত্তনের দল। বারান্দা ভর্তি লোক।

সুদর্শন সামান্য খুঁজেই ওর দেখা পেল। জড়িয়ে ধরে বললেন, কি সৌভাগ্য, আপনি আসবেন আমি খবর পেয়েছি।

হাঁক ডাক দিয়ে একটা ঘর থেকে সকলকে বের করে দিয়ে বললেন এই খাটে আপনি, পাশের খাটে আপনার বন্ধু থাকবেন। বাড়ীভর্তি লোক। সব সময় খোঁজ নিতে পারব না, যত্নের ত্রুটি হবে। ক্ষমা করে নেবেন।

স্বপনবাবু স্পষ্ট কথা বলার মানুষ। প্যাঁচ নেই। সুদর্শন, বিশ্বনাথ ব্যাগপত্র নামিয়ে বসল। চা-বিস্কুট এল। হাত পা না ধুয়েই বিশ্বনাথ খেতে শুরু করল। সুদর্শন একটা মেয়েকে দিয়ে জল আনিয়ে চোখে মুখে দিয়ে, তবে খেল।

চারদিকে হৈচৈ। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগল না ওদের। দু'জনেই মন্দিরের দিকে গেল। বিরাট প্যাণ্ডেল। তারমধ্যেও প্রচুর লোক। দূরদূরান্ত থেকে এসেছে। প্যাণ্ডেলের পাশেই দু'টো মন্দিরের পেছনে বড় পুকুর, কাছেই শ্মশান। হাঁটতে হাঁটতে ওরা শ্মশানের গেটের মুখে দাঁড়ালো। অসংখ্য ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বলছে। চতুর্দ্দিকে ঘন অন্ধকার। ভেতরে গেল না সুদর্শনরা।

ডায়নামো চালিয়ে ভদ্রলোক বাড়ী ও প্যাণ্ডেল আলোকজ্জ্বল করেছেন। আজও এদিকে বিদ্যুৎ আসেনি। একজন বলল, এক সময় এদিকে গংগা বইতো, এখন দূরে সরে গিয়েছে। বড় বড় পুকুর নদীর জল ধরে রেখেছে। নোনা জল। এস্থানটা খুব জাগ্রত। ভগীরথ, চৈতন্যদেব, পরশুরাম, কল্কি অবতার এখানে পদধূলি দিয়েছেন। এই পুকুরে পুণ্যার্থীরা স্নান করেন। প্রতিবৎসর এসময় এখানে বড় নাম সংকীর্তন হয় আর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। আগামীকাল

হাজার দশেক লোক যোগ দেবে। ঘরে এসে দেখে, মেঝের এক পাশে শতরঞ্চ বিছিয়ে কয়েকজন খোশ মেজাজে গল্প করছেন। এসময় গৃহ-স্বামী ওঘরে ঢুকলেন। সুদর্শনের পরিচয় বলতেই ওরা সমস্বরে 'জয়গুরু' 'হরেকৃষ্ণ' রাধাগোবিন্দ' বলে অভিনন্দন জানালেন। তারপর নিজেদের পরিচয় দিলেন একে একে। তারকেশ মিশ্র, প্রধান শিক্ষক। সাগরদ্বীপে বাড়ী। দুর্গাপদ মিশ্র, ওর ভাইপো। শিক্ষক রাজকৃষ্ণ মাইতির বাড়ী নামখানায়, অনুকূল মণ্ডল, চতুর্ভূজ ভূইয়াঁ এ মন্দিরের তত্বাবধান করেন। এদের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অর্থ সাহায্যে মন্দিরটি হয়েছে।

সুদর্শন লজ্জা পেল। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শতরঞ্চির ওপর শোবেন? আর তারা দু'জন খাটে নরম বিছানায় শোবে। ধর্মবোধ ওদের বৈষ্ণবীয় গুণ ফিরেছে। সুদর্শনদের পক্ষে এ অসম্ভব ছিল। অহংএ লাগত মাটিতে বিছানা করে শুত।

পরিচয় পর্বের পর আলাপ জমাতেই সুদর্শন ওদের ঠিকানা লিখে রাখল। সময় মত কাজে লাগবে। সুধীরবাবু মন্দিরে তাঁর গুরুদেবের বাণী লিখে রেখেছেন—'মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর,। কথাটার তাৎপর্য এখন বুঝল সে।

খেয়ে শুতে রাত হয়ে যায়। বারান্দায় ঘরে আলো জ্বলছে গভীর রাতেও একদল কীর্তন শুরু করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে সুদর্শনের ঘুম এল না। বিশ্বনাথ বালিশে মাথা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। পাথর প্রতিমার এল-প্লটের রোগা লিকলিকে মানুষ চতুর্ভূজ মাইতি। তাল পাতার সেপাইর মত মানুষ কি করে যে এতগুলি ভি. আই পির খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এত সেবা ত্রাণ কি করে হলেন? এত এনার্জি কোথায় আছেন? সাধারণ লোকরা উঠোনে খিঁচুড়ি খেতে বসলে সেখানেও সারাক্ষণ জল, নুন, পাতা এগিয়ে দিয়েছেন। শুতে শুতে এমনি সব কথা ভাবতে থাকে সুদর্শন।

রাতে আলাপ করতে এলেন মজিলপুরের ঘনশ্যাম বিশ্বাস, শ্রীকণ্ঠ মাইতি, গোকর্ণীর তপন মণ্ডল, সুদেব পুরকায়েত, কুলপীর ধনঞ্জয়

চক্রবর্তী, জেঠিবাজারের পুলিন কামিল্যা, স্বাগরদীপের পশুপতি মাইতি প্রমুখ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকার সমস্যার কথা বললেন, আমন্ত্রণ জানালেন।

সুদর্শন শুয়ে শুয়ে এদের কথা ভাবতে থাকে। মানুষের কত অভাব, অভিযোগ কথা জমে আছে তার ডায়েরীতে। তার এক এক সময় মনে হয় চাকুরী করতে না হলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর 'গণদেবতা"র মত একটা বই লিখত।

সাত সকালে মাঙ্গলিক সানাই বাজার পর সমবেত প্রার্থনা শুরু হল। বেদ, গীতা পাঠ হল। সে বিছানা ছাড়ল না। বিশ্বনাথ রাস্তায় বেরিয়ে দাঁতন করছে। ঘুমঘুম ভাবটা না গেলে সে ওঠে না।

এল-প্লটের দাদা এসে জিগ্যেস করলেন, কি দাদা ঘুম হল ? রাতে কষ্ট পেয়েছেন খুব। উঠুন। চা-টিফিন আনছি।

সুদর্শন মিথ্যা বলল, ঘুম হয়েছে। এত সেবাযত্নের পর সত্যি কথা বললে হয়ত দুঃখ পাবে।

মিশ্রবাবুরা ব্রাহ্ম মুহূর্তে ওটেন। ওরা ঘরে নেই। সুদর্শন যখন উঠল মাইকে তখন অনুষ্ঠানের ঘোষণা চলছে। সকালে কীর্তন হবে। বিকালে আলোচনা, বক্তৃতা, ভক্তিমূলক সংগীত।

প্রাতকৃত্য সেরে অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তৈরী হল দু'জন। ক্যামেরার পেটে ফিল্ম পুরে যখন ওরা প্যাণ্ডেলের কাছে গেল তখন মজিলপুর থেকে কয়েক হাজার লোক 'হরেকৃষ্ণ' গান করে নাচতে নাচতে নগর পরিক্রমা করে এল। খুব ডিসিপ্লিন ভাবে এসে প্যাণ্ডেলে বসে পড়ল।

বিভূতি বাবু সুদর্শনের হাত ধরে স্টেজে নিয়ে গেলেন। বিশ্বনাথ মন্দির ও স্টেজের ছবি তুলে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মিশ্র বাবুদের সঙ্গে নেমে এল সুদর্শন।

সনৎ হালদার আলাপ করতে এগিয়ে এল। সুন্দর স্বাস্থ্যবান। যুবক সাহিত্য চর্চা করে। ডায়মণ্ডহারবারে বাড়ী হলেও ব্যবসার জন্য এখানে থাকতে হয়। ছেলেটি বলল চলুন লাইব্রেরীটা দেখে

আসবেন। আরও বড় মন্দির আছে। খুব প্রাচীন। চলুন দেখাবো।

অদূরে এক বিশাল বটগাছ, তলায় ছোট ছোট তিনটা মন্দির, একপার্শ্বে পুকুর। বৈশাখ মাসে বড় মেলা হয়।

বটগাছ ছাড়িয়ে বাঁ দিকে কিছুদূর গিয়ে আর একটা মন্দির। মন্দিরের সামনে নাটমঞ্চ, মাঠ, পার্শ্বে পুকুর। বকুল, চাপা, নাম না জানা গাছ। খুব সুন্দর পরিবেশ। আগে জমিদাররা দেখাশুনা করতেন। এখন পুরুহিতের দখলে। চৈত্রমাসে শিবঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে বড় মেলা হয়। খুব জাগ্রত দেবতা। ভক্তরা বকুল গাছের গোড়ায় ঢিল মানত করে ঝুলিয়ে রেখেছে। গাছের গোড়া দেখা যায় না। কি অন্ধ বিশ্বাস।

কিছু সময় ঘুরে ফিরে ছবি তুলে ফিরে এল ওরা। পথের পাশেই লাইব্রেরী। লাইব্রেরীয়ান দাঁড়িয়ে ছিলেন সনতের চেনা লোক। ডেকে ভেতরে বসালেন।

লাইব্রেরীয়ান বললেন, সরকার আমাদের বেতন, ডি. এ বাড়িয়ে মর্যাদা দিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। তবে ঘর সংস্কার করার কোন অর্থ মঞ্জুর হয়নি। টালির চালা দিয়ে জল পড়ে, রোদ ঢোকে। ভাল আলমারির অভাবে বহু বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

লাইব্রেরীয়ান সংবাদে তার নাম লিখতে বারণ করলেন। একে সরকারী কর্মী, তার উপর বাম ফ্রন্টের সক্রিয় সভ্য। সুদর্শন ঘুরে ঘুরে আলমারি, ঘর দেখে বাইরে এল।

বেলা তখন এগারোটা। রোদ চনমন করছে। ঘরে এসে স্নানের উদ্যোগ নিল। এমন সময় সুবক্তা নিকুঞ্জ বিহারী মিশ্র ঘরে ডাকলেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন। সুদর্শনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া মাত্র তিনি নমস্কার করে বললেন, আপনাদের মত গুণী মানুষ আমাদের দরকার। খবরের কাগজে ধর্মকর্ম নিয়ে লিখুন। খুন, জখম, বধূহত্যার এত খবরে কাজ কি?

—আপনি বসুন, স্নান করে আসি, এসে গল্প করবো। আপনার

কাছে অনেক জানার আছে। পণ্ডিত মানুষ আপনি। মিশ্রবাবুদের কাছে আপনার কথা শুনেছি।

আর লজ্জা দেবেন না।

সুদর্শন, বিশ্বনাথকে নিয়ে স্নান করতে যায়। পুকুরের জল অপরিস্কার বলে স্নান করতে প্রবৃত্তি হল না। ফিরে এসে বাথরুমে বালতি করে জল তুলে কাক স্নান করল। বিশ্বনাথ পুকুর দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে নিল।

—সুদর্শন ঘরে এসে পাজামা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে নিকুঞ্জ বাবুর সামনে বসে প্রশ্ন করল চক্রতীর্থের মাহাত্ম কি? পুরাণ পড়ার সময় নেই আপনি বলুন।

—পুরাণে চক্রতীর্থের কথা পাওয়া যায়। সত্য যুগের ঘটনা। সগর বংশ উদ্ধার কল্পে মহাসাধক ভগীরথ এই পথ ধরে কপিল মুনির আশ্রমে যাচ্ছিলেন। তখন গঙ্গাদেবী এস্থানে পাতাল প্রবেশ করে অন্তর্হিতা হন। ভগীরথের তপস্যার ফলে পুনরায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ও শ্রীহস্তস্থিত চক্র প্রদর্শন করেন। সেই থেকে 'চক্রতীর্থ' নাম।

জামদগ্ন পুত্র ভৃগু পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা জনিত পাপের অন্তর্দাহে জ্বলছিলেন। সমস্ত তীর্থ ঘুরে এখানে এসে অবগাহন করে পরমস্বস্তি লাভ করেন। সেই থেকে ভৃগু 'নন্দা' তিথি উৎসব পালন করা হয়।

আবার শোনা যায় ত্রেতা যুগে পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র বনবাস কালে এই পুণ্য ভূমি তাঁর শ্রীপাদ স্পর্শে ধন্য হয়েছিল। শ্রীবলরাম তীর্থ পরিক্রমা কালে এই তীর্থে পদার্পণ করেছিলেন। শ্রীমন্ত সওদা-গরের কাহিনী পড়লেও জানা যায় যে তিনি বাণিজ্য করতে এখানে এসেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুরী-যাত্রার এখানে পাপ সমাধিস্থ হয়েছিলেন। আর ১৯১৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ও মহাভাবে সমাধি মগ্ন হয়ে ভাববাণী প্রদান করে ছিলেন।

—এসব সত্যি? আমরা জানিনা কেন? কোন পত্র পত্রিকায় দেখিনি। এত তীর্থের নাম শুনি। অথচ এই তীর্থের নাম কতজন শুনেছেন? এখানে না এলে যে কিছুই জানতাম না।

—আপনারাই তো লিখবেন। লিখুন না ভাল করে মানুষরা জানুক, ছুটে আসুক। পত্র-পত্রিকায় ধর্ম কথার স্থান নেই কেন?

--লিখবো বলেই তো এসেছি। ফটো তুলে নিয়েছি।

বিভূতি সর্দ্দার এসে নিকুঞ্জ বাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাঁর জন্য দোতলায় ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। বিকেলে তার অনুষ্ঠান আছে। তিনি বর্দ্ধমান থেকে এসেছেন। বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিকালে জমজমাট অনুষ্ঠান হল। একঘণ্টা ভক্তিমূলক গানের পর বক্তৃতা শুরু হল। তারকেশ মিশ্র ও নিকুঞ্জ মিশ্র শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন। সুদর্শন মনোযোগ দিয়ে শুনল। কত কি শোনার শিক্ষার আছে। প্রচলিত পূজাপার্বণ আর এদের ধর্মজ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা রাত দশটায় কবিগান শুরু হল।

ঘরে ফিরে সুদর্শন বক্তাদের ধন্যবাদ জানাল। মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যকে বুঝত এবং ঐ পথে চলত তাহলে ধর্মের এত অপব্যাখ্যা হত না। মার্কস, লেনিন, মাও সে-তুং বা জর্জ টমটন প্রতিবাদ করতেন না।

—খেতে শুতে রাত বারোটা। ঘুম যে আজও হবে না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। খাওয়ার আগে ডায়েরী লিখতে বসলে তপন মণ্ডল অনুকুল ঘোষ, সুদেব পুরকায়েত, শ্রীকণ্ঠ মাইতি, দুর্গাপদ মিশ্র স্থানীয় সমস্যাদির আলোচনা করলেন। সুদর্শন লিখে নেয়। তিনজন স্থানীয় শিক্ষক তাদের সকলের গৃহসমস্যা পেন্সান সমস্যা নিয়ে জানালেন।

শুয়ে রাজকৃষ্ণ বাবু বললেন, কাকদ্বীপ মন্দিরে বেড়াতে আসবেন। ভাল লাগবে। ত্রিদিবেশ মিশ্র ও সাগরদ্বীপ নিয়ে লেখার জন্য

অনুরোধ করলেন। তাঁর বাড়ীতে উঠলে খুশী হলেন। এ প্লটের চতুর্ভুজবাবু বললেন পাথর প্রতিমা গেলে আমার বাড়ী উঠবেন। কাকদ্বীপ দিয়ে অনেক ঘোরা পথ নামাখানা দিয়ে শর্টকাট পথ।

সনৎ বলল, চলি দাদা, সকালে আসব। দু'জন তৈরী থাকবেন মোটর সাইকেলে আপনাদের পিঠপীঠ পৌঁছে দেব। মজিলপুরে আমার কিছু কাজ ও আছে।

বিশ্বনাথ শুয়ে আছে। এসব ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই।

শোয়া থাকায় একটু অসুবিধার জন্য গম্ভীর হয়ে আছে।

সুদর্শন মানিয়ে নেয়। গৃহস্বামী নিউজ এডিটারের বন্ধু। বহুবার তিনি হাত জোড় করে ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে বললেন বাড়ী ভর্তি লোক, কি করবো বলুন?

সুদর্শন সকালে লক্ষ্য করেছে বাড়ীর বৌ, মেয়েরাই উঠোন ঝাড়ু দিয়েছে, জল তুলে দিয়েছে, নানা ফাইফরমাস খেটেছে। হাসিখুশি মুখ জীব সেবার বোধ কত প্রবল। মানুষকে কত আপন করে নিয়েছেন এরা।

নিমপীঠে

পরদিন সকালে সনৎ হালদার যখন এলো তখন মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি হবে ভাব। সুদর্শন উঠে দেখে ঘর ফাঁকা, মিশ্রবাবু, মাইতি বাবুরা ও বারান্দার বহু লোক চলে গেছেন বা অনেকে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন।

বিভূতি সরদার আর গৃহস্বামী দু'তলায় মুড়ি, শশা, নারকেল, দু'গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির। বাইরে সনৎ বসে। অনুরোধে খেয়ে নিল। বিদায়ের পূর্বে বারবার অনুরোধ, দেখবেন, খবরটা যেন বের হয়। অন্য এক সময় আসবেন। যত্ন করতে পারলাম না!

সনতের মোটর সাইকেল যখন স্টার্ট দিল তখন সকলের চোখ এদিকে। তিনজন এক গাড়ীতে বড় রাস্তায় পড়তেই ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হল। ভাঙ্গা রাস্তা গর্ত, সতর্ক হয়ে চালাতে হচ্ছে। শর্টকার্ট করার জন্য একটা পাড়ার মধ্য দিয়ে ঢুকল। একটা বাঁশ বাগানের কাছে এসে সনৎ বলল এখানেই উজ্জ্বলকে হত্যা করা হয়েছে। স্থানটা এত নির্জন যে দিনেও গা ছমছম করে ওঠে।

বাগান ছেড়ে আবার বড় রাস্তায় উঠল। জয়নগর মজিলপুর স্টেশানের কাছাকাছি এলে আরও জোরে বৃষ্টি নামল গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে রেল লাইন ক্রস করে একটা মন্দিরের নাটমঞ্চের পাশে দাঁড়াল সনৎ।

সনৎ বলল, বহু বছরের পুরানো মন্দির এটি। একে 'রায়বেশে কালীমন্দির' বলে। বৈশাখে বড় মেলা হয়। পনেরো দিন ধরে উৎসব চলে। প্রতিদিন মূর্তিটিকে নতুন পোষাকে সাজানো হয়।

বৃষ্টি থামলে বিশ্বনাথ ছবি তুলে নেয়। পুনরায় যাত্রা শুরু। রাস্তা আরও খারাপ। ঝাঁকুনি খেতে খেতে নিমপীঠ মন্দিরের সামনে এসে নেমে পড়ে। রাস্তার ওপর থেকে কি সুন্দর দেখায়। গাড়ীটা

ভেতরে এনে বাগানের পাশে রেখে সনৎ মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। সুদর্শনরা পেছনে পেছনে। খুব উঁচু মন্দির।

বিশাল চত্বর পেরিয়ে মূল মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কালীমূর্তি, রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি দেখল। মন্দিরের পেছনে ফলের বাগান। মন্দিরে প্রণাম সেরে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বুদ্ধানন্দজীর মুখোমুখি হলো পাশের চেয়ারে উনি বসতে বসলেন। সুদর্শন এমন একজন ভক্ত প্রাণ, দিব্যদেহধারী, কর্মবীরের পাশে চেয়ারে বসতে সংকোচ বোধ করছিল। দ্বিতীয়বার বলার পর তবে বসল।

সংগে সংগে সহকারী ব্রহ্মচারীজীকে ডাকলেন। বললেন – এদের নিয়ে যাও, চা টিফিন দাও। সুদর্শন সম্পাদকের চিঠিটা হাতে দেয় পড়ে বললেন, তুমি সাংবাদিক, বেশ বেশ, দেখো সব তাঁরই কৃপা। ঘুরে এসো, পরে কথা বলব। আর একজন তরুণ ব্রহ্মচারীকে বললেন ব্যাগ পত্র গেস্ট হাউসের তিন নম্বর রুমে নিয়ে যাও। আজ ওরা থাকবেন।

মধুর ব্যবহার। নরম সুর। সুদর্শন খুশি হলো। এইতো প্রকৃত ধর্মের মহিমা। খাঁটি বৈষ্ণবের লক্ষণ।

ব্রহ্মচারীজী ডাইনিং রুমে নিয়ে এদের বসালেন। বসতে না বসতে দু'জন ব্রহ্মচারী মুড়ি বাদাম, পেঁপে, সবেদা নিয়ে এলেন। চা, কফি কোনটা খাবে জিগ্যেস করায়, সুদর্শন খাবে না বলল সনৎ ও বিশ্বনাথ কফি তুলে নিল।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন ব্রহ্মচারীরা এত বড় সবেদা খুব কমই দেখা যায়। বড় সাইজের কদ বেলের মত। সুদর্শন আরও দু'টো চেয়ে নিল।

শুধু এরাই নয় ঘর ভর্তি কত দর্শক সকলকেই উনি চা পানে আপ্যায়ন করছেন। আতিথেয়তায়, সেবায় মুগ্ধ করে দেয়। ধর্ম এখানে। মূর্ত সার্থক হয়ে উঠেছে।

ঢাকা, দিল্লী ও বোম্বে থেকেও কেউ কেউ ফ্যামিলি নিয়েও এসেছিল। গেস্ট হাউস ভর্তি লোক।

একটা মনোরম পরিবেশ।

দেশ বিদেশের কত মানুষ এখানে এসেছেন। ভবিষ্যতে ও আসবেন। এমনই আকর্ষণীয় স্থান। ঘুরে ঘুরে ডেয়ারী, পোলট্রি, ফিশারী, কৃষি খামার, সুপার মার্কেট, স্কুল, খেলার মাঠ, সমবায় কেন্দ্র আদিবাসীদের ছাত্রাবাস ইত্যাদি দেখল সুদর্শন।

বুদ্ধানন্দজীর কাছে এসে সুদর্শন বলল এলাহি, ব্যাপার। জনজীবনে একটা ছাপ রেখে গেলেন। ঘুরে ঘুরে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, পাঠাগার, কিশোরী, ডেয়ারী ফার্ম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইন্দিরাগান্ধী মেমোরিয়াল হল দেখলাম।

— গুরুর কৃপাহি কেবলম্। পঙ্গুকে গিরিলংঘন করাচ্ছেন তিনি। তোমারও তাঁর স্মরণ নাও। কিছু হবে। অহংকার রাখবে না। খুব সরল প্রকৃতির হবে, তবেই কৃপা লাভ ঘটবে।

'তুমি' বলায় সুদর্শন খুশী হল। বিশ্বনাথ এক ফাঁকে ছবি তুলে নেয় এখানকার অনেক ছবি তুললাম। পত্রিকায় বের হবে। আপনার নিজের কথা কিছু বলুন। সুদর্শন কৌতূহল প্রকাশ করল।

আমার প্রচার চাই না। তখনকার কাজকর্ম নিয়ে লেখ। লোকে উৎসাহী হোক। ধর্ম মানে শুধু পূজা অর্চনা আর দলাদলি নয়। এই পুস্তিকাটি পড়বে। এখানকার কাজ কর্মের তথ্যাদি পাবে। আগামী মে মাসে সিলবার জুবলি উৎসব। এসো। রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী, আসবেন। তোমার সম্পাদককে একবার ঘুরে যেতে বলবে। নন্দলাল ভট্টাচার্য ও প্রণবেশ চক্রবর্তীদের লেখা বই আমার আছে। ঘুরে যেতে বলবে। যাও বিশ্রাম কর। আমি একটু কাজ সেরে নিচ্ছি।

সুদর্শন প্রণাম সেরে বলল, এই মন্দির, আপনার কর্মযজ্ঞ ও আপনাকে দেখে এক মহৎ প্রেরণা নিয়ে যাচ্ছি। মহৎ ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছি। আমার লেখায় নিশ্চয় তুলে ধরব। কথার শেষে প্রণাম করে ঘরে বলে এল ওরা।

স্নান খাওয়ার পর বিছানায় কিছু সময় নিদ্রাদেবীর কোলে

কাটাল। অনিদ্রা। সকাল থেকে পথে পথে ঘুরেছে সনৎ ঘুম থেকে উঠে সুদর্শনকে জাগিয়ে বলল, আপনারা ঘুমোন, আমি চলে যাই। রাত হলে, বৃষ্টি নামলে অসুবিধায় পড়বো।

আপনারা বিশ্রাম নিন।

ও চলে গেলে বিশ্বনাথ উঠে হাত মুখ ধুয়ে ২৪ পরগনার ম্যাপ বের করে সুন্দর বনের এদিকটায় কোথায় কি আছে সুদর্শনকে বুঝিয়ে দিল। সুদর্শন শুয়ে শুয়ে শুনল। আলস্যে উঠতে চাইল না

—এখান থেকে কি ভাবে কাকদ্বীপ যাওয়া যায়। ঐ দিকটায় ঘুরে আসব।

কাশীনগর, মথুরাপুর দিয়ে বাসে যাব না। দূর পথ, কষ্ট হবে। এখান থেকে ট্রেনে সোনারপুর, সোনারপুর থেকে ট্রেনে ডায়মণ্ড-হাবরার, সেখান থেকে বাসে কাকদ্বীপ। কাল সকাল সকাল বেরিয়ো পড়বো।

বিকালে প্রার্থনা সভায় বসল ত্বজনে। সুললিত কোরাস, শ্রুতি মধুর। আরতি। ভজন শেষ হলে বুদ্ধানন্দজীর ঘরে বসে এখানকার সমস্যা ও কাজ নিয়ে আলোচনা করল। কৈখালি দ্বীপেও আমাদের কিছু কাজ হচ্ছে। ১৯২৫ সালের ১০ই মার্চ পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল উমাশংকরবাবু 'হরিদাস ব্যানার্জী মেমোরিয়াল, হলের উদ্বোধন করেছেন। আমাদের বার্ষিক বিবরণটা নিয়ে যাও। পড়ে দেখো কি কি কাজ হয়েছে। আর অসমাপ্ত কাজের জন্য আরও ৫০ লক্ষ টাকায় আশু প্রয়োজন, সকলের দানেই কোটি কোটি টাকার কাজ হয়েছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে পয়েণ্ট গুলি লিখে নেয়, প্রচুর অর্থের প্রয়োজনের কথা বললেন। নতুন হাসপাতাল নির্মাণ আশুকর্মের তালিকায় আছে। তারপর জোর দিয়ে বললেন—মনে রাখবে পৃথিবীর মধ্যে ভারতে প্রথম মাটি, উদ্ভিজ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। টেকনো-লজি আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করলেও রপ্তানির মত মূল্যবান জিনিস আছে। তা হলো বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও শ্রীশ্রীগীতা। আজ ভারতের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কিছু, ভণ্ড গুরু-গিরি করে ভারতের

মহিমা খর্ব করলেও এ জ্ঞান ভাণ্ডার ম্লান হবে না। সময়কালে মাথা তুলে দাঁড়াবে। চীন, রাশিয়ায় আজ বিবেকানন্দ বলতে অজ্ঞান। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কি কদর। বছরের বেশী সময় চীন রাশিয়াতেই কাটান সুদর্শন খুব সকালে চলে যাবে বলায় স্বামীজি বললেন, আবার এসো। মানুষের সম্পদ হয়ে ওঠ। আজ দেশে ভালো মানুষের বড্ড অভাব। বাঙালীদের কথা ভাবলে দুঃখ হয়।

শুতে যাওয়ার আগে পাশের রুমের এক ভদ্রলোক এসে পরিচয় দিলেন। অবিনাশ বিশ্বাস। ঢাকা থেকে এসেছেন। বৈষ্ণবপন্থী।

—বললেন, পৈতে নেননি কেন? সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বললেন।

—পৈতে? সে তো ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের ব্যাপার? সুদর্শন বলল।

—কে বলল? শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা পৈতা নিতে পারে। এই তো আমিও নিয়েছি।

—ছোট বেলা বাবা ঠাকুরদা দেননি। এখন কি আর হয়?

—আমরা ছোট বেলা চৌধুরীদের পৈতে দেখে ক্ষ্যাপাতাম 'কলির বামুন' বলে।

—এখনও নিতে পারেন, ৭২দিন 'শিশু প্রাজাপাত্য' করতে হবে।

—কি হবে নিয়ে? পণ্ডিত গিরি করার ইচ্ছে নেই।

—কি যে বলেন। পৈতে নিয়ে সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করলে, নিয়ম মেনে চললে অসীম শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, যাকে আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপ দেবেন লেগে যাবে।

তাছাড়া পৈতা নিজের শরীরের বন্ধন ও কোন অপদেবতা, শত্রু সহজে কিছু করতে পারবে না।

সুদর্শন শুনে উড়িয়ে দিল না চৌধুরীরা যা বলে প্রতিবেশীরা তা বিশ্বাস করে। কত সামাজিক অপরাধ করেও চৌধুরীরা মাথা উঁচু করে চলছে। থানা, পঞ্চায়েত, রাজনৈতিক দলের চেলারাও ওদের

খাতির দেখায় সেসব দুঃখের কথা ভাবলে তার মন বিষিয়ে ওঠে। দু'বছর থানা কোর্ট মামলায় কত অর্থ—সময়—শক্তি যে ব্যয় হয়েছে। সে ভগবান কি, না জেনেও ভগবানের কাছে সুবিচারের আশায়, চোখে জল ফেলেছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে আমাদের উপবীতের সঙ্গে তিলক ধারণ করা উচিত। তিলক ধারণ না করেলে সে বৈষ্ণবই হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে এসব কথা আছে।

—আর কি করা। এ জন্মে আর হল না। আমার পক্ষে ৭২ দিন শিশু প্রাজাপত্য ব্রত করা সম্ভব নয়। আজকাল ধর্ম কি আর বহিরঙ্গের কিছু? অন্তরঙ্গের উন্নতি চাই। মানসিক শারীরিক সদাচার চাই।

কাকদ্বীপে

পরদিন সকালে সূর্য্য ওঠার আগেই ছ'জনে উঠে পড়ে। সুদর্শন গত রাতে ডায়েরী লিখে শুয়েছে। এক ঘুমে সকাল। এত ভাল ঘুম অনেকদিন হয়নি ওর। শরীরটাও বেশ ঝর্‌ঝরে হয়েছে। আনন্দে গুণগুণ করে গান গেয়ে ওঠে সুদর্শন।

সোনারপুর নেমে আধঘণ্টা বসে থাকে। ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনে উঠে জানালার পাশে বসে। এক ঘণ্টা পর ডায়মণ্ডহারবারে নেমে বাস স্ট্যাণ্ডে আবার আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল ওদের। স্টেট বাসের দেরী দেখে ওরা লোকাল বাসেই চেপে বসল। ডায়মণ্ডহারবারের রোডে হু হু করে বাস ছুটে চলে ফাঁকা রাস্তা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সৎসঙ্গ বিহারের সামনে নামল বা, রাস্তার পাশেই মন্দির, গেষ্ট হাউস। গেটম্যান গেট খুলে দিলে ওরা সোজা গেষ্ট হাউসের দিকে যায়।

ঘরের মাঝামাঝি এক বৃদ্ধ বসে, একটি ছেলে বলল, উনিই দেখাশোনা করেন, প্রধান ঋত্বিক সতীশচন্দ্র পাল। খুব ভালো মানুষ।

সুদর্শন নাম বলতেই উনি নমস্কার জানালেন. পাশের ঘর থেকে রাজকৃষ্ণ মাইতিকে ডাকলেন, মাইতিবাবু গেস্ট রুম খুলে বিছানাপত্র ঠিক করে দিলেন। আলো ঝলমল, পরিচ্ছন্ন ঘর। বড় এলাকা নিয়ে বিহার। মন্দিরের পাশে বিশাল পুকুর।

একটি কিশোরী এসে বলল, আপনাকে দাদা ডাকছেন।

—দাদা কে? সুদর্শন প্রশ্ন করল মাইতি বাবুকে।

—এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। আপনার সঙ্গে চক্রতীর্থে তাড়কেশদার পরিচয় হয়েছিল, তার ভাই অলকেশ মিশ্র। চা খেতে ডাকছেন। আলাপ করে দেখুন। ভালোমানুষ।

অলকেশ মিশ্র বেটে খাটো মানুষ। খুব ফর্সা রঙ। মাঝারি স্বাস্থ্য। চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে চিঠির খাম খুলছেন আর চিঠিপত্র জমে গেছে। আসতে পথে খুব কষ্ট হলো? বসুন। অলকেশ বাবুর মধুর আলাপ।

—না একটু কষ্ট করার অভ্যাস আছে। আপনার নাম খুব শুনেছি বড় মানুষ আপনি।

আপনার নাম ও শুনেছি। আমার গুরু ভাইয়ের খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে। ওরা বলেছেন খাঁটি মানুষ। গোসাবা থেকে সুধীরদা আপনার সম্পর্কে লিখেছেন। ওখানে নাকি আপনি খুব ফিল্ড করে নিয়েছেন।

আপনার মন্দির গড়ার কথা বলুন। এতবড় ব্যাপার কি করে করলেন।

ওঁর স্ত্রী পেঁপে, শশা কেটে হু'টো প্লেটে দিয়ে বললেন নিন খান। ভাত খেতে বেলা হবে। হু'গ্লাস ভিভা করে দিচ্ছি। এত বেলায় চা আর দেব না। তোমাকেও দেব নাকি? স্বামীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

—এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? তুমি একে চেন? বড় সাংবাদিক, লেখক। গুরুদেবের কাঙ্খিত মানুষ।

তাঁর স্ত্রীর গায়ে ব্লাউজ নেই। সাবেকী বৌদের মত লাল পেড়ে মোটা শাড়ী পরনে। মিষ্টি মুখ, লক্ষ্মী লক্ষ্মী ভাব। হু'জনকে মানিয়েছে ভালো। আপনারা সাগর দ্বীপ ছেড়ে এখানে থাকেন কেন?

—থাকতে হয়। সব সময় লোকজন আসছেন। দেওঘরের ঠাকুর ফ্যামিলির লোকরাও আসেন। পেছনের মাঠে পাকা প্যাণ্ডেল হবে, পুকুরের পেছনে রান্নার ঘর উঠবে। বৈহ্যুতিক উনুন হবে। ঐ জমি নিয়ে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দর কষাকষি চলছে। দেখা যাক।

ওর স্ত্রী বললেন, মানুষ টাকা দিচ্ছে, সংগ্রহ করার লোক নেই।

গ্রামের জমি বিক্রী করে যখন মন্দিরের জন্য এ জমি কিনলাম, তখন অজস্র সাহায্য আসতে লাগল। মাত্র তিন মাসে মন্দির, গেস্ট হাউস তৈরী হয়েছে তিন সপ্তাহে। সাধারণ মানুষরাই টাকা দিয়েছেন।

অলকেশ বাবু বলছেন, কাকদ্বীপ থেকে সোনারপুর, পাথর প্রতিমা নামখানা, ও সাগরদ্বীপ থেকে বেশী টাকা সংগ্রহ হয়েছে। অন্যান্য বহুস্থান থেকে ও অর্থ সাহায্য পেয়েছি। নিজেদের কাজ ভেবে দিয়েছেন ওরা।

—কিছু মনে করবেন না আপনাদের অনেক গুরু ভাইকে দেখেছি নিরামিস খেয়ে, তাঁর নাম প্রচার করেও হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ ত্যাগ করতে পারেননি। এ ধরণের শিষ্য তো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক তাছাড়া এদের দেখলে ভালোমানুষরা আপনাদের ছায়াও মাড়াবেন না। অনেকে এজন্য গুরু বাদ বা ধর্মকে শ্রদ্ধা করবেন না।

—এলোমেলো জীবন যাপন করতেন এমন বহু মানুষ তাঁর চরণ তলে আশ্রয় নিয়েছেন। সহজে কি এরা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে এটুকু সদাচার, ইস্টকর্ম করার সুযোগ না পেলে এরা সমাজের আরও ক্ষতি করত।

সুদর্শন তাঁর যুক্তি মেনে নেয়। রাজনৈতিক দলে, ক্লাবে, বিভিন্ন সংস্থায় অযোগ্য লোককেও সুযোগ দেওয়া হয়।

উনি বলতে থাকেন, গুরুদেবের সংস্পর্শে এসে বহু মানুষের চিত্ত শুদ্ধি, আত্ম শুদ্ধি ঘটেছে। মানুষ যাতে সৎ, সুন্দর ও সুন্দরতর হয়ে ওঠে তার বিধান তিনি দিয়ে গেছেন। সুদর্শন তাকিয়ে দেখে ঘরে দেয়ালে গুরুদেবের নানা বয়সের ছবি। এরা গুরুদেব ছাড়া পৃথিবীর আর কোন মানুষকে এত বড় করে দেখেন না। গুরুত্ব দেন না।

বিশ্বনাথ বেশীক্ষণ ঘরে থাকল না। একস্থানে সে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না? ক্যামেরা নিয়ে কয়েকটা ছবি তুলে ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

সুদর্শন বসে গল্প করে। অলকেশ বাবু তাঁর স্ত্রীর কঠিন ব্যধির থেকে মুক্তি লাভ, নিজের জীবনে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া

আরও কত কথা বলেন, মন্দির হল মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। মন্দির থেকে প্রচার হয় দেব মহিমা। গীর্জা, মসজিদের ও একই ভূমিকা আজকাল ধর্মস্থানগুলিও রাজনীতির আখ্‌ড়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পুষ্ট একশ্রেণীর মুক্তপ্রাণ ভক্ত শিষ্য থাকবেন। তাঁরই ধর্ম-আদর্শ-সংস্কৃতি, আর্য মহিমা প্রচার করবেন। ইস্কন ও পৃথিবীর দেশে দেশে এজন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন। লস এঞ্জেলসের মন্দিরে বেদ শিক্ষা, সংস্কৃত শিক্ষা, চাষবাস, ভারতীয় আর্যবিধি শেখানো হচ্ছে। আপনি আমার চেয়ে বেশীই জানেন। স্থানীয় মানুষদের রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও চাষবাস সম্পর্কে নানা খবর বললেন তিনি। সে ঘরে এল কিছুক্ষণ পর।

ওরা ঘর সংলগ্ন বাথরুমে স্নান না করে পুকুরে স্নান করতে এল। বিশ্বনাথ জলে নেমে সুদর্শন মগ কেটে স্নান করল। এতবড় গভীর পুকুর দেখে গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল সুদর্শনের।

দুপুরে খেয়েদেয়ে পালবাবু, মাইতিবাবুর সঙ্গে গল্প করল ওরা। মাইতিবাবু বললেন, গরীবের বাড়ী নামখানায়। একদিন পদধূলি দেবেন। আমাকে এখানে নয়ত গ্রামের বাড়ীতে পাবেন। চাষ-বাসের সময় গ্রামে বেশী সময় থাকি। অন্য সময় মন্দিরের জন্য অর্থ, চাল, ডাল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকি।

ভালো বই বের হলে জানাবেন। সুদর্শনকে উদ্দেশ্য করে পালবাবু বললেন পালবাবুর বাড়ী ডায়মণ্ডহারবারে। দীর্ঘকাল দেওঘরে ছিলেন এখন বৃদ্ধবয়সে এখানে থাকছেন। অলকেশবাবুর সহযোগী কর্মী হিসাবে।

তারপর সুদর্শন শুয়ে শুয়ে এঁদের কথা ভাবে। বিশেষতঃ কর্মবীর অলকেশবাবু তাঁকে উৎসাহী করে তুলেছে। দুপুরে ঘুমের পর বিকেলে ঘুরে ঘুরে বাগান মন্দির পুকুর ঘাটে মাছের খেলা দেখল। জলের মধ্যে মুড়ি ফেললে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভেসে উঠে মুড়ি গিলতে থাকে। সুন্দর দৃশ্যটি বিশ্বনাথ ক্যামেরায় বন্দী করল।

সন্ধ্যায় প্রার্থনা। সমবেত সংগীত। তারপর প্রভাত চক্রবর্তী, মুকুন্দদাসের মত পোষাক পরে ছড়ার গান পরিবেশন করেন। ছড়াগুলি অর্থবহ, কণ্ঠস্বর মধুর। বিশ্বনাথ ধর্মকে এড়িয়ে চলে, তবে গান ; ছড়া শুনে মুগ্ধ হয়ে অনুষ্ঠান শেষে দেওয়ালে লেখা বাণীগুলি পড়তে লাগল। সুদর্শন অলকেশবাবুর ঘরে এসে গল্প জুড়ে দিল।

আগামীকাল পাথর প্রতিমায় যেতে চাই, কিভাবে যাবো? আপনার জানাশোনা কেউ আছেন? সুদর্শনের প্রশ্ন।

—বহু লোক জানা শোনা আছে তবে আপনাদের তো আর যেখানে সেখানে রাখা যায় না। পাথর প্রতিমা বাজারে প্রভাতরায়ের ওষুধের দোকান সিনেমা হল আছে।

আমার গুরু ভাই, আমার নাম বলবেন। দেখা না পেলে স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিনোদবিহারী দাশের বাড়ী গিয়ে উঠবেন। ভালোমানুষ। যত্ন পাবেন। ওরাই কুমীর প্রকল্প যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—কখন ভট্‌ভটি ছাড়বে? কোন পথে যাবো। জিজ্ঞাসু হল সে।

—সকালে না খেয়ে যাবেন না। বারোটা নাগাদ জোয়ার আসবে। ঐ সময় নামখানা রোড়ের ব্রীজের কাছ থেকে ভট্‌ভটি পাবেন। চার পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। নদী এখন শুকিয়ে খাল হয়ে গেছে জলও কম।

সুদর্শন কয়েজনের নাম ঠিকানা লিখে নেয়।

—আপনি কয়েকজন সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের এখানে নিয়ে আসবেন। আসার আগে একটা চিঠি দেবেন। আমরা যতদূর পারি যত্ন করব। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের খুব পছন্দ করতেন। তিনিও কত বই লিখে গেছেন। উৎসবে কোন না কোন লেখক বা কবিকে নিয়ে আসা হয়।

সুদর্শন শুধু শুনে যায়। এমন ঘটনা বহুল জীবন যার, হাজার হাজার মানুষ যাকে বিনা দ্বিধায় অর্থ দিতে পারে, যিনি এতবড় কাজ

করতে পারেন তার কথা ধৈর্য্য ধরে শোনা যায়। একটা আশা, ভরসা, প্রেরণা জেগে ওঠে। ওর প্রাণে।

রাতে খেয়ে দেয়ে বিশ্বনাথ পুনরায় ম্যাপ বের করে পথে কোন্ নদী, কোন্ এলাকা পড়বে দেখে নিল। ম্যাপটা বেশ পুরোনো। ফলে বহু নদী নালার নাম নেই ওতে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সুদর্শন অভ্যাস মত ডায়েরী লিখতে বসে। ঝক্‌ঝকে আলোবাতাসে তার মন সতেজ হয়ে ওঠে। গল্প, উপন্যাস লিখতে গেলে এমন পরিবেশই শ্রেয়। সে ছুটি পেলে মাঝে মাঝে এখানে আসবে বলে ভাবে। কিছু অলস চিন্তা ভাবনার পর ও ঘুমিয়ে পড়ে। বিশ্বনাথের এখন প্রায় এক ঘুম হয়ে গেছে। মন্দিরের ও গেস্ট হাউসের সমস্ত ঘর অন্ধকার শুধু মন্দিরের চূড়ান উজ্জ্বল আলোটা চারপাশ আলোকিত করে রেখেছে। সুদর্শন ভাবে এ আলোয় স্পর্শ পেলে মানুষ সুন্দর ও মহৎ হয়ে উঠত।

পাথর প্রতিমা—ভগবৎপুর

সকালে উঠে সুদর্শনরা চারপাশ ঘুরে দেখতে গিয়ে একটা রেষ্টুরেন্টে কচুরি, কাঁচাগোল্লা খেল। এদিক ওদিক কত ঘর বাড়ী রাস্তার দু'পাশে সরকারী অফিস, বড় বড় বাড়ী, পি. ডবলিউ. ডির বাংলো ও ফরেস্ট অফিস। অদূরে দূরে গৌড়ীয় মঠ। বড় রাস্তার দু'পাশে খড়ের খুপড়ির, অসংখ্য ঘর। গরীব বাংলাদেশী, সুন্দরবনের জলাভূমির মাঠ গরীব লোকেরা বাস করছে। ছোট ছোট দোকানও আছে।

একটা রাস্তা নদীর দিকে হারউড পয়েন্টে শেষ হয়েছে। নামখানার বাস ঐ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে লঞ্চ নদী পেরিয়ে সাগরদ্বীপ। এ যাত্রা ওরা আর যাচ্ছে না। ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকল।

শেষে মন্দিরে এসে স্নান, খাওয়া, বিদায়ের পালা সকলের উষ্ণ ভালবাসা। ওরা বিহ্বল হয়ে যায়। তারপর ভ্যানে খেয়া ঘাট ভটভটিতে পাথর প্রতিমা মুখো হল।

ছোট নৌকা খাল পেরিয়ে সপ্তমুখী নদীতে পড়ে। অন্যান্য নিকটবর্তী যাত্রীদের পাথর প্রতিমা, কুমীর প্রকল্প সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে সুদর্শন।

পাশে বসা একটি তরুণের হাতে একটি দৈনিক পত্রিকা। ওর পড়া হয়ে গেলে সুদর্শন চেয়ে নেয়। ছেলেটি বাম পার্টি করে। সুদর্শনের পরিচয় চেয়ে নিয়ে বলে আমাদের গ্রামে আসুন ফ্রণ্টের কাজ দেখবেন। বিরোধীরা সমালোচনা করবেন। তবু বলব গত ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর কংগ্রেস এদিকে কোন কাজ করেননি।

'মন্দির ঘাটায়' ভটভটি দাঁড়ালে সুদর্শন জিগ্যেস করল এ নাম কেন? মন্দির ও টন্দির আছে নাকি? ছেলেটি বলল, এখানে বিশালাক্ষীদেবীর শিব মন্দির আছে। হরিজুর বাজারে রামকৃষ্ণ ক্লাবে

একটা নারায়ণ মূর্তি দেখতে পাবেন। মাটির তলায় পাওয়া গেছে। খুব প্রাচীন। যাদুঘরের কর্মকর্তারা এখনও খবর পাননি। তেঁতুলতলায় গিয়ে ক্লাবের সম্পাদক ঋষিকেশ দাসকে আমার কথা বললে আপনাকে অনেক তথ্য দেবেন। উনি এদিককার খবর রাখেন।

পাথর প্রতিমায় পৌছতে এদের বেলা চারটা বেজে যায়। ছেলেটি বলল, আজ এল-প্লটে যাবেন না। সন্ধ্যে হয়ে যাবে। চতুর্ভুজ বাবুর ঠিকানায় পৌছতে রাত হবে। অনেক পথ এখানেই নেমে যান।

নির্দিষ্ট ঘাটে ভটভটি বাঁধতে পারল না। ভাটা চলছে। অনেকটা দূরে হাঁটু সমান কাদায় নেমে হাঁটতে হল। বাঁধের ওপর ওঠার সময় এয়ার ব্যাগের ফিতা ছিঁড়ে যায়। অগত্যা বোগল দাবা করে নিতে হল ব্যাগটাকে। একটা পুকুর ঘাটে নেমে এঁটেল মাটি ধুতে ওদের বেশ সময় লাগল।

প্রভাত রায়ের দোকান খুঁজে পেতে বেগ পেতে হল না। উনি দোকানেই ছিলেন। নিজের পরিচয় দিতে এবং অলকেশ বাবুর কথা বলতেই উনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ব্যাগ রেখে সুদর্শন বসল। বিশ্বনাথ বলল, আমি বি. ডি. ও. অফিস ঘুরে আসি। আমার এক বন্ধু এখানে কাজ করেন। একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসি।

সুদর্শন বসে এ অঞ্চলের রাজনীতির খোঁজ খবর জিগ্যেস করল। প্রভাত বাবু বললেন, ঘন্টা খানিক পর আপনি কংগ্রেস, সি. পি. এম, এস. ইউ. সি সব পার্টির লোক আমার দোকানে পাবেন। আমি রাজনীতি বুঝি না, কি বলতে কি বলে ফেলব। ওরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারবেন।

সুদর্শন ওর দিকে তাকায়। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স। মাথায় চুলে কলপ দেওয়া। ফাঁকে ফাঁকে পাকা চুল উঁকি দিচ্ছে। কর্মচারী এক কাপ লেবু চা এনে দিল। খিদেয় ওর পেটে ছুঁচোর ডন চলছে। বিশ্বনাথ এলে একটু ঘুরতে পারত। কোথাও কিছু খেতে পারত।

ঘন্টা খানিক পর বিশ্বনাথ ফিরে এসে বলল বন্ধুর দেখা পেয়েছি।

চল ঘুরে আসি। সুদর্শন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্রভাতদা, একটু ঘুরে আসি। সুদর্শন বলল বেশী দেরী করবেন না। টর্চ নিয়ে যাবেন খুব সাপের উপদ্রব চলছে।

ব্যাগ থেকে সুদর্শন টর্চ বের করে নেয়। সন্ধ্যা নেমেছে। ওরা বাজারটা ঘুরে দেখল। ভাল দোকান একটাও নেই। ছোট একটা দোকানের সামনে বাঁশের মাচার উপর বসল. গাছপাকা কলা কাঁদি সহ ঝুলছে। মুড়ি আর কলা।

দু'জনে দশটা কলা. দু'শ মুড়ি নিয়ে দু'টো ঠোঙায় খেতে লাগল। খিদের জন্য, এটাই অমৃত মনে হল ওদের দোকানী একটি নাবালক ছেলে এক মগ জল ওদের সামনে রাখল।

এক পেট খেয়ে নিয়ে পাকা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে. বাজার ছাড়িয়ে পূর্ব দিকে কিছুদূর গেল উত্তর দিকে মাধ্যমিক স্কুল। আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁক পেরোলে হাসপাতাল। খোলামেলা মাঠের মধ্যে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। একটা ফলের দোকানে মর্তমান কলা ঝুলছে দেখে দু'জনে ডজন খানিক খেয়ে নিল

অন্ধকার নামছে দেখে ওরা ফেরা পথ ধরে বাজার পেরিয়ে নদীর বাঁধের উপর দিয়ে পুরানো বি. ডি. ও. অফিসের কাছাকাছি এল। বিশ্বনাথের বন্ধু একটা ছোট ঘরে থাকে, ঘরের মেঝেটা অন্য সহকর্মীর দখলে এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার এ ঘর ছাড়া উপায়ও নেই। রান্না ঘর বলে কিছু নেই। বারান্দার মুখে সিঁড়ির বাঁকে স্টোভে রান্না করতে হয়। ওর বন্ধু তমাল বলল রান্না বলতে সেদ্ধ সেদ্ধ, আর দুধ। রান্নার লোক রাখলে বাড়ীতে টাকা পাঠানো সম্ভব নয় সদ্য বিয়ে করেছি বৌ, মা দু'জনে আমার রোজগারের উপর নির্ভরশীল।

বিশ্বনাথের বন্ধু তমাল ঘরের সামনে একটা মিষ্টির দোকানে সুদর্শনদের এনে বসালো। ছোট দোকান, দু'তিন রকমের মিষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নেই। তমাল বলল, এ দোকানের কাঁচা গোল্লা, রসগোল্লা বিখ্যাত। দাম একটু বেশী, কিন্তু খেয়ে তৃপ্তি। আমার

বাড়ী উঃ ২৪ পরগনার মছলন্দ পুরে। ওখানকার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান 'যশোর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'ও এ জিনিস মেলে না।

সত্যি তাই। যে সুদর্শন মিষ্টি খাওয়ার বিপক্ষে সেই সুদর্শন ও দু'শ সন্দেশ, দু'টা রসগোল্লা খেয়ে ফেলল। বিশ্বনাথও খেল গোটা পনেরো ওর বন্ধুর এতগুলি টাকা গচ্চা দেওয়ায় সুদর্শন লজ্জা পেল। সুদর্শন দোকানীকে ধন্যবাদ জানায়। তিনজন প্রভাতবাবুর দোকানে এসে দেখে চার পাঁচজন বসে আছেন। দোকানে ক্রেতার ভিড় নেই। আসর জমে ওঠেছে। প্রধান শিক্ষক বিনোদবাবু তাঁর স্কুলের কিছু সমস্যার কথা বলছেন, উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ খুলতে পাচ্ছি না। দেওয়ালের সিমেণ্ট খসে পড়ছে। তাছাড়া বারো ক্লাসের অনুমতি পাচ্ছি না। পুরানো এগারো ক্লাসে বিজ্ঞানের শাখা খুলে ছিলাম। এখন যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। সরকার নীরব। আমরা অসহায়।

এদিকে দু'তিনটা স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম, তবু শিক্ষক বা শিক্ষিকা পাচ্ছে। আমরা স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষক কম সিডিউলকাস্ট ছেলেমেয়েদের বৃত্তি নিয়েও নয়ছয় হচ্ছে। সব টাকা হাতে আসেনা। কিছু বকশিস না দিলে সহজে গ্রাণ্ট ছাড়তে চায় না। নেতাদের ইচ্ছে মত দলবাজী চলছে। ডি. আই, এ. ডি. আইর সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখা পাওয়া যায় না, ধর্না দিয়ে বসে থাকার পর কোন কাজের অজুহাতে বেরিয়ে যান। এতদূর থেকে যেতে কত ঝামেলা। তার উপর খরচ পত্র আছে তো। এক স্কুলের ছাত্র অন্য ও স্কুলের খাতায় দেখানো হয়। আরও যেসব সমস্যার কথা বললেন সুদর্শন লিখে রাখলো।

গোবর্দ্ধন জানা বললেন, বি. ডি ও অফিস নদীর ওপারে স্থানান্তর করা হয়েছে, মানুষের যাতায়াতে খুব অসুবিধা। দোকান, ব্যাংক সবই এপারে, খেয়া সব সময় থাকে না। আমরা হাইকোর্টে মামলা করেছি। স্টে অর্ডার থাকা সত্বেও ডি. এম পুলিশ নিয়ে কাগজপত্র সব ঐ অফিসে নিয়ে গেছেন। কেমন জুলুম বলুন তো। আপনি

বলেন তো কাল সকালে কোর্টের অর্ডার দেখাবো। এত কথা হচ্ছে প্রভাতবাবু শ্রোতামাত্র।

সুদর্শন এমন কোথাও দেখেনি, কংগ্রেস, সি. পি. এম ও অন্য পার্টি'র নেতাস্থানীয় লোকেরা একত্রে বসে আড্ডা দিচ্ছেন। পার্টি'র জন্য বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যায়নি এরা সবাই সমবয়সী ও সহপাঠী ছিলেন।

সি. পি. এম এর এক নেতা বললেন, বি. ডি. ও. অফিস স্থানান্তারের কথা কংগ্রেসী আমল থেকেই শুনে আসছি। ওরা করেনি, আমরা করেছি। এখানে ছোট ঘরে কাজ করতে অসুবিধে হত। কর্মীদের বসার স্থান হত না। নতুন বাড়ীতে প্রচুর জায়গা। দেখতে দেখতে দোকানপত্র বসে যাবে। একদিনে এদিকটার উন্নতি হয়েছে কি?

কিছু সময় একথা ওকথা নিয়ে তর্ক ও চলে। দু'পক্ষেরই যুক্তি আছে সুদর্শন কোন মতামত দেয় না।

রাত দশটায় আসর ভাঙে। প্রভাতবাবু দোকান বন্ধ করেন। সিনেমা হল থেকে এক ভাগনে একটা হ্যারিকেন নিয়ে এলো। অদূরে রাস্তার পাশে ক্লাব ঘরে ব্যাগ ইত্যাদি রেখে পুকুরে ওরা হাত পা ধুয়ে গেল। শার্ট প্যান্ট ছেড়ে পুকুরের ধারে গিয়ে ভয়ে ঘাটে নামল না। ঘাটের দু'পাশে জঙ্গল, অনেকটা নিচে নামলে তবে জলের নাগাল পাওয়া যাবে। ফিরে এসে পায়জামা পাঞ্জাবী পড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সুদর্শন। শরীর বিশ্রাম চায়। ক্লান্ত, অবসন্ন। ধারে কাছে জলের কল নেই। জল পিপাসা চেপে গেল।

এগারোটা নাগাদ ঐ ভাগ্নে খেতে ডাকল। খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল দেওয়া বড় ঘর। প্রভাতবাবুর চেয়ে খারাপ অবস্থার লোকদের বাড়ী পাকা উনি কেন পাকা বাড়ী করছেন না, কে জানে? ঘর দোরও অপরিচ্ছন্ন।

সুদর্শন খেতে বসে দেখে থালার পাশে আট দশটা বাটিতে হরেক-রকমের জিনিষ। চোখ বড় বড় করে সে বলল, দাদা, এখানে এসে

প্রাণটা দিয়ে যাবো নাকি? খেতে বসে টক খাই না, তাও আবার রাতে? দৈ, চাটনি, আচার ভাতের সঙ্গে বিরুদ্ধ খাওয়া। এসব নিয়ে যেতে বলুন। খাব না।

ওর স্ত্রী বললেন, সামান্য আয়োজন। নিরামিষ খাবেন। কি আর দেবো?

—আমার স্ত্রী বারোমাসের রোগী। দু'মেয়ে ও মায়ের সঙ্গে যোগান দিয়েছে। কষ্ট করে খান। প্রভাতবাবুর বিনীত অনুরোধ। সুদর্শন তাকিয়ে দেখে স্ত্রী, রুগ্না, হাড়িসার। ছেলেমেয়েদের শরীরও নির্জীব। এরা খেতেই জানে না। বিরুদ্ধ খাওয়ার ফল। সে বুঝিয়ে বলে। চাটনি, আচার ও দৈর বাটি সরিয়ে রাখল।

বিশ্বনাথ না বলল না! চেটেপুটে সব বাটি শেষ করল। সুদর্শন ঘুম নষ্ট হবে, শরীর খারাপ হবে ভেবে সতর্ক থাকল। এ সংযম তার আছে। তাই তার শরীর সুস্থ ও সক্রিয় তিনটা মানুষের কাজ একাই করে সে। বন্ধুরা, সহকর্মীরা বলে ইলেক্‌ট্রিক ম্যান।

প্রভাতবাবুর ঘরের দরজায় এক বালতি জল পেয়ে সে হাত মুখ পা ভাল করে ধুয়ে নেয়। কথা আর না বাড়িয়ে শুতে চলে যায়। ঠিক হয় কাল সকালে রাইকিশোর পাত্র নামে একজন এদের কুমীর প্রকল্পে নিয়ে যাবে। তৈরী হয়ে থাকতে বলছে। অনেকটা দূরে দুর্গা গোবিন্দপুরে থাকে।

ক্লাব ঘরের একটা খাটে এরা দু'জন অন্যখাটে ঐ ভাগ্নে ও তার এক বন্ধু শোবে। ওরা শুতে আসার সময় সাপ সাপ বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। রাস্তার উপর এক কালো কেউটে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। কিছু সময় পর হাঁকডাক শুনে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায়।

সুদর্শনের শোয়া মাথায় উঠে গেল। মাটির ঘর, ভাঙ্গা বেড়া। পেছনে পুকুর, জানালার পাশে ডোবা। যখন তখন সাপ আসতে পারে। মশারী, তোষকের চারপাশে গুঁজে বসে থাকল। মাঝে টর্চ মেরে দেখল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে পড়েছে ঘুমিয়ে থাকলে সাপ এসে বিছানায় ঢোকে, বুকের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে থাকে।

দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে যায়। দু'তিনবার শুয়ে কল্পিত ভয়ে বিছানায় বসে থাকে চতুর্দিকে টর্চের আলো ফেলে। ভোর চারটে বাজলে, আলো ফুটে ওঠে। নিশ্চিন্তে বালিশে মাথা দেয়। তন্দ্রা-ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে থাকে।

রাই কিশোরের ডাকে উঠে পড়তে হয়। এক ঘটি জল দিয়ে কোন প্রকারে মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নেয়। বাজারের কাছে ভ্যান ঠিক করা ছিল। পাঁচ মাইল ভ্যানে যেতে হবে, চার মাইল হাঁটতে হবে।

ইঁট বিছানো রাস্তা। ঝাঁকুনি খেতে খেতে ভ্যান চলছে, এরা দু'পাশের মাঠ, গ্রাম দেখছে। মরা নদী, খাল, বিল এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে। জলসেচের ব্যবস্থা নেই বলে বহু জমি ফাঁকা। যেখানে সামান্য মিঠা জলের ব্যবস্থা আছে সেখানে ঢেঁড়স, তরমুজ, লঙ্কা মাঠ ছেয়ে আছে। এখানকার তরমুজ বিখ্যাত, কলকাতার বাজার ছেয়ে যায়। তিন ঋতুতে ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় ভাল ফসল হয়নি। কৃষকদের মাথায় হাত।

রাইকিশোর ঘন কথা বলে। বিশ্বনাথ চুপচাপ থাকে। গরীব মানুষ, পায়ে চটি নেই, হাতে ছেঁড়া ছাতা, ছিঁড়ে ধরা জামা। দলিল লেখা অফিসে ফাইফরমাস খাটে। মাসে পঁচাত্তর টাকা পায়। সংসারে দু'ছেলে দু'মেয়ে। শেষে বলে কলকাতায় কোন কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে কৃতজ্ঞ থাকবে। নয়ত ভিক্ষে করতে হবে। চাষবাস, মাছ ধরা সে জানে না। বয়স ও অনেক হয়েছে।

সুদর্শন সহানুভূতি সূচক কথা বলল। কিন্তু উপায় নেই। কে কাজ দেবে? না দিল্লী, না রাজ্য কারও কোন পরিকল্পনা নেই। শুধু সরকারী কর্মীদের জন্যই ওদের চিন্তাভাবনা।

ভ্যান থেকে নেমে যখন বাঁধের পথ ধরল তখন সূর্য্য আকাশের বুকে পুরোপুরি দখল দিয়ে বসেছে। সুদর্শন রাইকিশোরের ছাতার তলায় পাশাপাশি কথা বলতে বলতে হাঁটছে। বিশ্বনাথ একটা পত্রিকা দিয়ে সূর্য আড়াল করে হাঁটে।

ওদের আগে ভাগে এক কিশোরী। একহাতে মাটির কলসি, অন্য হাতে ব্যাগ। সুদর্শন একটু দ্রুত হেঁটে ধরে ফেলে। ময়লা রং ওঠা শাড়ী পড়নে। শীর্ণাঙ্গী। বকের মত পা ফেলে চলছে।

—কোথায় যাবে ?

—ভগবৎপুর। আপনারা ?

—কুমার প্রকল্প দেখতে যাবো। আর কতদূরে ?

—এখনও অনেক পথ। এক মাইল সোজা গিয়ে দেড় মাইল ডাইনে যেতে হবে।

—তোমার নাম কি ? কোথায় গিয়েছিলে ? সুদর্শন জিগ্যেস করে। অঞ্জনা দণ্ডপাত বাজারে গিয়েছিলাম। বাড়ীতে গামছা বুনি দোকানে দিয়ে টাকা নিয়ে বাজার করে বাড়ী ফিরছি।

—পড়ো না ? এখন তো বেতন লাগে না। পুনরায় সুদর্শনের প্রশ্ন। খাবো কি ? বাবা নেই, সেভেন পর্য্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছি এখন মাসে তিনশ টাকা রোজগার করি। মা, দুই ভাই, বোনকে খাওয়াতে হয়। মা হোগলা বোনে নুন বানায়।

—রোজ এত পথ হাঁটো ? বিস্ময় প্রকাশ করে।

কি করা ? হাঁটতে হয়, অভ্যাস হয়ে গেছে। দারিদ্রের বিষম জ্বালা দেখে সুদর্শন ভগবানকে দোষী করে। একটা সীমা তো আছে। কিসের কর্মফল ? সব কিছুর নিয়ন্তা তিনি হলে এতো পক্ষপাতিত্ব কেন ?

সময় কাটানোর জন্য সুদর্শন একটু প্রগল্‌ভ হয়, বেশী কথা বলে। তোমার হঠাৎ বিয়ে হলে ভাই বোনের কি উপায় হবে ?

ও লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। শেষে বলে—বিয়ে করবই না।

এমন গণ্ডগ্রামের মেয়ে শুদ্ধ ভাষায় কি সুন্দর কথা বলে। ওর সহ সুদর্শনের ভালো লেগে গেল।

কখনও সোজা পথ, কখনও ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি হাঁটতে লাগল। অঞ্জনা থাকায় ওদের এক মাইল রাস্তা কম হাঁটতে হল।

একটা পুকুরের পাশে এসে অঞ্জনা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি বাঁদিক যাবো। আপনারা ডান দিকে সোজা যাবেন।

এতক্ষণ বেশ সময় কাটছিল। আর কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি মেয়ে মানুষ রাস্তাঘাটে সাবধানে চলবে। তুমি বড় হচ্ছো মনে রেখো। সুদর্শন উপদেশ বর্ষণ করে। পুনরায় বলে মেয়েদের জীবন যখন তখন ভেসে যেতে পারে। পুরুষরা শিকারী। মেয়েদের ভাল থাকতে দেয় না। খুব আবেগে কথাগুলি বলে সে ব্যাগ থেকে কলা, একটা চকলেট, আর কেক ওকে দিল। পথে খাবার জন্য এসব নিয়েছে ওরা।

অঞ্জনা এতটা আশা করেনি আনন্দে প্রণাম করে বসল ওদের চোখ ছলছল করছে ওর। ওদের সময় নেই অপেক্ষা করার। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে হাঁটতে লাগল।

সুদর্শনরা কিছুদূর গিয়ে বাঁকের মুখে তাকিয়ে দেখে অঞ্জনা তখনও দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। পুকুর ধারে আরও কয়েকজন এদিকে তাকিয়ে আছে। কখনও অসুবিধায় পড়লে আমার কথা বলে প্রভাতবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। খুব ভাল মানুষ উনি। সুদর্শন এক ফাঁকে ওকে বলেছিল।

অঞ্জনা মুচ্ছা হয়ে গেল। কোন শহরে বাবু মানুষ তাকে এমন সঙ্গ দেয়নি। মধুর ব্যবহার করেনি। তাই তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। যতক্ষণ সুদর্শনদের দেখতে পেল, দাঁড়িয়ে থাকল।

চড়া রোদ। শরীর চন্‌মন্ করছে। রাত্রি জাগায় সুদর্শন অবসন্ন বোধ করে। বাতাস আছে তাই রক্ষে। এত খাল, নদী তবু বাতাস না থাকলে শরীরে জ্বালা ধরে।

এতকষ্ট। নামখানা দিয়ে এলে এত কষ্ট হতো না হয়ত। হাঁটু যেন ভেঙ্গে আসে, বসতে পারলে স্বস্তি হয়। এক সময় ওরা ভগৎপুরে পৌছল। কুমীর প্রকল্পে পৌছতে বেলা এগারোটা। তিন দিকে মাঠ, একদিকে নদী। নদীর ধারে বন ঘেরা একটা বাংলো। ফার্স্ট অফিসার বসে বসে তার বেতন ডি. এর হিসাব করছেন। পাশে

ক্লার্কবাবুও অংক কষে যাচ্ছেন। সুদর্শন আগমনের উদ্দেশ্য বলা সত্ত্বেও গা করল না। শেষে এক কর্মচারীর কথায় সেকেণ্ড অফিসারের মুখোমুখি হল। তরুণ অফিসার। আণ্ডার প্যান্ট পরে ডন বৈঠক দিচ্ছেন। এদের দেখে একটা তোয়ালে জড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

একটা ঢিবি দেখিয়ে বললেন, এর মধ্যে কুমীরের ডিম আছে, সূর্যতাপে 'তা' দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চা ফুটলে তিনটি প্রকোষ্ঠে রাখা হবে। ঘুরে ঘুরে প্রকোষ্ঠগুলি দেখলেন তিনি। চারদিক উঁচু পাঁচিল, উপরে নেট দিয়ে ঘেরা ঘর। ছোট ছোট জলাশয় করে রাখা হয়েছে। তিন মাস, তু'মাস ও একবছরের বাচ্চা আলাদা রেখে নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এক মাসের বাচ্চাগুলি ল্যাটা মাছের মত দেখতে। তিন মাসের গুলি বড় গোসাপ বলে মনে হয়। আর তু'মাসের বাচ্চাদের গুলে সাপের মত দেখায়। এত কুমীর একসঙ্গে আর কোথাও দেখেনি সে। অফিসার বললেন, কুমীর বিশেষজ্ঞদের মতে নদীতে যত বেশী কুমীর থাকবে তত বেশী মাছ জন্মাবে। মাছের শত্রুদের কুমীর খেয়ে ফেলে। তাই এত টাকা ব্যয় করে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

এদের ব্যবহার, ন্যূনতম আপ্যায়ণের অভাবে সুদর্শনরা তুঃখ পেল। গেটের মুখে একটা খড়ের ছোট ঘর। বেড়া নেই। কয়েকটা কাঠ, বেঞ্চের মত পাতানো ছোট একটা চায়ের দোকান। উনুনে কাঠ গুঁজে চা তৈরি করে। চা করার ফাঁকে মুড়ি, কলা, সন্দেশ খেতে শুরু করে দিল ওরা। এমন সময় তিনজন জনমজুর এসে সামনের বেঞ্চে বসে। চা করতে বলে দোকানীকে।

সুদর্শন প্রশ্ন করে এখানকার ব্যাপার জেনে নেয়। ওদের সকলেই একমত হল একটা বিষয়ে। বাবুরা মাছ, মধু, হরিণের মাংস হরদম খাচ্ছেন, বাড়ী পাঠাচ্ছেন। আর গাছের ডাব, নারকেল ধ্বংস করছেন। বনের গাছ গোপনে বিক্রীও করছেন। এখানে ডিউটি

পাওয়া মানে আখের গুছিয়ে নেওয়া কে খোঁজ নেয়? গ্রামের গরীব মানুষরা বাবুদের ভয় পায়, এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেও চায় না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবে কেন? অথবা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজে কি প্রয়োজন?

ফলে অফিসারদের পোয়া বারো। যা খুশি করে যাচ্ছেন? কে আর দেখছেন?

নামখানায়

রাইকিশোরকে পঁচিশটাকা বকশিস দিয়ে সুদর্শন মুড়ি, কলার অবশিষ্ট যা ছিল ওর ব্যাগে পুরে দিল। এতটা পথ একা একা যাবে। এছাড়া উপায়ও নেই।

সুদর্শন ওকে কিছু উপদেশ দিয়ে অন্য পথ নিল। পাথর প্রতিমায় যাবে না। নামখানা যাবে। কম হাঁটতে হবে।

শুরু হল আবার হাঁটা। কিছুদূরে একটা পুকুর দেখে বিশ্বনাথের স্নানের ইচ্ছে হল। প্রচণ্ড গরম, আর থাকা যায় না। সুদর্শন রোজ ন'টায় স্নান করে, তারও অস্বস্তি লাগছিল।

দু'খানা গামছা বের করে এক এক করে স্নান করে নিল। পুকুরের জল যেমন স্বচ্ছ তেমনি ঠাণ্ডা। বড় বড় শুশনি পাতা জলের ওপর পদ্মপাতার মত ভাসছে। তা দেখে বিশ্বনাথ বলল—সুদর্শন কিছু নিয়ে নাও। দু'বেলা শুশনির রস খেলে ভালো ঘুম হবে।

আয়ুর্বেদ আমার পড়া আছে, শিবকালীর বই টেবিলেই থাকে। কিন্তু এখন কে রস করে দেবে? চল, বেলা হয়ে যাচ্ছে। ভাত খাওয়া এবেলা আর হবে না। সুদর্শনের মন্তব্য।

শরীর তো ঠাণ্ডা হল। কুমীর প্রকল্প নিয়ে খুব ঠকে শিখবে। ব্যাটারা কোন ভদ্রতা দেখালো না। না লিখলে কুমীরের ছানাগুলি আমি নষ্ট করে ফেলবো। এদের জন্যই সরকার সমালোচনার পাত্র হয়। বিশ্বনাথ উষ্মা প্রকাশ করে।

—গোসাবার অরুণবাবু, সজনেখালির গুহবাবু, যথার্থ ভদ্রলোক। এখানে একটা দোকান পর্য্যন্ত নেই যে কিছু কিনে খাবো। কখন নামখানায় পৌছব কে জানে। সুদর্শনের উক্তি।

- তোমার সঙ্গে আর আমি কোথাও যাই? ছন্নছাড়া দেশ।

- ভাবো এদের কথা। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চলতে হয়।

নৌকা, ভটভটি ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় না। তা আবার জোয়ার ভাঁটার খেয়ালে চলে নিয়মিত কোন সার্ভিস নেই। মর্জি মাফিক চলে। তাছাড়া এদের মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়। এরাও এযুগের মানুষ, ভুলে যাবে না।

নৌকার ঘাটে এসে একঘণ্টা বসে থাকল ওরা। কোন নৌকা বা ভটভটি নেই। এদিকে লঞ্চও চলে না। খিদেয় শরীর দুর্বল ও বিষণ্ণ। তার উপর গতরাতের অনিদ্রায় সুদর্শন পারলে এখানেই শুয়ে পড়ে।

বেলা দুটোয় একটা নৌকা দেখতে পেয়ে ডাকল। তেলের ড্রাম নিয়ে যাচ্ছে। পথে পথে তেল দিয়ে খালি ড্রাম নিয়ে ফিরছে। টাকার লোভ আর অসহায় অবস্থার কথা বলতে দু'টো ড্রাম সরিয়ে বসতে দেয়। ভয়ে দু'জনে জড়সড়। যে কোন মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে। সুদর্শন কল্পিত বা আকাশের ভগবানকে ডাকতে লাগল।

নৌকার গতি মন্থর। ভাঁটা চলছে। দু'ঘণ্টার পথ সাড়ে তিন ঘণ্টা নিল। একজন মাঝি গান ধরে –

গগন হাসেন, পবন হাসেন, হাসেন গহীন নদী।
আর হাসেন মায়ের বালক চক্ষে নাহি নিদি ॥
বনবিবি বনের মাতা হাসেন রইয়া রইয়া।
গোকুলে যান যশোমতী নীলমণিরে লইয়া ॥
রে— — এ—এ— —নীল মণিরে
ল — ই — য়া — — আ — আ —।

মাঝি দু'জন যদি বৈঠা ও দাঁড় দিয়ে আঘাত করে এদের মেরে জিনিষপত্র, টাকা ঘড়ি নিয়ে জলে ফেলে দিত কেউ টেরই পেত না। অথবা বাংলাদেশের দিকে নিয়ে গেলে কি বিপদই না হতো। হায় প্রকৃতি নির্ভর মানুষ। সভ্য জগতের মানুষ, এদৃশ্য ভাবতেই পারবে না।

বেলা শেষ করে নামখানায় পৌছল। বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দেখে আকর্ষণীয় কিছু নেই। কিছু দোকান পাট মাত্র। ওরা একটা বড়

মিষ্টির দোকানে পাউরুটি সন্দেশ খেয়ে নিল। অসময়ে কোথায় যাবে? রাধাকৃষ্ণবাবুর বাড়ী গ্রামে। তাছাড়া উনি এখন কোথায় কে জানে?

বকখালির বাসে উঠে পড়ল ওরা। কারো বাড়ীতে নয়, হোটেলে একটু স্বাধীনভাবে থাকবে। ভেবেছিল ফ্রেজারগঞ্জ বকখালিতে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি দেখবে। হায়, শুধু মাঠ আর মাঠ। ফাঁকা মাঠের মাঝে মাঝে কিছু বাড়ী। তাও কাঁচা ঘর। কল্পনা, স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। সন্ধে হয়ে যাচ্ছে দেখে ফ্রেজার গঞ্জে না নেমে বকখালিতে নেমে এক দোকানীকে জিগ্যেস করে ট্যুরিস্ট লজের দিকে গেল।

লোকালয় খুব কম। বাস স্ট্যাণ্ডের আশেপাশে কিছু হোটেল ও মেসবাড়ী গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন কিছু হোটেল, অফিস তৈরী হচ্ছে। দোকানঘাট ও ক্রমশঃ বাড়ছে।

ট্যুরিস্ট লজের কেয়ার টেকার বললেন, কলকাতার অফিস থেকে লিখে না আনলে এখানে থাকতে দেয়া হয় না। সুদর্শন একটু তর্ক করল, প্রায় সব ঘরই তো ফাঁকা তবু দেবেন না কেন?

—সরকারী নিয়ম।

—আপনাদের খরচ উঠছে না, তবু এসব নিয়ম করে লাভ কি? সরকারের অর্থের শ্রাদ্ধ হচ্ছে।

—আপনাকে কৈফিয়ৎ দেব কেন? সরকারের লোকসান যাচ্ছে, আপনার কি?

—সরকার তো আমাদের নিয়েই, আপনাকে ও কিছু ক্ষমতা দেওয়া আছে। ঘুষ পেলেই ঘর দেবেন।

লোকটি রেগে কি বলতে যাচ্ছিল, সুদর্শন পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করে দেখাল, ততক্ষণে বিশ্বনাথ একটা ফটো তুলে নিল টুরিস্ট লজের। সাংবাদিক দেখেই ভদ্রলোক নিমেষে জল হয়ে গেলেন। হাত জোর করে বললেন, আগে পরিচয় দেবেন তো! সব মানুষের জন্য তো এক ব্যবস্থা করা যায় না।

ওরা ঘর পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চার্জ খুব বেশী। পোষাক

পাল্টে আর একবার স্নান করে নিল। অদূরে ঝাউবন, সমুদ্র। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। বৃদ্ধ সিংহের গর্জনের মত।

খেতে বসলে কেয়ার টেকার বললেন—লোকজন বাইরের হোটেল বা মেসেই বেশী থাকে। এখানে খরচ বেশী তেমন আরাম নেই। কাঠের উঁচু ঘর, খোলা মেলা এই যা। বাতাস থাকলে ভালো. নয়ত গরমে একসা। বিদ্যুৎ কবে আসবে কে জানে? রাত ন'টার পর ডায়নামো বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থাকা খাওয়ার খরচ কম। অধিকাংশই মেয়েছেলে নিয়ে স্ফূর্তি করতে আসে। বাড়ীওয়ালারা একস্ট্রা কিছু বকশিস পেয়ে জেনেশুনেও চেপে যায়। কার বৌ, কার মেয়ে, কার সঙ্গে শোয় কে জানে?

—এখানে সমুদ্র ছাড়া আর কি দেখার আছে? সুদর্শন প্রশ্ন করে।

—ঝাউবন, ফরেস্ট আর প্রেম লীলা।

—এখান থেকে সাগরদ্বীপ যাওয়া যায়? বিশ্বনাথের প্রশ্ন।

—না, নামখানা দিয়ে যেতে পারেন। এখন গিয়ে কি হবে?

ফাঁকা মাঠ। যুব আবাসন, পি. ডবলিউ. ডি. বাংলো নতুন উঠেছে। রাস্তার পাশে নতুন ঝাউ গাছ লাগানো হয়েছে। কপিল-মুনির মন্দিরের আকর্ষণ বিশেষ নেই। পাথরের উপর খোদাই করা কপিল, সাগররাজ, ভগীরথ, ইন্দ্র, বিশালাক্ষী দেবী ও হনুমানজীর মূর্তি। সমুদ্রের বেলা ভূমি শুধু বালুময়। স্নান করতে পারবেন না। হোটেলে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি ভারত সেবা-শ্রম সংঘ বিশাল মন্দির করেছেন। ব্রহ্মচারীকে বলে থাকা খাওয়া পেতে পারেন। বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে ওঙ্কারনাথজীর মন্দির, ছোট কালী মন্দির, যোগেন্দ্র মঠ, কপিলানন্দ আশ্রম, শিবমন্দির, শংকরা-চার্যের আশ্রম আছে। এখন সব ফাঁকা। পৌষ মাসে সাগর মেলার সময় আসবেন, ভিড় হলেও আনন্দ খুঁজে পাবেন।

—কপিল মুনি আর সাগর রাজার গল্পটা কি সত্যি?

—পুরাণের গল্প সত্যি মিথ্যে মেশানো থাকে। তবে ভগীরথ কোন

গাঁজাখুরি বা অলৌকিক কিছু করেননি। তিনি সিভিল ইঞ্জিনীয়ার বা প্রত্নতত্ত্বের কাজ জানতেন। পথ খুঁজতে তিনি হিমালয়ে যান, হিমালয়ের রাজাকে রাজি করিয়ে তিনি মাটি খনন করে পথ করে নেন। আর মহাদেবের জটা মানেই, কোন পাথরের স্তূপে নদী আটকে ছিল; ভগীরথ অনেক পরিশ্রম করে পথ করেন। বাঁধা উন্মুক্ত হলে জলস্রোত দু'কূল প্লাবিত করে বয়ে আসে। নদী মাটি ভেঙে পথ করে করে নেয় এবং এই বঙ্গোপসাগরে এসে মিশে যায়। সাগর রাজার দেশে খরা চলছিল ষাট হাজার নাগরিক রক্ষা পেয়ে গেল।

—এ গল্প কেউ বিশ্বাস করবে? কোথায় পেলেন আপনি?

—না করলে না করবে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি এটাই। আমি সাগর-দ্বীপের বহু জায়গা ঘুরে দেখেছি। অনুর্বর মাটি। এক ফসল হয়। শীত গ্রীষ্মে মাটি পাথর হয়ে থাকে। অধিকাংশ মানুষ গরীব কুঁড়ে ঘরে বাস করে। দু'একটা গ্রামে কিছু অফিস পাকা ঘর দেখা যায়। আর সর্বত্র দারিদ্রের শত চিহ্ন।

এসব ছাড়া আর দেখার কিছু নেই। তবে বাসে বা ভ্যানে ভারত সেবাশ্রমের কাছ থেকে যেতে পারেন 'লাইটহাউসে।' ১৮০৮ সালে নির্মিত হয়, ৮৪ ফুট উচ্চ। বিশ্বনাথ দে কে আমার কথা বলবেন। উনি উপরে উঠতে অনুমতি দেবেন। এর ইনচার্জে আছেন উনি। সমুদ্র সাগর দ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা দেখতে পারেন। সন্ধ্যের আগে ফিরে আসতে হবে। মাঠের মধ্য দিয়ে ফাঁকা রাস্তা। রাত করবেন না।

বিশ্বনাথ বলল, আমি যাচ্ছিনে। কাল সকালে কলকাতা রওনা হচ্ছি। মাঠে মাঠে আমি ঘুরতে পারব না।

আপনার এদিক ঘুরে 'কলসে' যেতে পারেন। বনে নামা নিষেধ। তবে গভীর বন। বাঘ, বন মোরগ বুনো শুয়োর প্রচুর দেখা যাবে, খুব সাবধানে যেতে হয়। কেয়ার টেকার বললেন।

বিশ্বনাথ ম্যাপ বের করে পজিশান দেখে নিয়ে বলল, এ যাত্রা থাক। পূর্বাশা দ্বীপটা কোথায় নতুন জেগে উঠেছে? যা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়েছে।

—আমি কখনও যাইনি। বঙ্গোপোসাগরের মধ্যে পড়েছে ৮ গোসবা হয়ে যেতে হয়। কোন নৌকা, ভট্‌ভটি যায় না। আপনি ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে শীতকালে ওদের সঙ্গে যেতে পারেন। তবে দেখার কিছু নেই। শুধু জলাভূমি। সাগর-দ্বীপের উত্তর পূর্বে মুড়িগংগা (বারাতলা) নদী, পশ্চিমে হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। প্রায় ১০৭ বর্গমাইল জমি এলাকা। সুন্দর বনের ৫৫টি দ্বীপের মধ্যে সাগরদ্বীপ বৃহত্তম। লোকসংখ্যা প্রায় হাজার এক লক্ষের কাছাকাছি। শোনা যায় প্রাচীন সুদৃশ্য কপিল মুনির মন্দির, বটগাছ, নারিকেল, কুঞ্জ, সাধুদের আশ্রম জলের তলায় তলিয়ে গেছে। ঘুর্ণীঝড়, প্লাবন, ভূমিকম্প, ভূমির অবনমন, জলদস্যুদের আক্রমণ, পানীয় জলের অভাবে প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকটাই জলের তলায় ভবিষ্যতে হয়ত প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার হবে। টলেমি, রেনেল, টমাস ওল্ডহ্যাম, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁদের বইতে একথা লিখেছেন। কারও মতে এক সময় সাগরদ্বীপ মূল ভূখণ্ড কাকদ্বীপ, কালীঘাটের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক জগন্নাথ মাইতি 'সগর ও তাহার জনগণ' নামে স্কুল পাঠ্য একটা বই লিখেছেন। তাতে এসব তথ্য পাবেন। আমার কাছে বইটা ছিল, হারিয়ে গেছে।

এখানকার শাসন কার্য্য কাদের ওপর ছিল? দেশী শাসক না বিদেশী? এখানে সি পি. এম না কংগ্রেসের শক্তি বেশী, সুদর্শন প্রশ্ন করে।

—সাগরের শেষ রাজা প্রতাপাদিত্য। ১৮১২ সালে মি জোনস জমির বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করেন। সাহেবরা এখানে আশি বছর পরে শাসন করেন। তারপর ১৮৮৩ সালে হুগলী-উত্তর পাড়ার প্যারী মোহন মুখার্জী ও কলকাতার বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী অদ্বৈত্যকুমার দত্ত জমিদারী নেন। ১৯ ১ সাল থেকে বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৩ সালে জমিদারী উচ্ছেদ হয়। এখন

এখানকার এম-এল-এ প্রভঞ্জন মণ্ডল এবং এম. পি মুকুন্দ মণ্ডল, দু'জনই সি. পি. এম এর লোক। কিছুক্ষণ পর সুদর্শন টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে এল। দু'জনেই ঠিক করল আর কোথাও নয় এবার ঘরে ফিরবে। রাত পোহালেই হয়। সুদর্শন মায়ের কথা ভাবল। অনিমা চিঠি দিয়ে উত্তর না পেয়ে খচে যাবে। আরও কত কথা মনে মনে পড়ে। কলকাতার জন্য হাঁফিয়ে ওঠে। ওদের শহরটা কত-দিনের অদেখা। প্রেয়সী যেন, অথবা মমতাময়ী মায়ের মত। যা ভাবো তাই।

সুদর্শন খুব সকালে উঠে ব্যাগপত্র গুছিয়ে রেখে সমুদ্রের তীরে কিছু সময় ঘুরল। আকর্ষণীয় নয়। অপরিচ্ছন্ন। বালিময়। ঝাউ-গাছ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। কটা চুলের মত বন বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস। হাঁটতে হাঁটতে বন বিভাগের অফিসের পাশ দিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করে। বনের মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তা। খানা ডোবা দু'পাশে কি সমুদ্র তট, কি বন পথ সর্বত্রই লোকশূন্য দু'একজন জেলে ছাড়া কেউ নেই। স্থানীয় সংখ্যাও নগণ্য বন বিভাগের লোক-জন ঘুমোচ্ছে বা ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে অফিসঘরের পাশ দিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে টিফিন খেয়ে রাস্তার পাশে একটা মন্দিরের পাশে দাঁড়াল সাইনবোর্ডে লেখা "ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির"। পূজারী সচ্চিদানন্দ শর্মা। খড়ের চালা উঠেছে। এখানেও কালীমন্দির? বিশ্বনাথের প্রশ্ন। টুপাইস কামাবার ধান্দা।

একজন মজুর বলল, উনিই একমাত্র পুরোহিত। মেদিনীপুর থেকে এখানে এসেছেন। দু'মাইল দূরে গ্রামের মধ্যে আদি মন্দির আছে। ঠাকুরদার আমলে পশুবলি হত। বনের বাঘ ও মাংস খেতে আসতো। বাঘ নাকি ঐ দিন কাউকে তাড়া করত না। মন্দিরের পাশে বালির ওপর বলির মাংস দিলে খেয়ে চলে যেত আজকাল এসব অবিশ্বাস্য গল্প বলে মনে হয়। আমিও দেখিনি। শুনেছি মাত্র।

তারপরই ঘরে এসে ব্যাগ নিয়ে দু'জনে বাসস্ট্যাণ্ডে চলে এল।

কেয়ার টেকার খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আবার আসতে বললেন।

ফাঁকা বাস, গা এলিয়ে বসল ওরা। তিন জোড়া নারী পুরুষ, দেখলে শহুরে মনে হয়। রাত্রিবেলা এখানে কাটিয়ে শহরে ফিরে যাচ্ছে। এছাড়া চার পাঁচ জন সাধারণ যাত্রী বসে। স্থানীয় লোক। বাস ছাড়ল ঠিক সময় মত।

কয়েক মিনিট পরই ফ্রেজারগঞ্জ। একটা টায়ার বিকল হয়ে গেছে, পাল্টাবে। বিশ, পঁচিশ মিনিট সময় লাগবে, কিছু সময় থেকে গেল ওরা।

সুদর্শন ও বিশ্বনাথ বাস থেকে নেমে সোজা সমুদ্রের দিকে চলল। খোয়া বিছানো একটা রাস্তা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

দু'পাশে শুধু বালি আর বালি।

সমুদ্রের তীরে একটা দোতলা বাড়ী কংকালের মত দাঁড়িয়ে আছে: জানালা দরজা চুরি হয়ে গেছে। অন্যপাশে একটা নারকেল গাছ অর্ধেক বালির তলায়, পাঁচিল বালিতে ডুবে আছে। তিন কামড়ার একটা দালানের বারান্দা মেঝ বালিতে ঢাকা।

একজন জেলে বলল, সমুদ্র এক দেড় মাইল এগিয়ে এসেছে। সেচ বিভাগের বাংলো ছিল। সমুদ্রের ভয়ে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখানে ফ্রেজার সাহেবের বাংলো ছিল। আজ সমুদ্রের পেটে গেছে। পোর্ট ট্রাস্টের বড় বাড়ীটা ভুতুরে বাড়ীর মত দেখাচ্ছে। বকখালির আসল ঝাউ বন তলিয়ে গেছে জলের তলায়। এখন নতুন করে ঝাউ, আইপোমিয়া গাছ লাগানো হচ্ছে। লক্ষীপুর গ্রামের তিনভাগ ডুবে গেছে। আশেপাশে কিছু নেই। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ী গ্রামগঞ্জ একটু দূরে। শুধু বাস স্ট্যাণ্ডে দুটি ছোট চা স্টল। এখন ফ্রেজারগঞ্জে আছে শুধু সরকারী টাওয়ার ও লাইট হাউস। রাতে সমুদ্রে আলো ফেলে। ত্রিসীমানায় পাকা বাড়ী নেই।

বাসের হর্ন বেজে উঠতেই দ্রুত হেঁটে বাসে উঠল ওরা। বাস স্পীড বাড়িয়ে দিল। লেট টাইম মেক আপ দেবে। যাত্রীরা ঝাকুনি খেতে খেতে নামখানায় চলল। তারপর নৌকায় হেতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী

পেরিয়ে কলকাতাগামী স্টেট বাস ধরবে। সোজা ধর্ম তলায় যাবে। তারপর বাসায়। স্নান—খাওয়া—ঘুম।

চোখ বুজে কলকাতার কথা ভাবছে, আর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। দু'জনের মুখ হাসি খুশ উজ্জল। মাঝে মাঝে অন্যযাত্রীরা তাকিয়ে দেখছে ওদের দু'জনকে।

কাকদ্বীপ থেকে এক ভদ্রলোক উঠে সুদর্শনদের পাশে বসলেন। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণদেহী। চোখে মুখে সাহসও দীপ্তির ছাপ। হাতের চামড়ার ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে কয়েকট পত্রিকা ও বই বের করে গুছিয়ে রাখতে যাবেন এমন সময় সুদর্শনের চোখে পড়ল। "গঙ্গারিডি" পত্রিকা এক ঐ নামে একটি বইও। লেখক, সম্পাদক শ্রীনরোত্তম হালদার।

কৌতুহলী হয়ে একটি বই ও পত্রিকা চেয়েনিল। ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন—আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন? এখন কোথায় যাবেন?

সুদর্শন পাঠে মনোযোগী। বিশ্বনাথ সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলেন, এদিকে ঘুরতে এসেছিলাম। গংগাসাগরে যাওয়া হল না।

—আসল জায়গাতেই গেলেন না। বাঙলার প্রাচীন স্থানটাই দেখলেন না। আমার গবেষণাগারে গেলে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু দেখতে পেতেন।

—আপনার নাম কি? কোথায় কি গবেষণা করেন? বিশ্বনাথ পুনরায় প্রশ্ন করে।

—নরোত্তম হালদার। গঙ্গারিডি আমিই সম্পাদনা করি। এই বইটি আমার লেখা। এ অঞ্চলের ইতিহাস পাবেন। প্রায় ত্রিশ বছরের পরিশ্রম। কাকদ্বীপেই "গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র" আছে।

এতক্ষণ সুদর্শন কোন কথা বলেনি। একটা লেখার হেডিং "গঙ্গারিডির মানুষ বাঙালীর পূর্বপুরুষ" দেখে তার কৌতূহল বেড়ে গেল। আপনি গঙ্গারিডি বলতে কোন্ স্থানকে বোঝাচ্ছেন? আর

বাঙালীর পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কি তথ্য পেয়েছেন? প্রশ্ন শেষ হলে সুদর্শন তার নাম ও পেশা সম্পর্কে ও উল্লেখ করল।

নরোত্তমবাবু খুব উৎসাহ বোধ করলেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, বড় বড় পণ্ডিতরা আমাদের বিকৃত ইতিহাস লিখেছেন। খৃ পূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক ও রোমক লেখকগণ গঙ্গারিডি কাব্যের উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিস ৩০২ খৃঃ পূর্বাব্দে ভারতে এসে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে ও আপনি দেখতে পাবেন। ডিওড়োরাস, প্লিনি, টলেমি, কার্টিয়াস রুকাস, জুলিয়াস সেলিনাস, ভার্জিল ও ফাকরাসের বিবরণেও উল্লেখ আছে। এঁদের লেখার ওপর ভিত্তি করেই আমি লিখেছি ও সংগ্রাম করে যাচ্ছি।

—সংগ্রাম করছেন কেন?

—আপনাদের মত পণ্ডিতরা আমার মত গেঁয়ো শূদ্রের কথা শুনবেন? বাবাবাঘা ঐতিহাসিকরা যা লিখেছেন, তাই আপনাদের কাছে বেদবাক্য! বলেই তিনি মৃদু হাসলেন। তাঁর কথার মধ্যে এমন একটা তেজ আছে যা অন্যশ্রোতাদেরও আকৃষ্ট করল।

—আপনি একাই এসব নিয়ে গবেষণা করেছেন? আর কেউ নেই?

—আমি এ মাটির মানুষ। স্কুল মাস্টারীর সামান্য বেতন আমার একাজেই ব্যয় হয়। ঘোরাঘোরি করা, পত্রিকা বের করা বই ছাপানো, সংগ্রহশালা রক্ষা করা। কারও অর্থ সাহায্য পাইনা। সুন্দরবন ঘুরে ঘুরে বহু প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেছি। একদিন এসে দেখে যান। কলকাতা থেকে এত কাছে তবু আপনারা খোঁজ রাখেন না। কাগজে শুধু সস্তা খবর, আর বাজে লেখা। মৌর্য, গুপ্ত, কুশান যুগের বহু-নিদর্শন পাওয়া গেছে। স্বর্গীয় কালীদাস দত্ত, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বিনয় ঘোষ, পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, জগন্নাথ মাইতি দীর্ঘদিন গবেষণা করে বহু তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন। আমার বয়স হয়ে এসেছে। আপনারা আগ্রহী হোন, এগিয়ে আসুন।

ঝাঁঝালো কথা হলেও সুদর্শন আহত হয় না। বেশ ব্যক্তিত্ব

সম্পন্ন মানুষ। একটু বেশী কথা বললেও স্পষ্টবাদী, ঋজু চরিত্র।

বাসের শব্দে মাঝে মাঝে গলা ডুবে গেলেও গুণীশ্রোতা পেয়ে উনি উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন। আপনারা জানেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবনে বসতি স্থাপনের কাজ শুরু হয়। লেফটন্যান্ট ডবলু. ই. মরিশন, ক্যাপ্টেন হিউজ মরিশন প্রমুখ সুন্দরবনের ১,৭০২,৪২০ একর জমি ২৩৬টি ব্লকে চিহ্নিত করে ৯৮টি লাট ভাগ করে বিতরণ করেন। ১৮৬৩-৬৫ সালে ম্যাপ তৈরী করে আরও ১১৮টি লট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলি করা হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে জমিদারী পেয়ে জমি জরিপ ও লট-এ ভাগ করতে শুরু করেন। ২৪ পরগণার কালেকটর জেনারেল ক্লডরাসেল, টিলম্যান হেংকল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৩ সালে অরণ্য অঞ্চল বনদপ্তরের অধীনে চলে যায়। ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে বাঙলা সরকার এই বন রায়তদারী হিসাবে পেয়ে যায়।

একটু দম নিয়ে বলেন, তার পূর্বের ইতিহাস আপনারা জানেন না। হিউয়েন সাঙ্ সুন্দরবনে জৈন মন্দির, ত্রিশটি বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম, শতাধিক হিন্দুমন্দির দেখেছিলেন। আজও পুকুর খনন করতে গিয়ে কোথাও মন্দির, পাকাবাড়ী, গুপ্তধন, মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। গুপ্ত পাল ও সেন যুগের বস্তুই বেশী। গর্বের সঙ্গেই বললেন আলেকজাণ্ডার প্রাসি ও গঙ্গারিডিদের সমর শক্তির কথা শুনে আর এদিকে এগোন নি।

—এসব রাজ্য কোথায়?

—প্রাসি বলতে বিদেশী পর্যটকরা বিহার, মগধকেই বুঝিয়েছেন। আর গঙ্গারিডি হল সমুদ্রোপকূলবর্তী নগর। পুণ্ড্রবর্ধনদের অর্থাৎ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের বাস ছিল। তখন যশোর, খুলনা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এলাকাকে বোঝাত। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে পেরে না উঠে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা গঙ্গাসাগর এলাকার বসবাস শুধু করে। ব্যবসা, বাণিজ্য করে তারা খুব উন্নত হয়েছিলেন। এখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাঙালী কৃষ্টি ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এরাই বাঙালীর পূর্বপুরুষ।

—এসব কথা কে বিশ্বাস করবে? সন্দেহ প্রকাশ করে সুদর্শন।

—রামায়ণে সাগরদ্বীপকে রসাতল বা পাতাল বলা হয়েছে। তখন ছিল গভীরবন, কপিলমুনি আশ্রম স্থাপন করে বসবাস করতেন। সাগররাজা কালক্রমে রাজত্ব শুরু করেন। ভগীরথ গঙ্গার ধারা আনার ব্যবস্থা করেন। জনবসতি গড়ে ওঠে। এরা যোদ্ধার জাত। মহাভারতে 'ম্লেচ্ছ' বলে উল্লেখ আছে। কালিদাস রঘুবংশে এদের নৌযুদ্ধে নিপুণ, পেরিপ্লাসের বর্ণনায় সম্পদশালী জাতি ও টলেমির মানচিত্রে গাঙ্গে বন্দর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আর কত প্রমাণ চান? প্রাচীন গঙ্গে বন্দর এখন সমুদ্রগর্ভে। আদি প্রস্তর যুগ থেকে এখানে সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, তবে একথা মনে রাখবেন, এখানে আর্যদের কোন প্রভাব পড়েনি। আমাদের হরিজন বলতে পারেন।

সুদর্শন আর কথা বাড়ালো না। কথায় কথায় বাসপ্রায় কলকাতায় কাছাকাছি এসেছে। উনিও ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন। সে ওর নাম ঠিকানা লিখে নেয়। ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ জানায় বাসায় অতিথি হতে।

কি মনে করে উনি একটি বই ও পত্রিকা সুদর্শনের নামে উৎসর্গ করে বললেন, দয়া করে পড়ে মতামত জানাবেন, সমালোচনা করবেন। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও ধর্মীয় উপাখ্যান থেকে মালমসলা সংগ্রহ করেছি। আপনারা প্রচার করলে গবেষণার কাজ প্রসার হবে, গবেষণা করতে অনেকে এগিয়ে আসবেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র, বিনয় ঘোষ দের বই আমার পড়া আছে। তবে আপনার কাছে অরূপ তথ্য শোনা গেল। রামায়ণ ও মহাভারতে কপিলমুনির আশ্রমের কথা উল্লেখ আছে। এই অঞ্চল যে চন্দ্রবংশীয় রাজা সুষেনের রাজ্যভুক্ত ছিল, পদ্মপুরাণ পড়ে জেনেছি। ১৪৬৫ সালে সুলতান রুকুনদ্দীন বরাবকের রাজত্বকালে সুন্দরবনের নানাস্থানে মুসলমানদের ও বসবাস শুরু হয়। পাল ও সেন রাজাদের আমল

থেকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবও বিস্তার লাভ করে। শুধুমাত্র শূদ্র সংস্কৃতি, এ কথা মানতে রাজী নই। মিশ্র সংস্কৃতি বলতে পারেন। কোন কোন ঐতিহাসিক গঙ্গেবন্দর বলতে দেগঙ্গাকে বোঝাচ্ছেন। গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী নাকি বেড়াচাঁপা ছিল। তর্ক করে লাভ নেই। ব্যাপক গবেষণার দরকার।

—আর কবে হবে? বেড়াচাঁপা খনন সম্পূর্ণ হলে আরও নতুন ইতিহাস বের হত। কোটি কোটি টাকা সরকার নানা ভাবে নষ্ট করেন, এদিকে লক্ষ্য নেই।

—সময় সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে এসব অঞ্চলে ঘুরব ঘুটিয়ারী শরীফ, ছত্রভোগ, খাড়ি, পাথর প্রতিমা, জটার দেউল আরও কিছু স্থানে ঘুরে কিছু লেখা লেখি করব। আপনার সাহায্য নেব।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। সুদর্শনকে বার বার অনুরোধ জানান কাকদ্বীপে তাঁর বাড়ীতে আসতে। বাস ধর্মতলায়। সকলের নামার পালা। বাস হালকা হলে ওরা নামে। ধন্যবাদের পালা শেষ করে যে যার পথ নেয়।

কলকাতায়

বেলা ছটোয় ধর্মতলায় এসে যেন স্বর্গে পৌছন ওরা। সুদর্শন বিশ্বনাথকে বলল, ফটোগুলি তাড়াতাড়ি রেডী করে ফেলবে, কুমীরের ছবি এনলার্জ করবে। গোসাবায় অনিমাকে উপহার দেব। তুমি একদিন বাসায় আসবে আজ রেস্ট নেব, কাল থেকে অপিসে যত তাড়াতাড়ি পারি লেখায় হাত দেবো।

ঘরে ফিরে খান দশেক চিঠি, কয়েকটা ম্যাগাজিন, কাগজপত্র, টেবিলে দেখল। তিনখানা অনিমার, একখানা সুধীর বাবুর। নিমন্ত্রণের কার্ড ছাপিয়ে পাঠিয়েছেন। তার নামও বক্তা হিসাবে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছাপা হয়েছে। খুশিতে তার মন ভরপুর হয়ে উঠে।

অনিমার লেখা চিঠির একটা খামের মুখ খোলা। মা বা বোনের কাণ্ড হতে পারে। অনিমা লিখেছে—পড়াশুনায় মন বসছেনা। শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। এবার আসলে তোমার একটা ফটো নিয়ে আসবে, আমার কাছে রাখবো। উৎসবে এলে খুব মজা হবে। নিবেদিতাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়োবো। নিবেদিতা খুব বাজে কথা বলে। তুমি এসে ওর কানটা মুলে দেবে।

পড়তে পড়তে সে হেসে ফেলে। বড্ড ছেলে মানুষ অনিমা, না হলে এভাবে কেউ লেখে? সুদর্শন ডায়েরীর পকেট থেকে ওর ফটোটা বের করে কিছু সময় অপলক ভাবে তাকিয়ে থাকল। বোন এসে ঠ্যালা দিলে সম্বিত ফিরে পায়।

বুঝেছি ঘরে বৌদি আনবে। মাকে সব বলেছি। মা, বাবাকে বলেছেন। কি মজা হবে। আমি একজন খেলার সাথী পাবো।

সুদর্শন তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে ছবিটা লুকিয়ে ফেলে। মা এসে বলেন, খোকা আমি গোসাবার উৎসবে যাবো, অনেকদিন কোথাও যাচ্ছিনা। এবার নবদ্বীপ যাওয়া হবে না।

সে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে। মুচকি হাসে। খেয়ে দেয়ে টেপরেকর্ড চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বোন এসে টেপরেকর্ড বন্ধ করে দেয়। এক ঘুমে সন্ধ্যে হয়ে যায়। বোনের বন্ধু বিজয়া, শম্পা, ভ্রমণের গল্প শুনতে আসে।

সুদর্শন একটু প্লাস মাইনাস করে গল্প বলে যায়। ওরা বিস্ময়ে শোনে! গল্পে গল্পে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, রাতে অনিমাকে চিঠি লিখতে বসে। বেশ কাব্য করে চিঠি লিখে 'শতবর্ষের প্রেমের গল্প' বইটা বের করে চিঠির শেষে জুড়ে দেয় কবিতাংশটি।

বিবস্বান যেমন দিনের পর দিন ঘুরেছে
এই দ্যালোক ভূলোকে—তোমার ও মনের
চারপাশে আমি হব সেই ঘূর্ণমাণ মহাগ্রহ।
যাতে তুমি আমায় ভালোবাস
হে নারী যাতে তুমি বিমুখ না হও।

চিঠি লেখা শেষ হলে একবার পড়ে দেখে বেশ কাব্য ধর্মী হয়েছে।

তারপর সুধীরবাবুকে অনুষ্ঠানে যাবে বলে চিঠি লিখল। অনুষ্ঠানের পরদিন বিকালে রাঙা বেলিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি কাঞ্জিলালকে সম্বর্দ্ধনা দেবেন। উনি সম্প্রতি 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন। সুন্দরবনের উন্নতি কল্পে তাঁর অবদানের জন্যই এই সম্মান।

তাই একদিন আগেই তাকে যেতে হবে, মা বোন আর বন্ধু শ্যামল চ্যাটার্জি সঙ্গে যাবে। শ্যামল গান লেখে, অভিনয় করে নাটক লেখে ও পরিচালনা করে। তারপর স্টুডিও করেছে। বেশ গুণী ছেলে। দিন এগিয়ে আসছে, গোছগাছ শুরু করে দিল সে।

ইতিমধ্যে এরকম খান কয়েক চিঠি অনিমাকে লিখেছে সে। চিঠিতে উচ্ছ্বাস ও প্রেমের ছোঁয়া মেশানো। আর অনিমার চিঠিতে গুরুদেব আর সুধীরবাবুর কথা। ঐ টুকু মেয়ে কত জ্ঞান দিতে যায়। মানুষের মঙ্গলের জন্য লিখবে। আদর্শ নিয়ে লিখবে, আর্যদের গৌরব গাঁথা প্রচার করবে, চিঠির মধ্যে এসব অনুরোধ জুড়ে দেয় অনিমা। সুদর্শন বসে নেই, কলকাতার মন্দিরে গিয়ে ওর গুরুদেবের কিছুবই,

জীবনী, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেবের দিব্যজীবন ও বাণী বিষয়ক বইগুলি পড়তে লাগল, নতুন এক আলোকে ও জ্ঞানে সে সঞ্জীবিত হতে লাগল। এত দিনের বিদ্যাবুদ্ধিতে ঠোক্‌কর লাগলো। সে উপলব্ধি করল, ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীচৈতন্য একদিন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর অজ্ঞানীদের ঘুম ভাঙাবে, জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার আলো দেখাবে।

এর মধ্যে একদিন অজিতবাবু এসে হাজির। সুদর্শনের বাবাকে অনুরোধ জানালেন সুকন্যাকে বিয়ে করতে।

সাধ্যমতো দেবেন। অন্য জাতের মেয়ে কেন ঘরে তুলবেন? একবার স্টাইপেণ্ড, আবার কোটা ধরে চাকুরী, প্রমোশন, সরকার একেবারে ছোটলোকদের মাথায় তুলে দিচ্ছেন। মাদ্রাজে, কর্ণাটকে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছে।

সুদর্শন রেগে যায়। বলে আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি চাই সৎ ও ভালোমানুষ। দেশ ও দশের উন্নতির কথা ভাবে এমন মানুষ। বর্ণহিন্দুদের বিশেষতঃ পুরুহিতদের জন্যইতো দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও অশিক্ষিত হয়ে আছে। তাই তো দেখছি জাতপাত নিয়ে কত দ্বন্দ্ব বিবাদ। বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশে রক্তপাত পর্যন্ত হচ্ছে, মাদ্রাজের ব্রাহ্মণরা বাড়াবাড়ি করছেন। সরকার কোন ন্যাশানাল প্ল্যান পর্যন্ত করতে পারছেন না। কাগজে এসবনিয়ে অনেক লিখেছি, ভারতবর্ষের সমস্ত গরীব ও অশিক্ষিতদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরীর সুযোগ চাই, আর তাতে নিম্নবর্ণের লোকরাই বেশী উপকৃত হবে, কারণ তারা সংখ্যায় বেশী। কিন্তু বর্তমান নিয়মে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ চলছে।। ভবিষ্যতে আরও কত রক্তপাত হবে তা কে জানে? আর্যদের বর্ণ বিভাগ আজ জাতপাতে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের পাতায় কোন প্রমাণ নেই সমস্ত বর্ণ হিন্দুরা ধনীও শিক্ষিত ছিল। আর নিম্নবর্ণরা সকলেই অশিক্ষিত ও গরীব ছিল। বরং ঋকবেদে দেখাযায় বৈশ্য ও শূদ্রদের পরাস্ত করতে আর্যদের প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়েছে। দীর্ঘদিন লড়াই করতে হয়েছে। ইন্দ্র বা

সূর্যকে উপাসনা করলেই 'আর্য' হওয়া যেত। উপাধি ভিত্তিক কোন জাত পাত বর্ণভাগ ছিল না, অথচ একালে এসব জাঁকিয়ে বসেছে। মানুষে মানুষে এত বিভেদ কেন? সুদর্শন গম্ভীর হয়ে বলে, এক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত বর্ণহিন্দুর ক্রিয়াকলাপে আজ শূদ্ররা দানা বাঁধছেন, বিক্ষুব্দ হয়ে উঠেছেন। ত্রিশ বছরের জীবনে কি নেতা, কি সমাজসেবী, বিপ্লবী, লেখক, সম্পাদক, ক্ষমতা প্রাপ্ত বর্ণ হিন্দুদের ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতা, হানমণ্যতা, ক্ষমতার অপব্যবহার আত্মস্বার্থ কি না দেখছি? এক ডজন নাম তো বলতে পারি যাঁরা বর্ণ হিন্দুদের কলংক। ক্ষমতা পেয়ে যত রকমের অন্যায় ও অবৈধ কাজ করা যায় তা করেছেন। এই মুষ্টিমেয় বর্ণ হিন্দুদের কুকাজের জন্য সমগ্র বর্ণহিন্দুরা দোষী হয়ে আছেন। কেন দেশে আজও জাতপাত নিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব চলেছে? পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি নেই। এজন্যই বুঝি ভারত কি বিচিত্র দেশ।

এ সব ভাবলে মাথা গরম হয়ে ওঠে আমার। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়। মনুর পুত্র ঋষির বংশধরদের এই গতি। উত্তেজিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে সে বক্তৃতায় মত আরও শোনায় আমি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে বুঝেছি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের যুগ শেষ হয়েছে। এবার শুদ্রদের যুগ। কলিযুগ শেষ হবে শূদ্রদের শাসনে। সত্যযুগের সূচনায় গুণকর্ম বিভাগ : হিসাবে মানুষ চলবে, আমার 'মা, বাবা ঠাকুর-দাদাদের কাছে মানুষই বড়, জাত পাত বড় নয়। তাইও বিয়ে আমি করবই। আপনাদের যুক্তি শুনব না। এ বিয়ে শাস্ত্র সম্মত, বিজ্ঞান সম্মত। সুদর্শনের বাবা ও এ যুক্তি মেনে নিয়েছেন।

এ বিয়ে শাস্ত্র সম্মত, বিজ্ঞান সম্মত। সুদর্শনের বাবা এ যুক্তি মেনে নিয়েছেন।

শাস্ত্রে আছে বাক্য দানই বিবাহ। মেয়ে যদি কোন পুরুষকে স্বামীরূপে কল্পনা করে থাকে, বাক্যদান করে থাকে। এমন স্থলে অভিভাবক যদি জিদ করে অন্যস্থানে মেয়েকে সমর্পণ করে, অভিভাবক মহাপাতক হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাগদত্তা কন্যার অন্যস্থানে

বিবাহ হল নিঃসন্তান বিধবার মত। হিন্দু শাস্ত্র একথা বলেছে।

আরও আছে-পুরুষের অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ একান্ত প্রয়োজন। তাতে নিকৃষ্ট পুরুষদের ঘরে মেয়েদের বিয়ে হবে না। বরং নিম্ন বর্ণের ঘরের মেয়েরা বর্ণহিন্দুর ঘরে এসে সমাজকে পুষ্ট করবে। দেশে সুসন্তান জন্মাবে। আমেরিকাতেও নষ্ট পুরুষদের বিবাহ নিষেধ। তর্কে না পেরে অজিতবাবু হতাশ হলেন।

মুখ গোমড়া করে উঠে পড়েন তিনি। সংক্ষেপে শুধু বললেন, কিছু বলার নেই, সব দিক ভেবে দেখুন। আমার কথাও ভাববেন।

থাক আর বলবেন না। আমি কোন দিনই সুকন্যার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক গড়তে সুযোগ দিইনি। কাকুর মতই সম্পর্ক নিয়ে ছিলাম।

অজিতবাবু আর তর্ক করলেন না দ্রুত বেরিয়ে এলেন পথে।

পুনরায় গোসাবায়

সুদর্শন এ কয়দিনে আরও নানা তথ্য সংগ্রহ করে ফেলল, 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় 'অতীতের পাতা থেকে' হেডিং দিয়ে প্রতিদিন অতীতের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি তুলে ধরছেন। ২৩শে এপ্রিল ১৯৫০ সালের সম্পাদকীয় 'সুন্দরবনের দাবী'তে উল্লেখ করেছেন, ১৯৫০ সালের সর্বনাশা বন্যার পর এ অঞ্চলের মানুষদের দুর্গতিকথা স্মরণ করে বলতে হয় সুন্দরবনের সমস্যা মূলত পাঁচটি—(১) বন্যা নিরোধের জন্য বাঁধ সংরক্ষণ, (২) জল নিকাশ, (৩) যাতায়াত ও সংবাদ আদান প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি করা (৪) ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার এবং (৫) লঞ্চ ও নৌকার সার্ভিস বাড়াতে হবে।

সুন্দরবনের বহু নদী মজে যাচ্ছে, একমাত্র প্রস্তাবিত গঙ্গাবাঁধ নির্মাণ করলে স্থায়ী প্রতিকার হতে পারে। সরকারের মনে রাখা উচিত কলকাতার জন্য চাল, মাছ, তরকারী ইত্যাদি এখান থেকেই সরবরাহ করা হয়। সরকার কেন যে যত্নবান হচ্ছেন না তা দুর্বোধ্য।

১৯৫৪ সালে পঃ বঙ্গে ছিল কংগ্রেসী শাসন। দিল্লীতেও তাই। বামফ্রন্ট সরকার ততটা উদাসীন নন। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা এখানে ব্যয় হয়েছে। সুদর্শন সরকারী তথ্য সংগ্রহ করেছে। ১৯৫০ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে কাজে নামেন। নানাস্থানে চৌদ্দটি ছোট ও ছাব্বিশটি বিকাশকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেতু ও রাস্তা নির্মাণ প্রাথমিক ভাবে গুরুত্ব পায়। স্থানীয় কৃষক, কারুশিল্পী, হাঁস, মুরগী, শূকর ও গোপালক ও মৎস্যজীবীদের নানা প্রকার সাহায্য দেওয়া হয় এই বিকাশকেন্দ্রগুলি থেকে। কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক দ্রব্য সরবরাহ করে থাকে। সহজ কিস্তিতে ও কম সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

১৯৫০-৫৬ সালে বরাদ্দ হয়েছে ৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এ-

টাকায় এক ফসলী জমিকে দু' বা তিন ফসলী করা হচ্ছে, কৃষি-বিজ্ঞানের প্রসার, সামাজিক বনসম্পদ সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য চাষ মজাখাল ও পুকুর সংস্কার, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ, ফুল-ফলের চাষ ও পশু-পালনে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্ক-এর যৌথ উদ্যোগে (আইফাড) রাস্তা, সেতু, স্লুইচ গেট, ড্রেন, বাঁধ ইত্যাদি গড়ে উঠছে। নিমপীঠে ও কাকদ্বীপে 'কৃষি-বিজ্ঞানকেন্দ্র', বাজার উন্নয়ন সমিতি গড়ে উঠেছে। ক্যানিং এ দশটা বরফ উৎপাদনের কল তৈরী হচ্ছে। ঝড়খালিতে মাছের চাষের আধুনিক ব্যবস্থা হয়েছে। নামখানার মহিষানি দ্বীপের খামার প্রায় ২০০ হেক্টর হবে আয়তনে। কাঁকড়া মারির মৌসানী দ্বীপে মাছ চাষ প্রকল্প রূপায়নের পথে। সম্প্রতি ২৩৬টি পুরুষের এবং ১২০টি মহিলাদের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়েছে। পানীয় জলের নলকূপ বসছে নানা স্থানে।

খবরে আরও প্রকাশ হয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। 'কোর এরিয়ায়' গবেষণা কাজ চলবে। 'বাফার জোনে' গাছকাটা, মধুসংগ্রহ, মাছ ধরা ইত্যাদি চলবে। আর 'প্রিমিটিভ' এলাকায় কাজকর্ম নিষিদ্ধ। প্রয়োজনে গবেষণা চলতে পারে।

কোথা দিয়ে সময় চলে যায় সুদর্শন টের পায় না। কাজের চাপে ক্যালেণ্ডারের দিনগুলি যেন ঘোড়ার পিঠে লাগাম দিয়ে চলছে।

আজ ওর গোসাবা যাবার দিন। সকাল থেকে ব্যস্ততা। জিনিষ-পত্র রাতেই গোছানো হয়েছে। সঙ্গী মা ও শ্যামল। শিয়ালদা থেকে ক্যানিং। ক্যানিং থেকে লঞ্চে গোসাবায়।

লঞ্চে উঠে সুদর্শন মাকে বসিয়ে শ্যামলকে নিয়ে একপাশে বসল। সামনে কয়েকজন ভদ্র লোক বসে রাজনীতি, ধর্মকথা নিয়ে আলোচনা করছেন। সুদর্শন কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করল, দাদারা কোথায় যাবেন? কোথা থেকে এলেন?

ওর প্রশ্ন শুনে একজন বললেন, আমার নাম অনিল ঘটক, গোসাবা

যাব, দমদম দাশভিলায় থাকি। ইনি শ্রদ্ধেয় হীরালাল চক্রবর্তী, শোভাবাজারে থাকেন। বড় বৈষ্ণব, সুবক্তা। আর উনি প্রভাত দত্ত, হেদুয়াতে থাকেন। ধর্ম-কর্মে অর্থের যোগান দিতে কার্পণ্য করেন না। এই ভদ্রলোক গোবিন্দ মণ্ডল, চাঁদপাড়া থেকে এসেছেন, ইস্কন সদস্য। উঃ ২৪ পরগণা নবম ইষ্ট সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম পৌঁছে দিচ্ছেন। খুব পরিশ্রমী। এই দেখুন না বইপত্র নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামে ঘুরবেন। বই বিক্রী করবেন।

কথার শেষে শ্যামলের ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, আপনারা কোথায় যাবেন?

—সুদর্শন সংক্ষেপে তাদের কথা বলল। আপনাদের মত গুণীদের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হলাম।

কথায় কথায় অনিলবাবু জানালেন, তিনি একজন শিক্ষক। প্রবন্ধ, গল্প লেখার বাতিক আছে। আশ্রমের মুখপত্রে মাঝে মাঝে লেখেন। তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না। ভাল কাগজ পেলে অনেক কিছুই লিখতে পারতেন।

সুদর্শন খুব খুশি হল। বই না পড়ে এদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

ওঁরাও সাংবাদিককে পেয়ে খুশি। কাগজে সংবাদ, ফটো বের হবে।

অনিলদা, হীরালালদা সুন্দরবনের বহুস্থানে ঘুরেছেন। বক্তৃতা দিতে, মন্দিরের অর্থ তুলতে ধর্ম প্রচারে প্রায়ই এঁরা আসেন। আপনি কিছু তথ্য ওদের কাছে পেতে পারেন। প্রভাতবাবু সুদর্শনকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' নাম হল কেন? এর চেয়ে বড় বাঘ কোথাও নেই? সুদর্শন জিগ্যেস করে অনিলবাবুকে।

সুদর্শনের প্রশ্ন শুনে অনিলবাবু বললেন—১৮৭৫ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছেলে সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতবর্ষে আসেন। এবং সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে যান। একটা বাঘ মেরে

'রয়্যালবেঙ্গল' খেতাব পান। সেই থেকে সুন্দরবনের বাঘ ঐ নামে পরিচিত হল। রাজপুত্র বাঘের গায়ে এক পা তুলে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ অবস্থায় ফটো তুলে রাখা হয়। অনেক বইতে ঐ ছবি দেখেছি।

তবে এখানকার বাঘের মত চতুর, হিংস্র, ক্ষিপ্রগামী বাঘ অন্যত্র দেখা যায় না। জলে সাঁতার কেটে. গরু মোষ পিঠে বয়ে নিতে আর কোন অঞ্চলের বাঘ পারে না। হীরালালবাবু বললেন, বাঘ, সাপ, হরিণ, মাছ অন্যত্র জীবজন্তুর এমন একত্র সমাবেশ বিরল। কলসে মিষ্টি জলের পুকুর আছে। বাঘ জল খেতে আসে। বনে যেতে পারবেন না। তবে নৌকায় ঘুরে দেখতে পারেন। বনমোরগও খুব দেখা যায়।

অনিলবাবু পুনরায় বললেন, সুন্দরবন তো শেষ হয়ে এল। নাম-খানা দিয়ে বন যে ভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, নদীতে জালটানার জন্য ভূমিক্ষয় হচ্ছে তাতে 'বন' আর বলা যাবে না। আজ কোন মূল্যবান গাছই দেখা যায় না। কোন কাঠই বড় কাজে লাগে না। জ্বালানি, বেড়া, খুঁটির কাজই চলে। বনের অফিসাররা ঘুষ খেয়ে ফুলে উঠেছেন।

এখানকার এম. এল. এ, এম-পিরা কিছু করছেন না? জন-সাধারণ কি মরে গেছে? কেউ কিছু বলেন না? সুদর্শন জিজ্ঞাসু।

—কে কি বলবেন? ষোলজন বিধায়ক, দু'জন লোকসভার সদস্য নির্বাচনের পর নীরব। চাকুরীজীবী ৩%, কৃষিজীবী ৮৫%, দিন মজুর ১০%, ছোট ব্যবসায়ী ৬%। আমি যতদূর জানি মাথা পিছু জমি মাত্র চৌদ্দকাটা। সরকারী উদ্যোগে বীট চাষ করে বীট চিনি উৎপন্ন করতে পারে। খুব লাভজনক ব্যবসা হতো। তাছাড়া বীট থেকে গুড়, এলকোহলও তৈরী করা যায়। বীট জমির লবণ চুষে নেয়, ফলে অন্যান্য ফসলেরও উপকার হয়। বীটের পাতা পশুদের উত্তম খাদ্য। এ অঞ্চলের গরু ঘাসের অভাবে ভাল দুধ দেয় না। গরুর স্বাস্থ্য ভাল নয়। বীট চাষ হলে গরুগুলি উত্তম খাদ্য পেত, দুধও বেশী দিত। এলকোহল ঔষধ শিল্পে প্রয়োজন। পঃ বঙ্গের অর্থনীতি চাঙ্গা হতো।

সুদর্শন ১৯৫২ সালের ১লা আগস্ট মহাকরণে সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়ের ঘরে যে আলোচনা হয়েছিল তা বলল—আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার কৃষি উন্নয়নে ৩২ কোটি টাকা দেবে। এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ডঃ ফারুক বলেছেন, তিনি এসে সরেজমিনে কাজকর্ম দেখবেন। ক্যানিং, কাকদ্বীপ নেজাত এই তিন ভাগে ভাগ করে উন্নয়ন প্রকল্পে হাত দেবেন। ২৮০ কি. মি পাকা রাস্তা হবে। ৫০০ হেক্টর একর জমি বাঁধ দিয়ে চাষযোগ্য করবে। মজাখাল সংস্কার হবে। আর পিয়ালী নদীর দু'পাশে ৪৫ কি. মি লম্বা ও ১২০ ফুট চওড়া বাঁধ দিয়ে পাঁচটি থানার উন্নতি করা হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যে নামখানায় 'মৌসুমী' আর ঝড়খালিতে মেছোঘেরী তৈরী হবে।

—কাগজে এসব পড়েছি। ছোট চাষীদের বীজধান দিলে কি হবে? অভাবে সব খেয়ে ফেলবে। সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে কিছু করা যাবে না। বিদ্যুৎ হলে বরফ কল, বিড়ির কারখানা, কাঠ চেরাই কল বসিয়ে বহু লোকের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে। নয়ত বর্তমানে যা চলছে তাতে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। ভারতের সর্বত্র বৃহৎ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ভূমি সোনা ফলাতে পারে। কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ক্যানিং ছাড়া গোসাবা, বসিরহাট, ঝিঙাখালি বাগনারেঞ্জ, সজনেখালি, হলদিবাড়ী, পাখিরালা ও বুড়ির ডুবরি কার্যালয়ে মাত্র বত্রিশজন কর্মী, ঘুম পাড়ানি বন্দুক মারার লোক মাত্র একজন, আর ভটভটি মাত্র দু'টি। কর্মীরাও অসন্তুষ্ট।

এদের কথাবার্তা শুনে পাশের একজন বলল, বাবু বাঘে মারলে মাথা পিছু দু'হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা। জানুয়ারী মাসে হিরন্ময়পুরে ফণীমণ্ডল, চিমা দাস বাঘের পেটে গেছে। এখনও কোন টাকা পায়নি। কবে পাওয়া যাবে কে জানে?

জেমসপুরের আশুতোষ মণ্ডল নামে একজন বললেন, লাহিড়িপুরে প্রায় পঞ্চাশ জনকে বাঘে খেয়েছে। এদের সংসারের কি হবে? গ্রামে গ্রামে বন্দুকধারী পাহারাদার না রাখলে বাঘ হানা দেবেই।

কাগজেই পড়েছি একটা বাঘের বিচরণ করতে দশ বর্গ কিলোমিটার জায়গা লাগে। সে পরিমাণ জায়গা পায় না বলেই এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়ে। তাছাড়া একটা বাঘ বারো কিলো মাংস খায়। না পেলেই গ্রামে হানা দেবে। আমাদের কথা কি বাবুরা ভাবেন? বাবুরা তো কলকাতা থেকে নরম গদি আঁটা বাসে সোনাখালি এসে বিলাসী লঞ্চ 'মধুকর'-এ বন দেখতে যান। আমাদের কি লাভ? গোসাবার মালোপাড়া এখন 'বিধবাপল্লী'। বিধবা বৌরা কলকাতায় গিয়ে ঝিগিরি করছে, এখানে জনমজুর হিসাবে খাটছে।

সুদর্শন সঙ্গে সঙ্গে বলল কেন 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থা' ভারতকে দু' বছরের জন্য দু'কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন। সুন্দরবনের ভাগে পড়েছে ষাট লক্ষ টাকা। ভবিষ্যতে নাকি ন্যাশানাল পার্ক হবে ১৩৩০ বর্গ মিটার জুড়ে।

ঐ স্বপ্নই দেখুন। এ টাকা যখন শোধ দিতে হবে তখন ঠ্যালা বুঝবেন। এক বস্তা টাকা দিয়ে তখন এক ব্যাগ জিনিষ পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে অনিলবাবু মন্তব্য করলেন।

হীরালালবাবু বললেন সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিটি গ্রামে একটা ফাঁড়ি ও সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রত্যেক থানায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চাই। পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা চাই। বহু স্থানে শীতের পর বর্ষা পর্য্যন্ত পুকুর, খালের জল কালচে, হলুদ, বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ হয়ে যায়। পাঠানখালি, কচুখালি ও বিপ্রদাসপুরের মধ্যে বেলতলি বলে একটা জায়গা আছে। বড় হাট বসে। লক্ষাধিক জনসংখ্যা। একটু ভালো জলের জন্য ওদের কি তৃষ্ণা! মাছরাঙার মত তাকিয়ে আছে সরকারের দিকে।

কথায় কথায় সময় চলে যায়। অনেকটা পথ পেছনে ফেলে আসে। অনিলবাবুদের দু'প্রস্থ চা-পান হয়ে যায়। ফাঁকে ফাঁকে সুদর্শন ওদের কথা নোট করে রাখে। যাত্রীরা ওকে দেখে কিছু একটা ভাবে।

বেলা আড়াইটায় গোসাবায় পৌছল, মন্দিরের ছেলেরা দাঁড়িয়ে-

ছিল। সকলের হাত থেকে ব্যাগ, বাক্স জিনিষপত্র নিয়ে হৈ হৈ করে মন্দিরের দিকে গেল।

এরা রাস্তায় উঠতে না উঠতেই সুধীরবাবু এগিয়ে এলেন। কর-জোড়ে সকলের কুশলবার্তা জিগ্যেস করলেন।

মন্দিরের গেটে পৌঁছলে সকলে ধ্বনি দিয়ে উঠল। আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

মন্দিরে রান্না করে ভাত তরকারী রেডি রেখেছেন। অবেলায় কেউ স্নান করলেন, কেউ মাথা ধুয়ে গা মুছে ফেললেন। তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা।

সুদর্শনের দখলে একটা বেড। হীরালালবাবুদের দখলে পাশের রুম। গেস্ট হাউস জমজমাট। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে থেকে লোকজন এসেছেন, আরও আসবেন। সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা প্যাণ্ডেল হয়েছে। অন্যরা বারান্দায় থাকবেন। ত্রিপল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। মোটরযন্ত্র আলো দিতে, জল তুলতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

সকলেই খেয়ে দেয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিল। সুদর্শন মাকে বলল, তুমি মন্দিরের পূজা, আরতি দেখ, আমি আর শ্যামল ঘুরে আসি।

হালকা পায়জামা পাঞ্জাবী পড়ে দু'জনে সুভাষের ঘরে গেল। সুভাষ বলল, অরুণদা নামখানায় বদলি হ'য়ে যাচ্ছেন। কুমীর প্রকল্পের অফিসার এখানে আসবেন। লোক নাকি সুবিধার নয়।

সুদর্শন ভগবৎপুরের কুমীর প্রকল্পের গল্প বলল, গল্প শেষ হলে সুভাষ বলল, বসুন অনিমাকে খবর দিয়ে আসি। চ-মিষ্টির একটু ব্যবস্থা করতে হয়।

এই মাত্র ভাত খেয়ে এলাম। অনিমাকে ডেকে আনুন। একটু আলাপ করব, শ্যামল বলল।

নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে বলল ঠিক বলেছেন, আমাকে পাগল করে ফেলেছে। সব সময় শুধু সুদর্শনবাবুর কথা। শুভকাজ শীঘ্র না করলে পাগল হয়ে যাবে।

অনিমা এল। চোখাচোখি হতেই লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিল, শ্যামল বলল, 'তোর চয়েস্ আছে মাইরি। কলকাতায় সাজিয়ে নিয়ে গেলে মনে হবে মেইড ইন বোম্বে।

একথা শুনে ও আরও লজ্জা পেয়ে নিবেদিতার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, আরও দেখনাই, খোলতাই হয়েছে। অনিমাকে নিবেদিতা জোর করে সুদর্শনের পাশে বসাল। পাঁচজনের সামনে ও বেশী কথা বলে না। নিবেদিতা বিপরীত, চতুরা ও রসিকা। অনিমা ন'খানা চিঠি দিয়েছে। আপনি কেন তিনখানার জবাব দিয়েছেন? বেচারার ঘুম নষ্ট করেছেন। নিবেদিতা গম্ভীর হয়ে বলে।

সুদর্শন বলতে পারতো, সব চিঠিতে ঘুরে ফিরে একই কথা। তা না বলে, কাজের চাপ ও দক্ষিণের নামখানা ভ্রমণের কথা বলল।

নিবেদিতা চা না খাইয়ে ছাড়ল না। আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ হাসছে। গোসাবার মাঠ, ঘাট, নদী রূপালী চাদর গায়ে জড়িয়েছে। এদের মনেও তার ছোঁয়া লেগেছে। চা পর্ব শেষ হলে নিবেদিতা বলল, দাদা একটা কথা জিগ্যেস করব, কিছু মনে করবেন না।

—নির্ভয়ে বল।

—ওর মায়ের প্রশ্ন, ওর তো এখন শকুন্তলার মতো অবস্থা।

—খুলেই বল না।

—ওর মা জানতে চান, তোমার মা-বাবা এসব জানেন? শূদ্রের মেয়ে তো। শেষে যদি কিছু হয়?

··ও এই কথা। আমার মা বাবা কুলীন ব্রাহ্মণ হলেও এসবের উর্ধে? কানা, খোঁড়া, অন্ধ যেন না হয়। মানুষের আবার জাত কি? বর্ণভেদ মানি, জাত পাত মানি না। আজকাল শিক্ষা অর্থ, রূপ, গুণ এসব দেখা হয়। আমার মত ছেলেকেও কত শূদ্রের মেয়ে পাত্তা দেয় না জানো? ওরা আজ অর্থে, বিত্তে, শিক্ষায় কুলীন। এ যুগে ঐ প্রশ্ন টেঁকে না, পশ্চিমবঙ্গের মত প্রদেশে অন্ততঃ ভেদাভেদ নেই। অসবর্ণ বিয়ের ছড়াছড়ি। আজকাল ক'জন পাত্র বংশ, বর্ণ খোঁজে? এখন চায় শিক্ষিতা, সুন্দরী অর্থাৎ ডানা কাটা পরীদের। কেউ কেউ

তার সঙ্গে সম্পত্তি, অর্থ, গহনাদি চান। শ্যামল মুখ খুলল, হিন্দু সমাজ এই করেই গেল। প্রফুল্ল সরকারের 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' পড়লে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

আমাদের কু'শিক্ষার ফল। তবে বাঙালীদের শত দোষ থাকলেও জাতপাত নিয়ে তার লড়াই নেই। এজন্যই বাংলার মাটিতে বাঙালী হয়ে পুনর্জন্ম পেতে চাই। আজও জাতীয় সংহতি, ঐক্য বোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙালীই এগিয়ে আসে। এদের রক্ত আলাদা। একটু থেমেই সুদর্শন পুনরায় বলল, আমি জেনে শুনেই পা দিয়েছি। বামুন কায়েতের মধ্যে কি মেয়ের অভাব ছিল? সুকন্যাকে বিয়ে করলে ওর বাবা বড় পার্টি দিতেন।

কি হে নিজের কানে শুনলি তো? বীর পুরুষ একেই বলে। নিবেদিতা কথার শেষে অনিমাকে ঠেলে দিল। অনিমা নিশ্চিন্ত। বহুদিন মনের মধ্যে কাঁটা খচখচ করছিল।

কথায় কথায় রাত হয়েছে। সুভাষ এদের নিয়ে বের হল। টর্চ ধরে প্রথমে অনিমাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে সুদর্শনদের মন্দিরে পৌছে দিল। মন্দিরে এসে দেখে দেবমূর্তি অপূর্বভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এক ঐশ্বরীয় আলো যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সুদর্শন আত্ম-সমীক্ষা করল। মানুষ কিসের আকর্ষণে আসে? মানুষ স্বার্থ ছাড়া এক পাও চলে না। কিছু না পেলে এখানে আসবে কেন? অন্যকোন ব্যাপারে মানুষ এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। কত লেখক, কত কবি, কত সাংবাদিক কত কি লিখে যাচ্ছেন। কে তার খোঁজ রাখে? কাজ ফুরোলেই কাজের মালিকরা ঠোঙার মত ফেলে দেন। সে সুধীরবাবুর কথা ভাবে। রূপযৌবনহীন, স্বল্পবিদ্যার অধিকারী ও কোনো ক্ষমতায় না থেকেও মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন। কিসের গুণে, কি শক্তির টানে? দেয়ালে লেখা, 'মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস্ মানুষ ধর।' অথবা 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বাণী দু'টো সার্থক বলে মনে হল।

কীর্তন ও ভজনের পর আলোচনার আসর বসল। অনিলবাবু

প্রভাতবাবু ও হীরালালবাবু আর্য সভ্যতা, ধর্ম সম্পর্কে নানা কথা বলে চলেছেন। সুদর্শনের এ বিষয়ে পূর্বের পড়া বইটির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এঁদের গুরুদেবের আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে লেখা 'আর্যকৃষ্টি' নামে একটি বইও আছে। সুদর্শনের পড়া। অনিলবাবু বললেন 'গুরুবাদ' আমাদের দেশের নতুন জিনিষ নয়। আর্য্যরা বৈদিক যুগে বলত 'উপসম্পদাদ', শিক্ষা গ্রহণের সময় বাল্যকালেই শেখানো হত—'মাতৃদেব ভব, পিতৃদেব ভব, আচার্যদেব ভব।' গুরু খুশি হলেই শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান দিতেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা একে বলতেন 'প্রব্রজ্যা'। শিষ্যদের 'ত্রিশরণ' মন্ত্র মানতে হতো—'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি। সংঘং শরণম গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি' সঙ্গে সঙ্গে হীরালালবাবু বললেন, শুধু কি 'ত্রিশরণ' মন্ত্র? রীতিমত 'অষ্টমার্গ' অবশ্য পালনীয় ছিল। শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রিক, গুরু ছিলেন ধর্মকেন্দ্রিক, গুরু বা আচার্য্য ছিলেন সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি। রাজা, সম্রাট ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাও মান্যগণ্য করতেন গুরুদেবকে।

– ইতিহাসেই আছে সম্রাট রামচন্দ্র বাল্মীকির, সম্রাট শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপাণী মুনির উপদেশ মত এবং সম্রাট অশোক উপগুপ্তের, রাজা শিবাজী গুরু রামদাসের কথামত চলতেন।

অনিলবাবু উদাহরণ তুলে সুদর্শনকে স্বপক্ষে টানতে চান। সে নীরব শ্রোতা।

একাশী বছরের বৃদ্ধ হীরালালবাবু ভারতবর্ষের নানা স্থানে গুরুমাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। যুবকদের মত উৎসাহী। ভাল শ্রোতা পেয়ে বললেন—দেখুন সুদর্শনবাবু, আমরা জন্ম থেকেই গুরুর আশ্রিত। অ-আ-ক-খ শেখা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শেষে ডকটরেট বা পি. এই. ডি হতে পণ্ডিত বা গুরু লাগে। স্কুল কলেজের গুরুরা একটি কি দু'টি বিষয়ে পণ্ডিত, তাছাড়া বিশেষ বিষয়ে চরম জ্ঞানও নেই। তাহলে ভাবুন, এমন কোন মানুষ কি হ'তে পারে না, যার সব বিষয়ে চরম জ্ঞান আছে? পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নদী, পাহাড়, মহাসাগর, পর্বত ইত্যাদি থাকতে পারে, শ্রেষ্ঠ মানুষ কি থাকতে পারে না?

—সুদর্শন মাথা নেড়ে বলে হ্যাঁ থাকা উচিত। কে তাঁরা? এটাই কথা। অধিকাংশ মানুষ এর উত্তর জানেন না। রবীন্দ্রনাথ, শেক্স-পীয়র সাহিত্যের চরম কথা বলতে পারেননি, নিউটন, গ্যালিলিও বিজ্ঞানের শেষ কথা বলেননি। মার্কস-লেনিন-গান্ধীজী রাজনীতির মূল কথা বলতে পারেননি। ফ্রয়েড, ডারউইনও সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। যুগে যুগে যুগশ্রেষ্ঠ মানুষটি তা পেরেছেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্ববেত্তা রূপে খ্যাত। তাঁর কথা প্রতিটি যুগেই সত্য, অভ্রান্ত, কখন ও ভুল বলে নাকচ হয়ে যায়নি, হবে ও না কোনদিন।

—কে তাঁরা

— যুগে যুগে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, হজরত, শ্রীচৈতন্য, রাম-কৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তাঁরা পরিচিত,খ্যাত। এরা জগৎ গুরু। সদগুরু ও অবতার পুরুষ বলে গণ্য। এঁদের ঘিরেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এক এক সময়ে এঁরাই শ্রেষ্ঠ মানব।

— কিন্তু ধর্ম নিয়ে তো মারামারিই চলছে। প্রেম, ভালবাসা কোথায়? শ্রীচৈতন্য পাঁচশ বছর আগে এসেছেন, এযুগে আর ও বেশী করে খুন, জখম, অন্যায়, অবিচার চলছে। নকশাল আন্দোলন এ বঙ্গেই শুরু হয়েছে।

হীরালালবাবু অমনি বলে উঠলেন—তাঁরা ধনী-নির্ধন, সৎ-অসৎ ধার্মিক-নাস্তিক সবার জন্যই বাঁচা বাড়ার মন্ত্র দিয়ে যান। কিন্তু এক-শ্রেণীর মানুষ প্রগতির মেকীধ্বজা উড়িয়ে ধ্বংসের বীজ বুনে যাচ্ছেন। মতলববাজরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে ফয়দা লুটতে চান। ধর্মকে কলুষিত করেন। হজরত রসুলকে সঠিক মানলে পৃথিবীর মানুষ আজ রসুলের নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দিত। কিন্তু আমরা ভয়-ভীতির চিত্রই দেখি।

এজন্যই গুরুদেবের এত গুরুত্ব। তিনি বলেছেন—'ভারতের অবনতি তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে।···তোমাদের মূর্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত হও—'

অনিলবাবুর কথা শেষ না হতেই প্রভাতবাবু বললেন, রবীন্দ্রনাথ এজন্যই বোধ হয়, 'ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, কবিতাটি লিখেছেন।

হীরালালবাবু বললেন, যুক্তিতে দিন কেটে যাবে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ সমগ্র, শ্রীশ্রী গীতা, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, কুলার্ণবতন্ত্র ও বিভিন্ন তন্ত্রে গুরুগ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। গুরু হলেন ভগবানের সাকার মূর্তি। সদ্‌গুরুকে ভগবান ভেবে পূজা করতে হয়। সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলেই ভগবানের সঙ্গ করা হয়।

—আমাদের কুলগুরু আছেন। মা বাবা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন। তবে আমি এখনও কিছু করছি না। সুদর্শন প্রসঙ্গতঃ বলে।

—আজকাল কুলগুরু দিয়ে চলে না। তাঁদের আহার, বিহার ঠিক নেই। সাধনা, আধ্যাত্মিক চেতনাও কম। তাই রামকৃষ্ণদেব ও গুরুদেব ওঁদের এড়িয়ে যেতে বলেছেন। কুলগুরু, উপগুরু আর সদগুরু এই তিন শ্রেণীর গুরু। একমাত্র সদ্‌গুরুই সর্বসমস্যা সমাধানকারী, ত্রিকালজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। অন্যদের সে শক্তি নেই। আমি এঁদের যথাক্রমে ঘরের প্রদীপ, চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে তুলনা করি। সৎগুরু সূর্যসম প্রখর।

গোবিন্দ মণ্ডল গৌরভক্ত, কৃষ্ণভক্ত মানুষ। 'ইসকনের' একজন প্রচারক। তিনি চুপচাপ থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন—শ্রীকৃষ্ণ হলেন আকর্ষক, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সবই তাঁর লীলাময় বিলাস। কৃষ্ণের অংশই সব। তাঁর জ্ঞান অনন্ত, তাই তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে? ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভগবানের এই ছয়টি ঐশ্বর্যেরই তিনি পূর্ণ অধিকারী। তিনি মানুষের মত জাগতিক লীলা বিলাস করলেও তাঁর পরম ঈশ্বরতত্ব সর্ব অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। সমস্ত মন প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পণ করলে বিশ্বজনীন প্রেম, মৈত্রী, শান্তি আপনা থেকেই জেগে উঠবে। যা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র বা অন্যকিছুর দ্বারা সম্ভব নয় কারও হৃদয়ে কৃষ্ণ'প্রেম জাগরিত হলে তার আর যাগ-যজ্ঞ, তপশ্চর্যার প্রয়োজন হয় না। তিনি শিল্প কলা,

বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম সব বিষয়ের অনন্ত ভাণ্ডার হয়ে ওঠেন।

—আপনার কি এই কাজ? কোথায় থাকেন? সুদর্শন প্রশ্ন করে গোবিন্দবাবু বলেন—এই অধমের বাড়ী চাঁদপাড়ায়। বনগাঁর আগের স্টেশান। গত বছর স্থানীয় হাইস্কুলের মাঠে পঞ্চাশ জন সাহেব মেম আমার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। এত লোক সমাগম কোন রাজনৈতিক মিটিং-এও হয়নি। একবার আসুন, আপনার মত মানুষ আমরা চাই। স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ মত কৃষ্ণ কথা শ্রবণে মুক্তির পথ পাবে। তাই ছেলেদের হাতে ব্যবসা-পত্র ছেড়ে দিয়ে এই মধুর নাম প্রচারে মেতেছি। ধন্য আমি। সুদর্শনবাবু, মনুষ্য জীবন অতি দুর্লভ, বহু সহস্র যোনি পরিভ্রমণের পর মনুষ্য জন্ম হয়। আত্মজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। আর তা কেবল কৃষ্ণ নাম গ্রহণেই হতে পারে। আমাদের গুরুদেব সেই পরম সত্যের সর্বব্যপ্ত ভগবানের সন্ধান দিয়েছেন। 'ব্রহ্ম সংহিতায়' উল্লেখ আছে—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সর্বকারণ কারণম্। হীরালালবাবু তত্ত্ব কথা বোঝাতে চেষ্টা করছেন।

সমর্থক পেয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন দাদা. আমাদের প্রভুপাদ বলেছেন, ভক্তিপরায়ণ না হলে তার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না এবং পরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সেই সুদূর কালে ভারতের অধ্যাত্ম ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমষ্টি, রাষ্ট্রজীবন গড়ে উঠুক।

অনিলবাবু বললেন, এবার অন্য প্রসঙ্গে আসুন। উনি শেষে বিরক্ত হবেন। শেষ কথা বলে দিন সৌর জগৎ যেমন সূর্যের প্রয়োজন, আমাদের জীবনেও তেমনি সদ্‌গুরুর প্রয়োজন, মোদ্দাকথা হল :

"বিপাক পথে হাত ধরে যে, চলার কায়দা জানিয়ে দেয়।
তাঁকেই জানিস গুরু বলে, তাঁকে পেলে নাইরে ভয়॥"

আলোচনা অন্য পথে বাঁক নিল। মানুষের সুখ দুঃখ ও সমস্যা নিয়ে কয়েক মিনিট আলোচনার পর খাওয়ার ডাক পড়ল।

খেয়ে দেয়ে আর বসল না। সারাদিন বিশ্রাম হয় নি। সুদর্শন

দেখল তার মার যেন কত পরিচিত স্থান। বাড়ীর মত হাঁটাচলা, ওঠা বসা করছেন। মন্দিরের ছেলেরাও তাকে 'মা' বলে সম্বোধন করছেন।

এক ঘুমে ভোরের আলো ফুটে উঠল। ঠাণ্ডাভাব ছিল। মা উঠে প্রার্থনা সভায় গেছেন। মাঙ্গলিক সানাই বাজছে। আজ উৎসবের দিন। ফুলের মালা ও কাপড় দিয়ে মন্দির ও গেট সাজানো হয়েছে। একটা স্বর্গীয় পরিবেশ।

সুদর্শন হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় বসল। মাইকে শোনা যাচ্ছে 'শ্রীমদ্-ভাগবৎ' পাঠ শেষ হয়ে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' পাঠ চলছে। কথকের গলা ভক্তিতে আপ্লুত। ঘরে মন টিকল না। পায়ে পায়ে মন্দিরের দিকে গেল। কেউ ধ্যানস্থ, কেউ প্রণামে রত। অনুষ্ঠান শেষে ভক্তদের 'স্বতঃ অনুজ্ঞা' সমবেত কণ্ঠে পাঠ করতে হল।

বেলা ন'টায় একদল নৃত্য করতে করতে তুলসী মঞ্চ প্রদক্ষিণ করল। সুদর্শন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। খোল করতাল সহযোগে 'হরেকৃষ্ণ' গানে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে। তার পর একে একে বহু লোক মূর্তির পাদদেশে আবীর দিয়ে প্রণাম করলেন। গৌর-ভক্ত গোবিন্দ মণ্ডল সামনে যাকে পাচ্ছেন তাকেই আলিঙ্গন করে 'ভগবৎ দর্শন' পত্রিকা কিনতে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত বই এনেছেন বিক্রী করতে।

চেনা লোকেরা সুদর্শনকে আবীরের টিপ পড়ালো। ফাগের উৎসব যেন। আবীরে রাঙানো উঠোন পেরিয়ে সে ঘরে এসে চটিটা পায়ে দিয়ে অনিমার বাড়ীর দিকে চলল। গেটের মুখে এক বৈষ্ণব গান ধরেছে—

'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের, রাই আমাদের—
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের—
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদন মোহন
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ
নৈলে শুধুই মদন মোহন।'

অনিমা বিছানায় মামীর সঙ্গে নারকেলের সন্দেশ বানাচ্ছিল মন্দিরে পাঠাবে বলে। বিকেলে কীর্তন, গান, আলোচনা সভা বসবে। হাজার হাজার লোক খিচুড়ি ভোগ নেবে। তারাও পূজার জন্য অর্ঘ্য সংগ্রহ করে এনেছে। ফল মূলও যে যেমন পেরেছে, এনেছে।

সুদর্শনকে ঘরে বসতে দিয়ে প্লেটে করে সন্দেশ এনে ওর সামনে রেখে পরস্পরের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইল। ওর মামী রান্না-ঘরে চলে গেলে সে জিগ্যেস করল, মন্দিরে গেলে না কেন? আমার চোখ ব্যাথা হয়ে গেছে খুঁজে খুঁজে।

বিকেলে যাবো। তোমার বক্তৃতা শুনব। মামীর সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। মামীর শরীর ভালো নেই।

ওরা আরও কিছুক্ষণ বলল। তবে আজকের কথার সুর ছিল অন্যরকম।

প্লেট, গ্লাস নামাতে গেলেই সুদর্শন ওকে জাপ্টে ধরে ওকে পকেট থেকে আবীর বের করে ওর কপালে, সিঁথিতে তিলক টেনে দিল।

অনিমা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। জীবনে এই প্রথম একটি পুরুষের স্পর্শ। যে আনন্দ এত দিন অনাস্বাদিত ছিল তা আজ আকস্মিকভাবে পেয়ে গেল। আয়নায় চোখ ফেলে লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠল। জলের পাত্র থেকে জল নিয়ে কাপড়ের একদিক ভিজিয়ে মুছে ফেলল। তারপর এক গণ্ডুষ জল নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মেরে বলল, অসভ্য ছেলে। মামী দেখলে কি ভাববে?

—দাঁড়াও সময় মত প্রতিশোধ নেব।

—এতই সোজা। বলেই মুখ ভেংচে বুড়ো আঙ্গুল দেখাল।

আর কথা এগোল না। মামী এসে ঘরে ঢুকলেন। বেলাও অনেক হয়েছে। উঠে পড়ল সে।

চার থেকে পাঁচ হাজার লোক খিচুড়ি ভোগ খেল। সুদর্শনদের জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা। ভোগের প্রসাদের সাথে ভাত। নানা রকমের ভাত ভুজি, মিষ্টি। পেট পুরে অতিথিরা সকলে খাওয়া শেষ করে যার যার ঘরের দিকে গেল।

সুদর্শন খেয়ে দেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বিকালে বক্তৃতায় কি বলবে মনে মনে ভাঁজতে লাগল। নন্দলাল ভট্টাচার্য্যের 'শ্রীচৈতন্য কথামৃত,' ভক্তি বেদান্ত স্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ও স্বামী শিবানন্দ গিরিজীর 'চৈতন্য চড়কা' থেকে কিছু পয়েন্ট লিখে এনেছে। সেগুলি মনে মনে সাজিয়ে নেয়। বারান্দায় এক ভক্ত গান ধরেছে—

"হরিনাম বিনেরে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে···।"

কর্কশ গলা। সুর ও ঠিক হচ্ছিল না। ওর গানে সুদর্শনের চিন্তায় ব্যাঘাত হল। মাঝে মাঝে গানের অর্থ খুঁজতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

শ্যামল ক্যামেরার পেটে ফিল্ম ঢুকিয়ে রাখল। আর একঘণ্টা বাদেই অনুষ্ঠান শুরু।

একটু দেরীতে অনুষ্ঠান শুরু হল। স্থানীয় দু'একজন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়ার পর অনিলবাবু দীর্ঘ সময় ধরে ভাষণ দিলেন। কিন্তু জমাতে পারলেন না। সুদর্শন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দেখল ওর মার পাশে নিবেদিতা অনিমাকে নিয়ে বসেছে। দু'জনে খুব সেজেছে। একজন অন্যজনকে ঠেলা দিচ্ছে। সাহসে ভর দিয়ে শুরু করল ভাষণ। কোথা দিয়ে যে পঞ্চাশ মিনিট সময় চলে গেল টের পেল না। শেষ করার মুহূর্তে ঘন ঘন হাততালি পড়ল। স্টেজের নিচে নেমে আসার পর অনেকে ঠিকানা নিতে এগিয়ে এলেন। ঘরে এসে বসলে সুন্দরবনের বিশিষ্ট জনেরা এসে প্রশংসা জানালেন। ধন্যবাদ জানালেন কেউ কেউ।

সুদর্শনের শরীর থেকে একটা ভার নেমে গেল। স্বস্তি পেল যদিও ডায়নামোর শব্দে বিরক্তি বোধ করছিল। শ্রোতাদের ধৈর্যে পুষিয়ে গেল। হালকা মনে একটা উত্তাপ অনুভব করে। এত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য এই প্রথম।

—দারুণ বলেছেন। সুদর্শনদা, সুন্দরবনে নাম রেখে গেলেন। গোসাবায় হীরো বনে গেলেন। বাড়ী ফেরার মুখে নিবেদিতার রসিকতা পাশে অনিমা, ওর মা।

—তোমার মা এসেছেন বলোনি কেন? দাঁড়াও মজা দেখাবো।

কলকাতা গিয়ে অনুষ্ঠানের ফটো পাঠাবে। অনিমার সংক্ষিপ্ত কথা। শ্যামল লাজুক ছেলে। মুখ ফসকে গেল। কলকাতা গেলেই তো দেখবেন। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। সুদর্শন তো বিজয়ী বীর। বড্ড হিংসা হচ্ছে।

রাতে খেতে বসে অনিলবাবুরাও প্রশংসা করলেন। সুধীরবাবু বললেন লেখক, সাংবাদিক, বক্তা সর্ববিষয়ে আপনি দক্ষ। গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে। ঠাকুর আপনাকে আরও বড় করে তুলুন। "আধুনিক সমাজ ও চৈতন্যদেব" সম্পর্কে এর চেয়ে ভালো কিছু বলা যায় কিনা জানি না। আমার উৎসব কমিটির কর্ম-কর্তারা বলেছেন 'রত্ন' বিশেষ আপনি। আমাদের ধন্য করলেন।

ও খেয়ে এসে বজ্রাসনে বসে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলল। রাত হচ্ছে। দরজা বন্ধ করে ডায়েরী লিখতে লাগল। হঠাৎ ডায়নামো বন্ধ হয়ে যায়। দিনভর চলেছে। আগামী কালও চলবে। যন্ত্র হলেও বিশ্রাম প্রয়োজন। অগত্যা সে খাতাপত্র গুছিয়ে শুয়ে পড়ে। টেবিল ল্যাম্পে দেখা যায় না। শরীরও এলিয়ে পড়ে বিছানায়।

অনেক রাত পর্যন্ত কল্পনার সমুদ্রে সাঁতার কাটার পর ওর চোখে ঘুম নামল মধ্যরাত্রে। মশার কামড়ে গা চুলকোতে গিয়ে কিছু সময় নষ্ট হল।

সুদর্শনের মন ময়ুর নাচলেও নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। সম্প্রতি সি. পি. এম বনাম আর. এস. পির কর্মীদের মারামারি হয়ে দু'পক্ষে কিছু খুনজখম হয়েছে। সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বেরিয়ে পড়ল সে।

আর. এস. পির যুব নেতা, পঞ্চায়েত সদস্য সনৎ মণ্ডল বললেন, এখানে ১৯৪০ সাল থেকে আমাদের পার্টির কাজ হয়েছে, ক্রমশঃ অন্যান্য পার্টির তুলনায় আমাদের ক্ষমতা বাড়ছে। আমাদের এম. এল. এ. গণেশ মণ্ডল এখানে জনপ্রিয় নেতা। R.C.P.I. নেতা সৌমেন ঠাকুর এখানে মিটিং করে যাওয়ার পর আন্দোলন আরও দানা

বাঁধে সাত জেলে, রাঙাবেলিয়া, গোসাবা নিয়ে হ্যামিলটনের এক লক্ষ বাহান্ন বিঘা জমি ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি এখানে ছিলেন। সতীশ ঘোষ হেড মাষ্টারী ছেড়ে এই ট্রাস্টের ম্যানেজার হলেন। ১৯৫৫ সালে R.S.P. নেতা অরিন্দম নাথের আন্দোলনে ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের ভাইপো জেমস্ হ্যামিলটন ও স্ত্রী এ্যানি হ্যামিলটন কচুপাতা মাথায় দিয়ে পালিয়ে যান। ট্রাস্টের কর্মীরা মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করে সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। ধর্ম গোলা, কো-অপারেটিভ, ধানকল, সমবায় সব বন্ধ হয়ে গেল। স্কুলের সঙ্গেও মামলা বেঁধে যায়। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসী এম.এল.এ পরেশ বৈদ্য মামলা করেন। এ্যাকট অনুযায়ী পঁচিশ হাজার জমি সরকার নিয়ে নিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন চক্রবর্তী, বিনয় চৌধুরী একটা ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করে দেন। সুধাংশু মজুমদারের হাত থেকে ম্যানেজারি হাত ঘুরে তার জামাই সতীশ ঘোষের হাতে যায় ১৯৫৭ থেকে গোপীনাথ বর্ম্মনবাবু ক্ষমতায় আছেন, উনিই ট্রাস্টের হয়ে মামলা চালাচ্ছেন। স্নেহাংশু আচার্য সরকার পক্ষে, অন্যপক্ষে বিনয়বাবু এডভোকেট। হাইকোর্টে এখন মামলা চলছে। আদালত ট্রাস্টিকে মাসিক বার হাজার টাকা ব্যায় করার অনুমতি দিয়েছেন। বেশী টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হচ্ছে। এই বাজারে কেউ ট্যাক্স দেয় না, সরকারই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। কংগ্রেসের তারাশংকর ঘোষ বর্গাচাষ নিয়ে জোতদারদের এসোসিয়েশান গঠন করেন। জমি দখল নিয়ে লড়াই শুরু হয়। ঐ থেকে সি পি. এম, কংগ্রেসের, আর এস.পির বিবাদ চলছে। সি.পি এমের লোকাল কমিটির সেক্রেটারী হলেন দুলাল সিংহ আর কৃষক সমিতির নেতা প্রতাপনাথ কেউ কম যান না। 'মহাতীর্থম্' প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সাপ্লাইর টেণ্ডার নিয়েছিল। সরকার দিতেন পাঁচলক্ষ টাকা, পাবলিক দিতেন তিনলক্ষ টাকা। শেষ পর্যন্ত সব ঠাণ্ডা মেরে গেল। ১৯৫৭ সালে 'দর্পণ' এবং 'ইণ্ডিয়া টুডে'র ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এবং আনন্দবাজারে ১৯৫৫ সালের শ্রাবণমাসে কিছু কিছু সংবাদ বের হয়। হাইকোর্টে ৮/এ, ১৫৪৮/১৯৫৮ এর সেকশানের

নথিপত্র দেখলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সনৎবাবু কথার ফাঁকে ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে তাকেও সাধেন। নিজে একটায় আগুন ধরিয়ে দু'তিন জন সঙ্গীকেও দেন।

সে বিড়ি সিগারেটে কখনও টান দেয়নি। তার মনে হয় বিড়ি জন মজুরদের জিনিষ। সে বলল না খাই না, আত্মদূষণ করে কি লাভ? পরিবেশ দূষণের চেয়েও খারাপ জিনিষ। মনে মনে ভাবে বিজ্ঞাপনে ক'জন সতর্ক হচ্ছে। বরং বেশী লোকই ধুমপানে আকৃষ্ট হচ্ছে। স্কুলের ছেলেরাও ব্যাপক ভাবে নেশা গ্রস্ত হচ্ছে।

সুধীরবাবুর কথা তার মনে আসে, একদিন বলেছিলেন, একজন আদর্শবান পুরুষ সামনে থাকলে, মানুষ নেশা ও পাপকর্ম ছাড়তে পারে। আমার গুরুদেবের সান্নিধ্যে এসে কত নেশাখোর মানুষ নেশা ছেড়ে দিয়েছেন। অবৈধ প্রেম ছেড়ে সুখের সংসার গড়েছে, আমিষ ছেড়ে নিরামিষ খাচ্ছেন, সদাচারী হচ্ছেন বহু মানুষ।

সুদর্শন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে ভাবল, মানুষ জেগে ঘুমোচ্ছে, সময় হলে বুঝবে একদিন। তখন সব শেষ। আর. এস.পি এবং সি.পি.এমের লোকেরা ডাঃ বর্ম্মণের নিন্দায় মুখর। রাজনীতির খেলায় মত্ত, পরশ্রীকাতর বাঙ্গালীরা আত্মধ্বংসে মেতে উঠেছে। তাই হ্যামিলটনকে তাড়িয়ে কোন উন্নতি তো হয়নি বরং নানা সমস্যাই চলছে। যা ছিল তাও নষ্ট হচ্ছে। সুদর্শন মাঠ, বাজার পেরিয়ে ডাঃ বর্ম্মণের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ইঁট বিছানো রাস্তা। অন্যগাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝাউগাছ। বাতাসে শন, শন: শব্দ হচ্ছে। এখান থেকে বহু টাকা আত্মসাৎ করে তিনি নাকি ভবানীপুরে রাজপ্রসাদ তুলেছেন।

উনি গলা শুনেই বললেন, আসুন। আপনার কথা সুধীরবাবুর কাছে শুনেছি।

—আপনার কথাও খুব শুনেছি। আলাপ করতে এলাম।

—আমি ভাগ্যবান মানুষ। বসুন।

সুদর্শন বসতে বসতে মানুষটিকে দেখল। আলাপী, নিরহংকারী

এবং সাদাসিধে।

ডাঃ বর্ম্মণ রোগীদের বাইরে গিয়ে বসতে বললেন। কি আর আলাপ করবেন। গত বিশ বছর নদীতে অনেক জোয়ার ভাঁটা দেখেছি। আরও দেখব। এ দেশের কি হবে? এখন রাজনীতির দুষ্ট খেলায় না মাতলে কিছু হবে না। সব দলই সমান। ব্যক্তিগত বা কোন প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় কোন কাজকে সুষ্ঠুভাবে হতে দেবে না। কাউকে ছোট করতে পারলে বা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলেই খুশি। কিছু করার যোগ্যতা থাক আর না থাক।

—আপনারাই তো ইংরেজদের তাড়িয়েছেন, তাদের দোষগুলি দেখিয়েছেন। মানুষও দোষযুক্ত হয়ে উঠেছে। একটা ধর্মগ্রন্থে পেয়েছি—'তোমার নজর যদি অন্যের কেবল কু-ই দেখে, তবে তুমি কখনই ভালোবাসতে পারবে না। আর, যে সৎ দেখতে পারে না সে কখনই সৎ হয় না।...পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলংকিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভাল হয়ে পড়ে।'

—ঠিক বলেছেন, রাজনীতি আমরা চাইনি। আমাদের কোন মর্যাদা, চরিত্র নেই। প্রদেশে প্রদেশে যা চলছে আমেরিকা, রাশিয়া শিকারী বাজের মত তাকিয়ে আছে। ইংরাজদের চরিত্রের গুণাবলী আমাদের নেই। এ জন্যই আমরা পরাধীন হয়েছি, ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে?

সুধীরবাবু আমাকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব বলেছেন—জনকে (Man) ক্রমোন্নতির দিকে, বাঁচাবাড়ার ঐশ্চর্যে ঐশ্চর্যশালী করে, নিরন্তরতার চালনা করাই হচ্ছে সেবা, আর এই জন দিয়েই জাতি। জনকে বাদ দিয়ে জাতিকে স্বাধীন করার 'মরকোচ' যদি রাজনীতির ব্যাপার হয়, তা তো মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এমনতর কিছু? আমি ও তাঁর লেখা পড়েছি। গুরুদেবের একটা কথা বারবার মনে পড়ে—

"রাজশক্তি হাতে পেয়েও / সত্তের পীড়ক যারাই হয়।
দেশকে মারে নিজেও মরে / রাষ্ট্রে আনে তারাই ক্ষয়॥"

ডঃ বর্ম্মণ শেষে বললেন—আমাদের জড় উন্নতি হয়েছে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষির উন্নতি মানুষকে ভোগী করে তুলেছে। মানুষ না খেয়ে নেই। কিন্তু সমান্তরালভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়নি। আর্য্যসংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণ না করায় চরম দুর্ভোগে আমরা ভুগছি। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বুঝতে চাই না। আমাদের বহু নেতা, লেখক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবী তাঁকে নিয়ে ভাবছেন না।

সুদর্শন গভীর মন দিয়ে শোনে, ও ভাবে। কথায় কথায় বেলা হয়ে যায়। শেষে বললেন, গোসাবার উন্নতির জন্য লিখবেন। বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, ক্যানিং এর সঙ্গে যোগাযোগ, পরিবহনের উন্নতি, মিঠা জলের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প. লবণ উৎপাদন, টালি, কাঠ, দিয়াশালাইর প্যাকিং বাক্স, ডিম উৎপাদন, মোমশিল্প, শস্য রক্ষণাগার, নদীর ড্রেসিং, পাকারাস্তার দিকে নজর দিলে উন্নতি সম্ভব। ডাঃ বর্ম্মণের স্ত্রী লুচি, বেগুন ভাজা, সন্দেশ দিয়ে গেলেন। খেয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে মন্দিরের পথ ধরল সে।

সুদর্শন মন্দিরে এসে দেখে অনিমা ঘরে মামীসহ ওর মার সঙ্গে কথা বলছে। চোখে মুখে একটা আনন্দের ঢেউ।

সুদর্শন ওদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে একটা কাজের ছুঁতোয় বাইরে চলে এল। সুধীরবাবুর ঘরে ঢুকে বিকালের অনুষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন।

ঘণ্টাখানেক পর সুদর্শন যখন ঘরে ঢুকল তখন অনিমারা উঠে দাঁড়িয়েছে। বেলা হয়েছে। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকালে মিটিং-এ আসবে। সে বিশেষ কথা বলল না। চোখাচোখি হল শুধু। অনিমা বের হওয়ার আগে ওর মাকে প্রণাম করতে গেলে জড়িয়ে ধরে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে। শীতের আগেই বনের টিয়াকে খাঁচায় পুরবো, আমি একা আর পারি না। সব ভার তোমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

অনিমা লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে মায়ের আঁচল ধরে বেরিয়ে এল, সুদর্শন পুকুরঘাটে স্নান করতে গেলে কয়েক জন কুশল বার্তা

নিল। কাক দ্বীপের মত এখানেও ঘাটের কাছে মাছের খেলা। কালী আর ধবলী নামে দুটো বড় মাছ হাত থেকে খাবার খেয়ে নেয়। ইনজেকশন, ওষুধ দিয়ে যত্ন নেওয়া হচ্ছে মাছ দু'টির।

অনেক লোকের রান্না করতে দেরী হয়ে যায়। বিমলবাবু, সুধীরবাবু হাতজোড় করে ক্ষমা চান। সুবোধরা কাজে এত ব্যস্ত যে তাদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলতে পারল না সে।

সে দুপুরে ঘুমোতে পারল না। বারন্দায় কয়েকজন গল্প জুড়ে দিয়েছে। এদের আগ্রহ দেখে সে বিশ্রামের কথা ভুলে যায়। কেউ কেউ গুরুদেবের মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা জুড়ে দেন।

বিকালের কীর্ত্তন বেশ জমেছিল। গ্রাম্যপথ বেয়ে বহু লোক নৌকা, ভট্‌ভটিতে আশে পাশের দ্বীপ থেকেও কেউ কেউ এসেছেন।

মন্দিরে প্রার্থনা, ভজনগানের সময় অনিমা নিবেদিতাকে নিয়ে মেয়েদের দিকে বসেছিল। একটু দূরে ওদের মা বসেছিলেন।

হঠাৎ সুধীরবাবু এক নাটক করে বসলেন। সুদর্শনকে কাছে ডাকলেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে শেষে বললেন আমাদের গুরুদেবের অসীম কৃপা, আমাদের পরম সৌভাগ্য সুদর্শনবাবুকে আমরা আত্মীয় হিসাবে পাচ্ছি। তার মত সুসন্তান বিরল। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মানুষ্ঠান না করলেও ধার্মিক মানুষ। গত জন্মের সুকীর্তি তার মধ্যে আছে। একটু থেমে ওর মার দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন, ওর মমতাময়ী মা, আদর্শস্থানীয়া। আমি আজ কথা বলে জেনেছি। আমাদের অনিমাকে তিনি পুত্রবধূ করবেন। একটা অনুন্নত সমাজের মেয়েকে এভাবে কৌলিন্য দেওয়া খুবই গৌরবের ব্যাপার। এ জাতীয় বিয়েকে শাস্ত্র 'অনুলোম' বিয়ে বলে। অর্থাৎ পাত্র উচ্চবর্ণের, পাত্রী নিম্নবর্ণের। শ্রীশ্রীগীতা, মনুসংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতায়, নারীর পথে অনুলোম বিয়ের সমর্থন আছে।

আমি ঠাকুরের কাছে তাঁর যশ, আয়ু ও সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করছি। এ বিয়ে শুধু জৈবিক চাহিদা বা সামাজিক দায়িত্ব নয়। তাদের বিয়েতে যেন দেবশিশুর মর্ত্তে আবির্ভাব ঘটে। আজ ভারতবর্ষে সুসন্তানের

বড্ড অভাব। দেশ চায় বীর সন্তান। আমার আর বলার কিছুই নেই। আগামীকাল উনি চলে যাবেন। তাই এমন একটি ঘটনা না জানিয়ে পারলাম না।

আর যায় কোথায়? সবাই খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন। হীরালালবাবুরা 'সাধু' 'সাধু' বলে উঠলেন।

রাতে খাওয়া দাওয়ার শেষে কথাবার্তায় বেশ রাত হয় তারপর সুদর্শনের ডায়েরী লিখতে মধ্যরাত। আজকের নাটকীয় ব্যাপার লিখে রাখল। আবেগে অনেক পাতা লেখা হয়ে গেল। রাতে ঘুম এল না। দু'দিন খাওয়া দাওয়ায় অনিয়ম হয়েছে। বজ্রাসন, গোমুখাসন ব্যর্থ হল। বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে হাত পা, কানের দু'পাশে ভিজিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ল। তারপর মনের আকাশ জুড়ে শুধু অনিমা। তার মন প্রাণ সমস্ত সত্তা অনিমার দখলে। তাছাড়া দীক্ষার কথাও ভাবতে লাগল সে। এত মানুষ ঠাকুরের পায়ে মাথা নত করেছেন সেখানে কেন তার অহং সত্তা থাকবে। অধ্যাপক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী গত সপ্তাহে একটা সাপ্তাহিকিতে 'গুরুবাদ' নিয়ে লিখেছেন। তিনি একজন সৎ ব্রাহ্মণ, সুবক্তা। দেশ জোড়া তাঁর নাম। তিনিও স্বাত্বিক, নিরামিষ আহার করেন। সৎ গুরুর নির্দেশ মেনে চলেন, একদিকে অনিমা অন্যদিকে দীক্ষা তাকে ভাবিয়ে তুলল। না, কাল সকালেই সে প্রার্থনায় অংশ নেবে। দীক্ষা লাভ হলে আলোর রাজ্যে ও প্রবেশ করতে পারবে রাজকন্যার সাথে রাজ্য লাভও ঘটবে। ঘুম না হলেও একটা তৃপ্তি, সুখ সে অনুভব করে। রাতটা ঐ ভাবেই কেটে যায়।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রার্থনা সভা শুরু হলে সুদর্শন হাত মুখ ধুয়ে গিয়ে বসল। হীরালালবাবুরা আগেই এসে বসেছেন। এক-পাশে বসে প্রার্থনার সুরে সুর মেলাতে চাইল। হিন্দী, বাংলা ও মৈথিলী মিশিয়ে এমন একটা মিশ্র ভাষা, যার বহু শব্দই সে বুঝতে পারল না। প্রার্থনা শেষে ধ্যান। ওদের কাছে 'ধ্যান'-এর অর্থ: কোন একটা চিন্তা নিয়ে লেগে থাকা।

ধ্যান শেষ হলে তার দীক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সুধীরবাবু শুনেই আনন্দে চেঁচিয়ে সকলকে বলে ফেললেন। অনিলবাবুরা উঠে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন—এতদিন পর জন্ম সার্থক হল, জীবন ধন্য হল।

দু'মিনিটের মধ্যে দীক্ষা ঘরের আসনে বসে পড়ল সে। সুগন্ধি ধূপ ম-ম করে গন্ধ ছড়াচ্ছে। সাদা ফুল। তুলসি পত্র সাজানো। হীরালালবাবু দীক্ষামন্ত্র দিচ্ছেন। ঘরে আর কেউ নেই।

সুদর্শন ভাবল দীক্ষা এত সহজ ব্যাপার? এত কম খরচ? দীক্ষান্তে সংকল্প-শপথ বাণীতে গুরুজীকে প্রতিষ্ঠা করা, জীবন ও বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা, পারিপার্শ্বিক ও গুরু ভ্রাতাদের অর্থ-বাক্-বাস্তবকর্মে সাহায্য করার কথা পাঠ করতে করতে ভাবল, এতো জগতের কল্যাণের জন্য সকলেরই পালন করা উচিত। মার্কস, লেনিন বা কোন নাস্তিক শুনলে সেও শ্রদ্ধা জানাবে। 'স্বতঃ অনুজ্ঞা' সে বেশ জোর দিয়েই পড়ল: 'আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস, কাম লোভজিৎ বশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, অস্তিবৃদ্ধি-যাজন-জৈত্র, পরমানন্দ উদ্দীপ্ত শক্তি সংবৃদ্ধ তোমারই সন্তান। প্রেম পুষ্ট, চির-চেতন অজর, অমর আমায় গ্রহণ কর, প্রণাম লও।'

সুদর্শন বাইরে এলে একটা আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। উপস্থিত সকলেই শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ জানাল। দু'জন ভক্ত গুরুর মহিমা কীর্তন করে শোনালেন। সে ঘরে এসে মাকে সব বলল। মা ওর কথা শুনে অবাক, ছেলের মতিগতি পাল্টে গেল? আশীর্বাদ করে বললেন—তুই অনেক বড় হবি, গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে। যা গুরুজনদের প্রণাম কর।

নানা কথায় বেলা হয়ে যায়। আজ কলকাতা ফেরার পালা। অনিলবাবুরাও চলে যাবেন। আশে পাশের গ্রাম গঞ্জের মানুষরা চলে গেছেন। বাসন্তী, ক্যানিং-এ কেউ কেউ যাবেন। হঠাৎ লঞ্চ ধর্মঘটের খবর এল। সরকারের সঙ্গে ভাড়াবৃদ্ধি, সময় পরিবর্তন নিয়ে মতান্তর হয়েছে। মালিক-কর্মীদের সম্পর্কও তিক্ত। বিপদে পড়ল অনেকেই।

এক ফাঁকে সে অনিমার বাড়ী গেল। এ যাত্রার শেষ দেখা করতে। হঠাৎই অনিমার মামী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনিমা রান্না ঘরে। সুদর্শন ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রথমেই জ্ঞান দিল—খেতে বসে কাঁচা নুন, জল টক জিনিষ খাবেন না। কোনকিছু খাওয়ার আধঘন্টা আগে পরে জল খাবেন, খাওয়ার দোষেই ভুগছেন। চিনি, মিষ্টি না পারলে খাবেন না।

তারপরই রান্নাঘরে গিয়ে বসল। একটা ছোট জলচৌকি এগিয়ে দিল অনিমা। ছোট মন্তব্য রাজপুত্র এলেন যে? হিন্দী সিনেমার মত ব্যাপার। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না'। একটু প্রগল্ভ হল অনিমা।

হ্যাঁ রাজকন্যা ও রাজত্ব লাভ করে জয়ী হয়ে গেলাম। আমি এখন হীরো, কি বলো? সুদর্শন হেসে বলল।

—খুউব হয়েছে, বস, চা করব?

—না, তোমার পাল্লায় পড়ে লিভার খারাপ করবো? মনে মনে ভাবছে সুদর্শন মেয়েদের যখন বিয়ে পাকা হয়ে যায়, নিশ্চিন্ত হয়ে তখন একটু সাহস নিয়ে কথা বলে, একটু প্রগলভতা করে, যে অনিমা সহজে কথা বলে না, সেও আজ খুব কথা বলছে।

ওর গিন্নিপনা দেখে সে ভবিষ্যতের কথা ভাবে। ওর যৌবনের দিকে তাকিয়ে সে মুচকি, হেসে বলে মৌটুসি, আজ চলে যাবো, লক্ষ্ণৌ শুধু তোমার কথাই ঘুরে ফিরে মনে আসবে।

হঠাৎ ও গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ যেন মেঘে ছেয়েছে। ভালোবাসার বয়সতো কয়েক মাস। তবু অনিমার জীবনে প্রথম পুরুষ। তাই 'প্রেম' অকারণে 'বিরহের' আশংকা করছে। সুদর্শন ওর হৃদয়ে একটা আসন পেতেছে। সুদর্শন মেয়েদের ফুলের সঙ্গে তুলনা করে। একটা ফুলের মধু খেতে যেমন বহু পতঙ্গ খোঁজ নেয়, তেমনি একটি নারীরও খোঁজ নেয় বহু প্রেমিক পুরুষ। কিন্তু ব্যতিক্রম, পাতার আড়ালে যেমন ফুল থাকে এও যেন তেমনি লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই সুদর্শন কুঁড়ি চয়ন করেছে।

কখনও কখনও সুদর্শন 'প্রেম' কে একটা 'স্টেশান' বলে ভাবে। যেসব ছেলেমেয়ে একাধিক প্রেমে আসক্ত বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে। একটা ট্রেন যেমন বহু স্টেশান পাড়ি দেয়, ক্ষণিকের জন্য স্টেশানে স্টেশানে দাঁড়ায়, 'প্রেম'ও তেমনি কিছুকাল কোন হৃদয়ের জন্য অপেক্ষা করে। প্রয়োজন ফুরোলেই কেটে পরে। অনিমা সে জাতের মেয়ে নয়।

মেয়েদের ভাবগতিক সে বোঝে। ভাললাগার অনুভূতি ওর শ্বাসপ্রশ্বাসে, চাহনিতে। একেবার সে ঠাট্টা করে লিখেছিল—মাঝে মাঝে আমার বড্ড খিদে পায়। তোমার আলমারিতে কত খাবার। অথচ আমি উপোস করে মরছি। আমি কি উপোসী হয়ে মরে যাবো ?

অনিমা উত্তর দেয়—লক্ষ্মীটি ধৈর্য্য ধরো, তোমার খাবার কেউ খাবে না। আলমারিতে চাবি দেওয়া আছে। আমার গুরুদেব বলেছেন—'পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়, নারী মাগে টাকা। এমনি করেই চলতি জগৎ, বাঁচা বাড়ায় ফাঁকা।'

ওর উত্তরের সংযম দেখে সে বিস্মিত হয়। উপলব্ধি কত গভীর। আর একবার লিখেছিল—তুমি আমার স্বপ্ন। তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙিয়ে আছে। আমি তোমাকে ভুলতে পারি ? তোমাকে মুখস্থ করে রেখেছি। আমি সূর্য, তুমি সূর্যমুখী ফুল। আমার ভয় হয় তোমার ব্যাঙ্কে কে আবার অ্যাকাউন্ট খোলে? সাবধানে থেকো।

ও উত্তর দেয়—ভয় নেই। এখানে চোর ডাকাত নেই। আমার স্বপ্নে জাগরণে তুমি আর গুরুদেব। আমার ভালোবাসা মোমবাতি নয়। বরং তোমার জন্য ভয়। কত মেয়ের হাওয়ায় হাওয়ায় তুমি মানুষ হয়েছো। সুকন্যারা তোমাকে ঘিরে আছে। অবশ্য তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। তাই স্মৃতির মৌটুসী পাখিরা আজও আনন্দে শিস্ দিচ্ছে। তুমি এসো আমি ভীষণ জেগে আছি। শুধু তোমার জন্য, তোমারই জন্য।

সুদর্শন অফিস থেকে এসে যখন ওর চিঠি পেত তখন দু'তিনবার

পড়ত। মৃতসঞ্জীবনী সুধার মত ঐ চিঠি সমস্ত অবসাদ দূর করে দিত। ওর সুডৌল শরীর, মিষ্টি মুখ ও সরল হাসি ভেসে উঠত। ডায়েরী থেকে ফটো বের করে মিলিয়ে নেয়—কানে রিং মাকড়ী, গলায় পাথরের মালা, কপালে নীলটিপ্, মুখে ডাগর হাসি। কথায় কথায় বেশ বেলা হয়ে যায়। ঘরে গিয়ে দ্রুত খেয়ে বেরিয়ে পরতে হবে। অনিমার চোখ জলে টল্‌মল্। একে গ্রামের মেয়ে, তার উপর সহসা দেখা হওয়ার উপায় নেই। তাই প্রেমের অমূলক আশংকায় মন প্রাণ বিষণ্ণ।

বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল—সাবধানে যেও, গিয়ে চিঠি দেবে। বেশী করে চিঠিতে লিখবে। সপ্তাহে একখানা চিঠি দেবে কিন্তু। গুরুদেবের স্মরণ নেবে, চলা ফেরায় নাম করবে।

অনেক কথাই বলে যায়। সুদর্শন বোঝে প্রেমিক ছাড়া এ ব্যথা অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। ভালোবাসার মধ্যে আনন্দ, ভালোবাসার মধ্যেই দুঃখ। ঐ নিয়ে আনন্দ।

সুদর্শন বিদায় নিল। পেছনে ফিরে হাত নাড়ালো। শেষে রাস্তার বাঁকের মুখে শেষ বারের মতো তাকালো। ও এক হাত নাড়ালো, অন্য হাতে চোখের জল মুছলো। হৃদয়ের এ ব্যাথাতুর দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো বকুল গাছ। যার তলায় দাঁড়িয়ে অনিমা সতৃষ্ণ নয়নে ওর পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ঘরে এসে দেখে সকলেই খেয়ে দেয়ে রেডি হয়ে আছে। অনিল-বাবুরা বললেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, হাতে সময় নেই। মা তাড়া দিলেন—কিরে, যাওয়ার ইচ্ছা নেই? কত যে কথা বলতে পারিস! সবাই বিশ্রাম করছে। তোর কি বিশ্রাম বলে কিছু নেই? যা খেয়ে আয়

সুদর্শন খেতে যায়। সুধীরবাবু ও অন্য বাল'করা তদারকি করে। প্রচুর আয়োজন। তেমন খিদে নেই। থাকলেও ইচ্ছে নেই। মন পড়ে আছে অন্যখানে। ওর হৃদয়ের কথা কে বোঝে?

ঘরের ব্যাগপত্র মা গুছিয়ে নিয়েছেন। ব্রহ্মচারীরা কয়েকজন

জিনিষপত্র নিয়ে ভট্ ভটিতে তুলে দিতে চলল।

বিদায় দৃশ্যে সকলেই গম্ভীর। যেতে মন চায় না, তবু যেতে হবে। গ্রামের ছেলেরা কিছু পেয়ারা, সবেদা, কলা উপহার দিল। মন্দিরের তরফ থেকে দু'প্যাকেট সন্দেশ দিল পথে খাওয়ার জন্যে।

অগত্যা বাসন্তী হয়ে যেতে হবে। আসার সময় মাতলা নদী পেরিয়ে সোনাগাঁর ধার দিয়ে বিদ্যাধরী পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এখন অন্যপথ ঘুরে যেতে হবে।

সুদর্শনের আপত্তি নেই। নতুন পথ চেনা হবে। সুধীরবাবু তৃপ্তি প্রসাদকে সঙ্গে যেতে বলেছেন, সুবোধকে বলেছেন নৌকা ঠিক করে দিতে। মসজিদ বাটীতে নেমে ভ্যানে বাসন্তী যেতে হবে। বাজারে 'দশকর্মাভাণ্ডার'-এ একজন গুরুভাই থাকে। বাসন্তী থেকে নৌকায় হোগ্‌লা নদী পেরিয়ে সোনাখালি ঘাটে নামতে হবে। সেখান থেকে বাস ক্যানিং হয়ে কলকাতা যায়। বামন-খালি কাঁঠাল বেড়িয়ার পাশ দিয়ে নৌকা যাবে।

কতুবউদ্দীন তরফদার এসে ঘাটে নৌকা বেঁধে খবর দিল। দু'টোয় না বেরোলে রাত হয়ে যাবে। ডাঃ তপন মণ্ডল, এন. বাগচি, বিজয় নন্দী, কৃষ্ণ রঞ্জন দত্ত সুদর্শনের সঙ্গে কথা বলে নিল। খেয়ে দেয়ে ওরাও তৈরী। একসঙ্গে বের হবে। এখন আর কেউ বাবু বা মিস্টার নয়। সকলেই গুরু ভ্রাতা। তাই 'দাদা' শব্দ যোগ করে সম্বোধন করে। সুদর্শনদা' বলে সম্বোধন করল ওরা।

সুদর্শন ব্যাগ গুছিয়ে তৈরী হয়ে বসে ভাবে, সুন্দরবনের মানুষদের একটু অর্থের সামর্থ হ'লে কলকাতা বা শহর তলিতে বাসা বাঁধতেন। সবাই শহরবাসী হয়ে চাকরী চান। কে এদের সমস্যা মেটাবে? পঃ বঙ্গ জুড়ে সমস্যা, প্রতিটি গ্রামেই নালিশ জমে আছে। স্বয়ং ঈশ্বরেরও সাধ্য নেই। তার উপর বাঘ, সাপ, নদীর জল, ঝড়, প্রকৃতির রোষের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ভাগ্যের বিড়ম্বনায়, জীবনের বঞ্চনায় গরীব মানুষগুলো লড়াই করতে করতে সহজ সরলতা হারিয়ে ফেলছে। এ যেন প্রকৃতিরই ইচ্ছে। এদের ভাগ্যে এটাই

আছে। এমন একটি পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে অনিমা। সে ও শহরে চলে যাবে।

একটু পরেই লঞ্চঘাটের মুখে সুদর্শনরা হাঁটতে লাগল। সুধীর-বাবু ও আশ্রমের কিছু ব্রহ্মচারীও সঙ্গ নিল। পেছন পেছন আসতে লাগল গ্রাম গঞ্জের কিছু মানুষ।

ওরা কলকাতা চলে যাবে। সবাই গম্ভীর। নিকট কোন আত্মীয় বিদায় নিলে এমনটা হয়। সুদর্শন ওদের ভালবাসা মর্মে মর্মে অনুভব করে।

সে সোজাসুজি কারও দিকে চোখ ফেলতে পারল না লঞ্চের ওপর উঠে মনে হল প্রকৃতিও যেন বিরহ বিচ্ছেদে মুহ্যমান। আকাশে রোদের ছটা কম। মেঘলা ভাব।

ভোঁ—ও ও করে যখন লঞ্চটা শব্দ করে উঠল তখন তার বুকের পাঁজর যেন কেঁপে উঠল। আর জলযানটা যখন দুলতে দুলতে গভীর জলের দিকে এগোচ্ছিল তখন অজস্র হাত তুলে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানছিল। ক্ষণিকের মধ্যেই ইঞ্জিনের বিকট শব্দে ওদের কথা মিলিয়ে গেল। সুদর্শন অনুভব করল অনেকের চোখের কোণে জল-বিন্দু জমে গেছে। অলক্ষ্যে তার চোখও ভিজে উঠল।

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তার মনে হল অনিমা বুকে বালিশ চাপা দিয়ে চোখ মুছতে শুরু করেছে। সুন্দরবনের সুন্দরী ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

সুদর্শন পকেট থেকে রুমালটা বের করে ঝটিতে জানালার পাশে চলে গেল। খোলা নদীর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে রইল। সুন্দরীর জন্য মনটা হাহাকার করে উঠল।

—